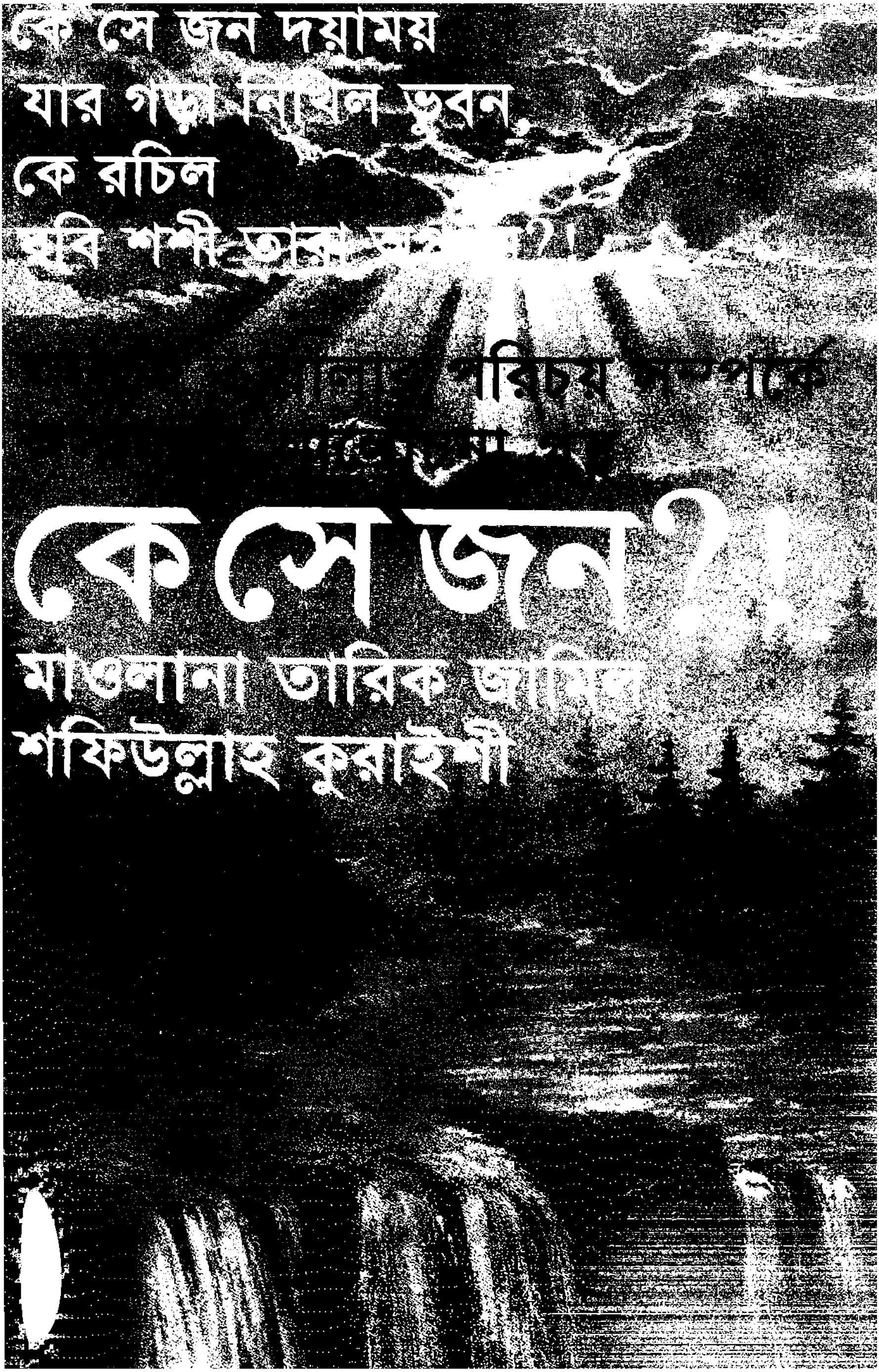

কে সে জন দয়াময়
যার গড়া নিখিল ভুবন,
কে রচিল
রবি শশী তারা [illegible]?।

[illegible] পরিচয় সম্পর্কে
[illegible]

কে সে জন?

মাওলানা তারিক জামিল
শফিউল্লাহ কুরাইশী

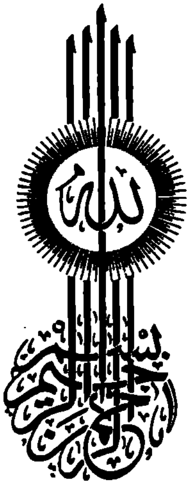

“বলুন, যদি তারা তাঁদের প্রভুর প্রশংসা লেখার জন্যে জগতের সব জলরাশিকে কালি হিসেবে নেয় আর সব বৃক্ষরাজি নেয় কলম হিসেবে; একদিন ফুরাবে কালি। কলম শেষ হবে। আবার যদি জলরাশি হয় কালি আর বৃক্ষেরা হয় কলম তো শেষ হবে তা একদিন। তবুও তাঁদের প্রভু আল্লাহতায়ালার গুণগান শেষ করতে পারবে না।”

-আল কোরআন।

মাওলানা তারিক জামিল ছিলেন মেডিকেল কলেজের ছাত্র। দেখা হলো বাংলাদেশের তাবলীগ জামাতের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ডঃ নাঈমের সাথে। কথা শুনে নয় নাঈমের নামাজ দেখে বদলে গেল তারিকের চেতনা। যাদুমন্ত্রে!? তিনি এখন পাকিস্তানের একজন বিশিষ্ট আলেম। তাবলিগী জামাতের বিশ্বব্যাপী কর্মকান্ডের সাথে জড়িত নিবেদিত প্রাণ জীবিত কিংবদন্তী। তাঁর অসাধারণ মর্মছোঁয়া সব আলোচনা আল্লাহর পথের পথিকদের আত্মার সার্বক্ষণিক সাথী।

অনুবাদক ও আলোচক শফিউল্লাহ কুরাইশী যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়ের শেষ বর্ষের ছাত্র তখন দেখা ডঃ নাঈমের সাথে। মাত্র ক'মিনিটের কথা শুনে বদলে ফেলেন জীবন।

ডাক সম্প্রদায়ের চারজন
মুহররম, ১৪১৬।

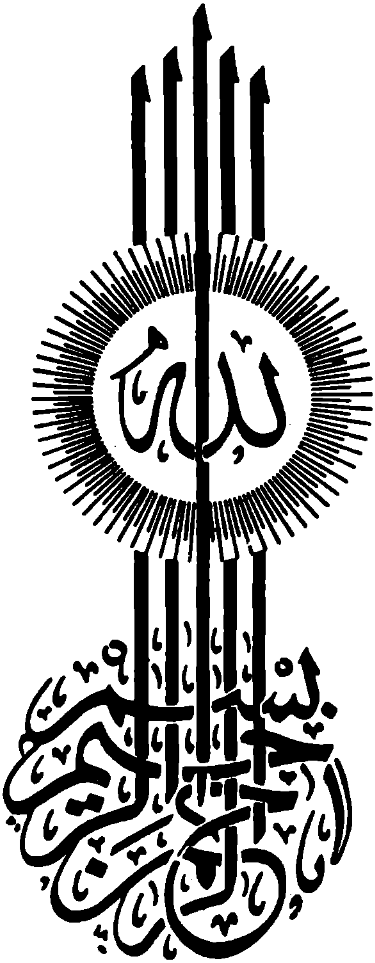

এক

‘ক্বোল হাজিহী সাবিলি আদ’উ ইলাল্লাহ্ আলা বাসিরাতিন আনা অ-আ মানিত্ তাবানী।’

‘আপনি বলে দিন, এটাই আমার রাস্তা, যে আমি ডাক দিই আল্লাহ্‌র দিকে, জেনে শুনে (বিজ্ঞতার সাথে), আমি আর যারা আমার অনুসরণ করে।’

আমার বন্ধু ও ভাই!

যার প্রতি আল্লাহ্ রাজী হয়েছেন সে সফলকাম হয়েছে। তার সব কাজ সফলতা পেয়েছে। যার ওপর আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হয়েছেন তার সব কিছু বিফল হয়েছে। তার সব কাজ নষ্ট হয়ে গেছে। আর আমরা দুনিয়াতে এসেছি আল্লাহ্‌কে রাজী খুশি করার জন্যে। এই দুনিয়াতে মানুষের কোনও কাজ নেই, আছে শুধু কিছু প্রয়োজন। আমার কাজ আল্লাহ্‌কে রাজি করা।

আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন, ‘অ-রিদওয়ানুহুম মিনাল্লাহি আকবার।’

‘আমার (আল্লাহ্‌র) সন্তুষ্টি সবচেয়ে বড় কথা।’

দুনিয়া খুবই ছোট।

দুনিয়ার ধন সম্পদ, ঐশ্বর্য ও বৈভব খুব অল্প।

দুনিয়ার সম্মান, মাতবরি–সর্দারি খুব ছোট, ক্ষণস্থায়ী।

আল্লাহ্ অনেক বড়। তিনি দৈনিক তিরিশ বার তার মুয়াজ্জিনকে দিয়ে ঘোষণা দিচ্ছেন বলো, বলো 'আল্লাহ্ সবচেয়ে বড়,আল্লাহ্ সবচেয়ে বড়।'

'আল্লাহু আকবার–আল্লাহু আকবার।'

আল্লাহ্ যার ওপর রাজী হয়েছেন তার সব কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আল্লাহ্ যার ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন তার সব কাজ বিফল হয়েছে।

আল্লাহ্ রাজি হলে কী দেন?

কোন্ কথায় আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হন, কীসে রাজী হন?

কোন্ কথায় আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হন, কীসে নারাজ হন?

আল্লাহ্ নারাজ হলে কী করেন?

এ সম্পর্কে কোনও জ্ঞান বা ধারণা আমাদের ছিল না। এসব ব্যাপারে প্রকৃত জ্ঞান বা সম্যক ধারণা দেয়ার জন্যে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁর পূতঃ পবিত্র নবীদের পাঠিয়েছিলেন মানব জাতির কাছে। তাঁদের ওপর এই দায়িত্ব দিয়েছিলেন যে, যাও তুমি আমার বান্দাদের একথা জানাও যে এক জীবন আসছে মৃত্যুর দরোজার ওপারে। অনন্ত জীবন। নবী, পয়গম্বরগণ এই কাজ করতেন। মানুষকে টেনে আনতেন আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি বা নারাজির হাত থেকে। টেনে আনতেন আল্লাহ্র আনুগত্যের দিকে। মানুষের স্রষ্টার দাসত্বের দিকে। নবী ও পয়গম্বরগণ আমাদের এই খবর দিয়েছেন।

আর আমাদের নবী সারওয়ারে কায়েনাত সাইয়্যিদিল কাওনাইন মুহাম্মাদ মুস্তাফা আহমাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই খবর দিয়েছেন। যার কোনও পরিবর্তন হয়নি। হতে পারে না।

তিনি কি বলেছেন? ব্যর্থ কে?

তিনি আল্লাহ্তায়ালার কথা বলেছেন।

আল্লাহ্তায়ালা কি বলেন?

তিনি বলেন, 'ফালাম্মা আ'আও আ'ম্মা নুহু আন্হু। ক্বোলনা লাহুম কূনু ক্বিরাদাতান খাশিঈন ০'

'যখন তারা নাফরমানী করে যে কাজ করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল সেই কাজ করলো; তখন আমি বললাম, তোমরা নিকৃষ্ট বানর হয়ে যাও; পাপের সাজা ভোগ করো।' (তখন তারা বানরে পরিণত হলো।)

তাহলে ব্যর্থ কে? যে আশরাফুল মাখলুকাত সৃষ্টির সেরা মানুষ থেকে নিকৃষ্ট জানোয়ার বানরে পরিণত হলো। কেন? পাপের কারণে।

আল্লাহ্তায়ালা বলেন, 'ফালাম্মা শাফুনান্ তাকাম্না মিন্হুম।'

'যখন তারা আমার আদেশ অমান্য করে আমাকে অসন্তুষ্ট বা নারাজ করলো; তখন আমি তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করলাম।'

এখানেও ব্যর্থতার আর অসন্তুষ্টির কারণ ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে। পাপ। পাপ ব্যর্থতার ও অসন্তুষ্টির মূল কারণ।

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, 'ইন্না তাত্তাকুল্লাহা ইয়াজআল লাকুম ফুরকানাও অইয়ু কাফ্ফিরু আনকুম।'

'যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো এবং আল্লাহ্ তায়ালার নাফরমানী থেকে বেঁচে থাকো তাহলে আল্লাহ্ তোমাদের চাওয়ার বস্তু দান করবেন। আর তোমাদের গোনাহ মাফ করে পবিত্র করে দিবেন।'

তিনি আরও বলেন, 'লা বিস্তাকামু আলাত্ তারিকাতি লা' আশকায়নাহুম মাআন্ গাদাকা।'

'যদি তারা সোজা পথে দৃঢ় থাকতো, পাপের পথে না যেতো তাহলে আমি তাদেরকে (খুশি হয়ে) প্রচুর পরিমাণে পানি (সুবৃষ্টি) দান করতাম।'

আল্লাহ্‌তায়ালা আরও বলেন, 'ফাইন্ তাবু অ আকামুস্ সালাতা অ তাউজ্জাকাতা ফাইখ্ওয়ানুকুম ফিদ্ দ্বীন।'

'যদি তারা তাওবা করে বা দ্বীনে ফিরে আসে, নামাজ কায়েম করে, জাকাত আদায় করে তবে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই।'

তিনি আরো বলেন, 'যালিকা বিমা কাদ্দামত্‌তু আয়দিহিম০'

'হাশরের দিন পাপীদের বলা হবে, তোমাদের পাপের জন্যেই এই শাস্তি (আল্লাহ্ নারাজ হয়ে) পাচ্ছ।'

তিনি বলেন, 'যালিকা বিআন্নাহুম কাফারু বিআয়াতিনা।'

'ওরা আমার নিদর্শনগুলো অস্বীকার ও অমান্য করেছিল।'

আল্লাহ্ পাক আরও বলেন, 'ফাআসাও রাসূলা রাব্বিহিম ফাআখাজাহুম।'

'তারা প্রভূ আল্লাহ্‌র পাঠানো রাসুলের নাফরমানী করার জন্যে আল্লাহ্ তাদের ধরলেন (নারাজ হয়ে শাস্তি দিলেন)।'

তাহলে ব্যর্থ কে? যে পাপ করলো আর প্রভুর কোপানলে পড়লো।

আর প্রকৃত ব্যর্থ কে, কখন বোঝা যাবে?

হাশরের দিন।

হাশরের দিন বড় কঠিন দিন।

'কাল্লা ইজা দুক্কাতিল আরদু দাক্কান দাক্কা০'

'যেদিন জমিনকে চূর্ণ বিচূর্ণ করা হবে, ভেঙে ফেলা হবে।'

'অজ্বাউ রাব্বুকা অল্ মালাকু সাফ্‌ফান সাফ্‌ফা–'

'যেদিন আল্লাহ্ ফিরিশতা সহকারে আসবেন–'

'ইয়াওমা ইয়াখ্‌রুজুনা মিনাল্ আজ্‌দাসি ইস্‌তারাআ–'

'যেদিন তুমি কবর থেকে বেরিয়ে আসবে দ্রুতগতিতে।'

'অনুফিখা ফিস্‌সুরি ফাইজাহুম মিনাল আজ্‌দাসি ইলা রাব্বিহিম ইয়ান্‌শিলুন–'

'যখন শিঙায় ফুঁ দেয়া হবে আর দলে দলে মানব তার প্রভুর দিকে ফিরে আসবে।'

'ক্বালু ইয়াওয়লানা মাম্ বাআসানা মিম্ মারক্বাদিনা হাজা মা ওয়াদার রাহ্‌মানু অসাদাকাল মুর্‌শালুন।'

'তারা বলবে আজকের দিন কোন্ দিন? বলা হবে, এই সেই দিন যেদিন সম্পর্কে তোমাদের সমস্ত নবীও রাসুলগণ সতর্ক করেছিল।'

'হাশিয়াকান আব্‌সারুহুম।'

'সেদিন তোমাদের দৃষ্টি হবে অবনত, চেহারায় নামবে বিষাদ–'

'তুম্ বিল্লাহ–'

'আল্লাহ্‌র সামনে।'

'লা ইয়াশআলু হামিমুন হামিমা।'

'কেউ কারো খোঁজ নেবার নেই।'

'ইয়াওমা তাজ্‌হালু কুল্লু মুরদিআতিন আম্মা আর্‌দাআত।'

'যেদিন দুগ্ধপানকারিনী মা ভুলে যাবে তার বাচ্চাদের।'

বড় কঠিন দিন। সেদিন। এই দিন আল্লাহ্‌পাক মহান আরশে অধিষ্ঠিত। প্রকাশ্যে। আমরা তাঁর চোখের সামনে। আল্লাহ্ আজ সরাসরি বলবেন। আর আমরা সরাসরি শুনবো।

'মা মিন্‌কুম মিন্ আহাদ ইল্লা ফা ইয়ুকাল্লিবুল্লাহু লায়শা বায়নাহু অ বায়নাহু তারজুমান।'

'প্রত্যেকের সাথে আল্লাহ্ কথা বলবেন।'

'ইয়া ইবনে আদাম, আতায়তুহু খাওয়ালতুহ্ আন্ আম্‌তু আলাইহি–'

হাদীসে পাকে আসছে, আল্লাহ্ জিজ্ঞেস করবেন, 'হে বনি আদম। জীবন দিয়েছেলাম, সম্পদ দিয়েছিলাম, বুদ্ধি দিয়েছিলাম–বলো আজ কী নিয়ে এসেছো?'

'মাজা সানাআ তাসিহা।' 'কী করে এসেছো, বলো?'

এক বড় ভয়ঙ্কর দিন। আমার ভায়েরা, মানুষের কল্পনাকে ছাড়িয়ে যায় এমন বিভীষিকাময় দিন।

সামনে দাঁড়িপাল্লা। পেছনে মানব। চারদিকে ফিরিশতা।

দাঁড়িপাল্লার সামনে জাহান্নাম ফুঁসছে। ফুলছে।

'হাজিহি জাহান্নামুল্লাতি কুনতুম তু আদুন।'

'এই সেই জাহান্নাম! প্রবেশ করো।'

'তাফুরু তাকাদু তামাইয়াজু মিনাল গায়জি-'

'জাহান্নাম ফুঁসছে, ফুলছে, রাগে ফেটে পড়ছে।'

ডানে বাঁয়ে আমলের সারি। ওদিকেও আমল, এদিকেও আমল।

'অ-ইয়াহ্মিলু আরশা রাব্বিকা ফাওকাহুম ইয়াওমাইজিন্ সামানিয়া-'

'ওপরে মহান প্রভু আল্লাহ্‌র আরশ, আসন, চারদিকে ফিরিশতাদের পাহারা।' দাঁড়িপাল্লার কাঁটা মাঝামাঝি। আমাল নিয়ে আসছে। বান্দা জানেনা, কোনদিকে ঝুঁকবে আজ কাঁটা। ডান দিকে না বাঁ দিকে। এটা সেই সময় যখন প্রত্যেকে ভুলে যাবে অন্যকে।

এই সময় সম্পর্কে আমাদের খবর দিয়েছেন আমার নবী মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কে হবে সেই দিন ব্যর্থ?

যার নেকীর পাল্লা হালকা হয়েছে।

'ফামান খাফ্‌ফাত মাওয়াজিনুহু ফাউলাইকাল্লাজিনা খাসিরু আনফুসাহুম ফি জাহান্নামা খালিদুন-'

'যার নেকীর পাল্লা হালকা হয়ে গেছে সে ব্যর্থ হয়েছে।'

জিব্রাইল আলাইহিসসালাম ঘোষণা করবেন, 'ইন্না ফালানাব্‌না ফুলানিন ক্বাদ খাফ্‌ফাত মাওয়াজিনুহু; অ-শাকিয়া শাকাআন লা ইয়াশ্‌আদ বা'দাহু আবাদা।'

'অমুকের পুত্র অমুক এর নেকী কম হয়ে গেছে; সে ব্যর্থ হয়ে গেছে। সে আর কখনও সফল হবে না।'

এই ঘোষণার পর জাহান্নামের আগুন ফুঁসে উঠবে। 'শারাবী লাহুম মিন কাতিরান।' পাপিষ্ঠকে আগুনের পোশাক পরিয়ে দেয়া হবে। 'অ তাখ্‌শা অজুহু হুমুন্ নার।'

আগুনের টুপি পরিয়ে দেয়া হবে। আর জাহান্নামের উচ্ছ্বসিত আগুনের ঢেউএর মাঝে ফেলে দেয়া হবে। এখান থেকে সে আর কখনও বের হতে পারবে না। কোনও পথ পাবে না নিস্তারের। সে চিৎকার করবে। ভয়ার্ত আর্তনাদ! সে বাঁচতে চাইবে এই নিদারুণ কষ্ট থেকে। সে সাপ দেখবে, দেখবে বিচ্ছু। একটি সাপ উটের গর্দানের চেয়ে মোটা। একটি বিচ্ছু গাধার মতো। সে দেখবে আগুন। লেলিহান শিখা। যা অবিশ্বাস করেছিল সবই দেখতে পাচ্ছে। সে দেখবে রক্ত-পুঁজ মেশানো পানি। ফুটছে। টগবগ করে। হামীম! তার খাবার দেখতে পাচ্ছে। কাঁটা ভরা শিকড়। যা গলায় আটকে যায়। যাকুম। তার আর মৃত্যু নাই। অনাদি, অনন্তকাল। জ্বলবে, পুড়বে। সে আর্তনাদ করবে। সে কাঁদবে। তার চোখ দিয়ে রক্ত বের হবে। পুঁজ বের হবে। সে এমন ভয়াবহ, কষ্টদায়ক আজাব থেকে বাঁচতে চাইবে। সে চিৎকার করবে। আহত পশুর মতো। তার চিৎকার বাড়তে থাকবে। বেড়েই চলবে।

তখন আল্লাহ্ তায়ালা বলবেন, 'মালিক (জাহান্নামের দারোগা), তালা লাগিয়ে দাও জাহান্নামে। যেন বাইরের চিৎকার ভেতরে আর ভিতরের চিৎকার বাইরে না আসতে পারে।'

চিরদিনের জন্যে। অনন্তকাল ধরে।'

'লাহুম মিন জাহান্নাম মিহাদ-'

'এর জন্যে আগুনের বিছানা বিছাও।'

'অমিন ফাওকিহিম গাওয়াশ-'

'এর ওপর আগুনের কম্বল বিছাও।'

ওপরে আগুন, নিচেও আগুন!

ওদিকে দরজায় তালা দেয়া। যেন বের হয়ে না আসতে পারে।

এই ব্যক্তি ব্যর্থ।

খবর দিয়েছেন আল্লাহ্‌র হাবিব, আমাদের কল্যাণকামী, আকাই নামদার তাজিদারে মাদীনা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম।

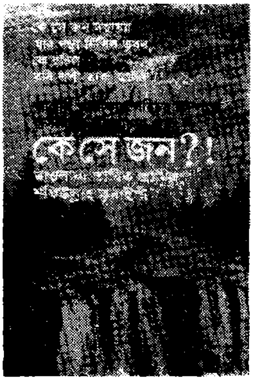

দুই

সফলকাম কে?

সাফল্য পেয়েছে কে?

কে কামিয়াব হয়েছে?

যার নেকীর পাল্লা হয়েছে ভারী।

'ফামান ফাকুলাত্ মাওয়াজিনুহু ফাউলাইকা হুমুল মুফ্‌লিহুন।'

'যার নেকী বা পূণ্য বেশি হয়েছে তিনি পেয়েছেন সফলতা।'

জিব্রাইল আমিন ঘোষণা করবেন, 'ইন্না ফালানাব্‌না ফুলানিন্ ক্বাদ ফাকুলাত মাওয়াজিনুহু অ শায়িদা শাঈদাতান লাইয়াশ্‌কা আবাদাহা আবাদা–'

'অমুকের পুত্র অমুক এর পূণ্য বেশি হয়েছে। পাল্লা ভারী হয়েছে। সে সফল হয়েছে। সে কামিয়াব। আর কখনও সে ব্যর্থ হবে না। তার সফলতা চিরদিনের, চিরকালের। অনন্ত।'

এই এলানের সাথে সাথে তার কাঁধ আদম আলাইহিমুস্‌সালাতু ওয়াস্‌সালামের মতো সাত হাত উঁচু হয়ে যাবে। সাত হাত চওড়া হয়ে যাবে। ইউসুফ আলাইহিস সালামের মতো সৌন্দর্য এসে যাবে। দাউদ আলাইহিস সাল্লামের মতো কণ্ঠস্বর হবে। আইউব আলাইহিসসালামের মতো অন্তর পাবেন। ঈসা আলাইহিসসালামের মতো বয়স ও দেহ সৌষ্ঠব পাবেন। শেষ নবী, সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতো চরিত্র হবে। ছয়জন নবী আলাইহিমুসসালাতু ওয়াসসালামের গুণাবলী তার মধ্যে প্রবেশ করবে। এক পলকে। দুনিয়া থেকে গিয়েছিল পাঁচ ফুট দেহ নিয়ে। সবার সামনে পরিবর্তন ঘটবে তার দেহের। যেমন ক্রেন কোনও জিনিসকে ওঠায় তেমন সবার দৃষ্টির সামনে বেহেশতী, সফলকাম মানুষটির কাঁধ উঁচু হতে থাকবে।

গোটা হাশরবাসী দেখতে পাবে এই দৃশ্য। তারা বলবে, 'ওই যে, একজন মুক্তি পেল! ওই যে একজন সফল হলো! ওই যে একজন কামিয়াব হয়ে গেল!'

পাঁচটা আরো গুণ প্রবেশ করবে জান্নাতীর ভেতর।

চেহারা ফর্সা আর লালিমা মাখা হবে। দেহের সমস্ত পশম অদৃশ্য হয়ে যাবে। চেহারায় দাড়ি আর থাকবে না।

'মুকাহ্‌হাল'– চোখে সুরমা লেগে যাবে। মাথার চুল কোঁকড়ানো হয়ে যাবে।

মোট এগারোটা পরিবর্তন আসবে।

আল্লাহ্ বলবেন, 'এখন আমার বান্দাকে বেহেশ্‌তী পোশাক পরাও।'

জান্নাতের একশত জোড়া পোশাক তাকে পরানো হবে।

আল্লাহ্ বলবেন, 'আমার বান্দাকে বেহেশতী মুকুট পরাও।'

জান্নাতের মুকুট তাকে পরানো হবে। যার মাঝে শোভা পারে সত্তরটি ইয়াকুত পাথর। একটা ইয়াকুত দুনিয়াতে রাখলে গোটা বিশ্বজগত চোখ ঝলসানো আলোতে আলোকিত হয়ে যাবে।

'অ-ইয়ানকালিবু ইলা আহ্লিহি মাশরুবা-' তাকে আল্লাহ্তালা বলবেন, 'এখন যাও ময়দানে মা' হাশরে তোমার লোকজনের কাছে (অর্থাৎ তারা দেখুক তোমার সম্মান!) !'

'কে তুমি?' লোকেরা জিজ্ঞেস করবে, 'তোমাকে তো চিনি না!'

'আমি অমুকের পুত্র অমুক।' বেহেশতী বলবে।

'তুমি এতো আলো কোথায় পেলে? গোটা হাশরের মাঠ আলোকিত করে দিয়েছো।'

'আমার দয়ালু/প্রভু আমায় পাপ মাফ করেছেন। আমাকে আলো দিয়েছেন। আর সম্মান। আর বেহেশত।'

'তুমি কার ঘরের ছেলে? কোন্ পাড়ার? কোন্ বংশের? কোন্ যুগের? তুমি বড় সৌভাগ্যবান। তুমি সফলতা পেয়েছো। চিরকালের!'

'আমাকে চেনো না?' সে বলবে, 'আমি অমুকের পুত্র অমুক-আনা ফুলানাবনু ফুলানিন। আমি অমুক পাড়ার, অমুক বংশের, ওই যুগের। হ্যাঁ, মহান প্রভু আমাকে করেছেন সৌভাগ্যবান। আমি পেয়েছি সফলতা। চিরদিনের। 'হাউ মুক্ রিউ কিতাবিয়া-এসো আমার কিতাব (আমলনামা) পড়ো।'

'ইন্নি জানানতু আন্নি মুলাকিন হিসাবিয়া- আমার বিশ্বাস ছিল একদিন হিসাব নেয়া হবে।'

এমন সময় আওয়াজ আসবে-

'ফাহুয়া ফি ঈশাতির রাদিয়া।'

'এ উঁচু (সম্মানিত) জীবনের মালিক হয়েছে।'

'ফি জান্নাতিন আলিয়া।'

'জাঁকজমকপূর্ণ, মর্যাদাশীল বেহেশতের মালিক হয়েছে।'

'অ তুফুহা দানিয়া।'

'যেখানে বেহেশতীর হাতের কাছে ঝুলন্ত রয়েছে ফলবৃক্ষের ডাল পালা।'

বেহেশ্তে আঙুরের একটা বীথি এতো বড় হবে যে, এক বছর ধরে একটা কাক ক্রমাগত উড়লেও তার সীমানা শেষ করতে পারবে না। এমন আঙুর গুচ্ছ জান্নাতে মাথার ওপর ঝুলিয়ে রেখেছেন আল্লাহ্তালা।

'কুলু আশরাবু হানিয়াম্ বিমা আফ্লাতু ফি আইয়ামিল খালিয়া-'

'এখন খাও, পান করো; যা কিছু তুমি দুনিয়াতে পরিশ্রম করেছিলে তার প্রতিফল ভোগ করো?'

এই হচ্ছে সফলতা। চূড়ান্ত পরিণতি। আর ওটা হচ্ছে ব্যর্থতার ঠিকানা।

একে বলে সফলতা আর ওটা হলো ব্যর্থতা।

এসব কথা কে আমাদের জানিয়েছেন? আম্বিয়া আলাইহিস সালাম। এ হচ্ছে নবীদের দেয়া খবর। মিথ্যা নয়। সত্য সংবাদ।

এই মানুষটি এখন সাফল্য পেয়েছে। তার জন্যে ঘোষণা দেয়া হচ্ছে-

'ইন্না লাকুম আন্তান্নামু ফালা তাস আলু আবাদা-'

'সুস্থ থাকো, আর কখনও অসুস্থ হবে না-'

'ইন্না লাকুম আন্ তাসিব্বু ফালা তাহ্রামু আবাদা-'

'চিরকাল যুবক থাকো কখনও বুড়ো হবে না-'

তিন

এই সফলতাকে কে নেবে ব্যর্থতা থেকে বেঁচে?

যে আল্লাহ্‌কে রাজী করেছে।

ব্যর্থ হয়েছে কে সফলতার সোনালী স্বাদ না পেয়ে?

যে অসন্তুষ্ট বা নারাজ করেছে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনকে।

আল্লাহ্ পাক কার ওপর রাজী হবেন?

যিনি তার জীবনকে সাজিয়েছেন, গড়েছেন নবীয়ে করিম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম এর তরীকা বা আদর্শে।

কার ওপর আল্লাহ্‌তায়ালা সন্তুষ্ট হবেন?

যিনি সম্পর্ক গড়েছেন আল্লাহ্‌তায়ালার সাথে ভালবাসার।

সোয়া লাখ নবী এসেছেন। তাঁরা দুনিয়াতে একটা কাজ করেছেন। দুনিয়াতে আদম আলাইহিসসালাম পেশা শিখিয়েছেন। এক হাজার পেশা। মানুষ দুনিয়াতে পেশার লাইনে যা কিছু করছে তা এখনও আদম আনা নবী আলাইহিসসালামের জ্ঞানকে অতিক্রম করতে পারেনি। জ্ঞান-বিজ্ঞানের যতই পরিবর্তন আসুক মানুষ ওই এক হাজার পেশার বলয় থেকে বের হতে পারবে না। ওই এক হাজার পেশার ভিতরেই মানুষ আবর্তিত হতে থাকবে। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ওই পেশাগুলোর সাথে সামঞ্জস্য ও ভারসাম্য রেখে দিয়েছেন দ্বীনের। যাতে ওই সব জীবন যাপন পদ্ধতিতে দ্বীন জীবিত বা প্রকাশ করা যায়। আর নবীদের পাঠিয়েছেন একটি কাজ দিয়ে। কাজটি হচ্ছে, তুমি আমার সাথে বান্দাদের মিলিত করো। বান্দা আর আমার মাঝে মিলনের সেতু রচনা করো।

তাদের বলো, মৃত্যুর পর আর এক জীবন আসছে। অন্তহীন, অনাদিকাল থাকতে হবে সেখানে। সে জীবনের জন্যে তোমরা তৈরি হয়ে এসো।

আমার সম্মানিত ভাই আর বুজুর্গ এখন তায়ালা চান তাঁর সাথে আমরা জুড়ে যাই, মিলিত হই। আমাদের কাজ কাজ হচ্ছে তার ভালবাসার বাঁধনে জড়িয়ে পড়া।

এমন রাহমান, এমন রাহীম খোদা! তাঁর হুকুম যা অক্লেশে পালন করা যায় তা আমরা মানি না। আল্লাহতালা বলেন, 'ইয়া ইবনে আদাম, লি আলাইকা ফারিদা, অলাকা আলাইকা রিজ্‌কুক-' 'হে আদমের সন্তান, হে আমার বান্দা, এক কাজ আমার আর এক কাজ তোমার। তোমাকে রুজি পাঠানো আমার কাজ আর আমার হয়ে থাকা তোমার কাজ। আমি তোমাকে রুজি দেব এটা আমার কাজ আর তুই আমাকে মানবি এটা তোর কাজ।'

'ফাইন খালাক্‌তানি ফি ফারিদাতি লাম্ উখ্‌লিকা ফি রিজ্‌কিক-'

'বান্দা তুই যদি আমার হুকুম নাও মানিস তবুও আমি তোকে রুজি পৌছে দেব। যদি তুই আমার ইবাদাত ছেড়ে দিস, আমার আনুগত্য যদি তোর ভালো নাও লাগে তবু আমি তোর রুজি দিতে থাকবো, রুটি আমি তোকে খাওয়াতে থাকবো।'

'ফাইন রাদিতাবিমা কাসাম্‌তাহু লাক্-'

'এই যে আমি তোকে রুটি দিলাম তুই আমার উপর রাজী আর খুশি হয়ে যা-'

'আরাকতু কাল্‌বাক অ-বাদানাক্-'

'তোকে আপন প্রেমিক বানাবো আর তোর দেহ ও মনকে শান্তিতে ভরিয়ে দেব-'

'অ-ইল্‌লাম তারদা বিমা কাসাম্‌তুহু লাক্-'

'আর যদি আমার দেয়া রুজির ওপর তুই সন্তুষ্ট না হোস; রুজির পেছনে দুনিয়া কামানোর পেছনে যদি অশান্ত হয়ে ছুটতে থাকিস, হারাম হালাল বাছ বিচার না করিস–'

'ফালা ইজ্জাতি অ-সুলতানি' 'তাহলে মনে রেখো, আমার ইজ্জত মর্যাদা আর বাদশাহীর কসম–'

'লা উসাল্লিতানা আলাইকাল দুনিয়া–'

'আমি তোর ওপর দুনিয়াকে চড়াও করে দেব–'

'ফার্‌কাদ্‌ ফিহা রাক্‌দান উহুসি ফিল্‌ বারিয়া–'

'তখন তুই দুনিয়ার পেছনে এমন উম্মাদের মতো ছুটতে থাকবি যেমন শিকারীর ভয়ে পালাতে থাকে জানোয়ার।'

'সুম্মা লা ইয়াকুল্‌ লাহা মিন্‌হা কাতাব্‌তুহু লাক্‌–'

'তারপরও তুই ঐটুকুই পাবি যতটা তোর কপালে আমি লিখেছিলাম।'

'অতাকুনু ইন্‌দি মাগলুমা–'

'তখন তুই আমার (রাহমানুর রাহীম) সুনজর থেকে সরে যাবি।'

তো সেই রাহমান আর রাহীম আল্লাহ্‌ আমাদের কতুটুকু ভালবাসেন?

আল্লাহ্‌ আকবার!

'ইয়া ইবনে আদাম, ইন্নি লাকা মুহিব্বুল ফাবি হাক্কি আলাইকা কুল্লি মুহিব্বা–'

হাদীসে কুদসীতে এসেছে, 'হে বনী আদম, আমি তোকে ভালবাসি, তোর ওপর আমার সেই ভালবাসার দাবী তুই-ও আমাকে ভালবাস্‌! হে আমার বান্দা, আমি তোকে ভালবাসি, তোর ওপর আমার ভালবাসার কসম, তুই-ও আমাকে একটু ভালবাসা দে!'

'ইয়া ইবনে আদাম, ইন জাকার্‌তানি জাকারতুক–'

'হে আদমের সন্তান, তুই আমাকে স্মরণ কর্‌ আমিও তোকে স্মরণ করবো–'

'অইন্‌ নাসাতানি জাকারতুক–'

হায়রে মানুষ! তুই আমাকে যদি ভুলে যাস তবুও আমি তোকে মনে রাখি আমি কখনও তোকে ভুলি না।

'তু শাফি নি অশাফিক–'

'আমার সাথে বন্ধুত্ব কর্‌, আমিও হবো তোর বন্ধু–'

'তু-ওয়ালিনি অ-ওয়ালিক–'

'আমার সাথে যখন খারাপ ব্যবহার করবি আমি কিন্তু তখনও তোর ভালো করবো–'

'তু-ওয়া রিদওয়ান্নি অ-আনা মু'মিনুন আলাইক–'

'আমি দেখতে থাকি কখন তুই খারাপ আচরণ ছেড়ে ফিরে আসিস আমার দিকে–'

আর যখন তুই আমার প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়ে, আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে শয়তানের পথ ধরিস আমার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করে দিস, আমার দিকে পিঠ ফিরে চলে যাস; তবুও আমি অপেক্ষা করি। যদি তুই এখনি ফিরে আসিস কাছে। তুই যতই আমার থেকে দুরে সরে যাবি আমি কিন্তু তোর দিক থেকে মুখ ফেরাবো না। আমি শুধু তোকে দেখতে থাকবো। দেখতেই থাকবো। মনে করবো, এই বুঝি ফিরে এলো আমার বান্দা।

'তু ওয়া রিদওয়ান্নি অ-আনা মুমিনুন আলাইক–'

তুই আমার ওপর রাগ করবি আমি তোকে দেখতে থাকবো। যেমন, মা তার সেই মাসুম বাচ্চার জন্য অপেক্ষা করে থাকে, যে তার ওপর রাগ করে চলে গেছে চোখের সামনে থেকে দূরে। মা কিন্তু তার পথের পানে চেয়েই থাকে। ভাবে, এই বুঝি ফিরে এলো আমার বাচ্চা! এই বুঝি ফিরে এলো আমার কাছে।

আল্লাহ্‌ তো তার বান্দাকে মায়ের চেয়ে সত্তর গুণ বেশি ভালবাসেন।

এক হাদীসে এসেছে, সবচেয়ে বেশি খুশি হন আল্লাহ্‌ যখন বান্দা তাওবা করে। আমাদের গোনাহের কোনও মূল্য বা প্রভাবই নেই আল্লাহ্‌র ক্ষমা আর দয়ার সামনে।

সবচেয়ে বেশি খুশি হন আল্লাহ্‌তাআলা বান্দার 'তাওবা'র উপর। কেমন খুশি হন?

'ইজা তা'বালা আব্‌দু লাহুল কানাদিনু ফিস্‌ সামায়ি–'

'যখন কোনও বান্দা তাওবা করে তখন আসমানে সাজ সাজ রব পড়ে যায়।' জ্বালানো হয় প্রদীপমালা। যেমন ধনী লোকেরা বিয়ের অনুষ্ঠানে জ্বালায়। আর এক ফিরিশতাকে দিয়ে বলা হয়–

'ইস্‌তা লাহাল আবদু আলা মাওলা–'

'শোনো শোনো হে আসমানের বাসিন্দারা! আজ এক বান্দা আল্লাহ্‌র সাথে সন্ধি করে নিয়েছে।' এমন প্রতিপালক, এমন দয়াল আল্লাহ্‌তায়ালা!

তার সাথে সম্পর্ক তৈরি না করা কতবড় অন্যায়! তিনি আমাদের ফিরে আসার (তওবা) ওপর সমস্ত গোনাহকে কেটে দেন।

'ইয়া ইবনে আদাম, লাও, বালাগাত জুনুবুকা আনা নাস্‌সামাআ সুম্মাস্‌ তাগ্‌ফারতানি গাফারতুলাকা অলা উবালি–'

'হে আদমের সন্তান, যদি তোমার গোনাহ জমিন ভরে আসমানেও পৌঁছে যায়, যদি চাঁদ সুরুজকে ছুঁয়ে যায় তবুও তুমি যদি বলো, 'হে আল্লাহ্‌, তুমি আমাকে মাফ করে দাও–' সাথে সাথে তোমার গোনাহ্‌ আমি এমনভাবে মাফ করে দিই যেন তুমি কোনও গোনাহ্‌–ই করোনি।'

এমনই হচ্ছে, রাহমান আর রাহীম আমাদের প্রভু।

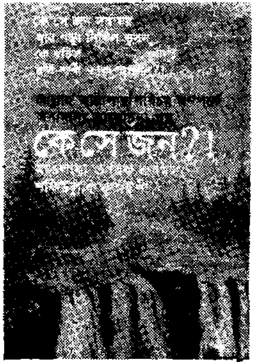

চার

এমন কারিম, রাহিম, শফিক, হান্নান, মান্নান, রাহমান, দায়আন আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক না করা; আর টাকা, পয়সা, ধন দৌলতের সাথে সম্পর্ক করা বা মন লাগানো কতবড় অন্যায়, কত বড় জুলুম! নবী ও পয়গম্বরগণ বান্দাদের এমন অন্যায় থেকে বের করে আনতেন। নবীরা কী করতেন?

এমন জুলুম বা অবিচার থেকে আল্লাহ্‌র বান্দাদের উদ্ধার করতেন। তারা বলতেন, ভাই তুমি মালিককে চিনে নাও। তোমার স্রষ্টাকে চিনে নাও। ভাই, তার সাথে সম্পর্ক করো যিনি তোমাকে পয়দা করেছেন। আল্লাহ্‌পাক নিজে বলেন–

'ইয়া আইয়্যুহাল ইনসানু মা গাররাকা বিরাব্বিকাল কারীম।'

'হে পথভোলা মানুষ! কী জিনিস তোমাকে দয়ালু প্রভুর ব্যাপারে ধোঁকা দিয়ে দিল! কেন ভুলে গেলি দয়ালু মালিককে।'

আল্লাহ্‌পাকের তো অনেক বড় বড় গুণবাচক নাম আছে; কিন্তু আল্লাহ্‌তায়ালা যখন কুরআনকে শুরু করলেন তো সবার পয়লা নিজের রবুবিয়াতের সাথে বান্দার পরিচয় করিয়েছেন।

'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।'

'সব প্রশংসা আল্লাহ্‌তায়ালার–'

আল্লাহ্‌ কে ? তিনি, যিনি সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক, রব! রাব্বিল আলামীন!

আল্লাহু আকবার! তিনি কিভাবে প্রতিপালন করেন? আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন–

'শারুরুহুম ইলাইয়া শায়িজ অ় খায়রি ইলাইহিম্ নাজিল আক্লাওহুম ফি মাদাজিইল কাআন্নাহুম ইয়াম্ইয়াম্ আকুনি–'

'আমি তোমাদেরকে এমনভাবে প্রতিপালন করি যে, প্রতিদিন তোমার গোনাহ্ আমার কাছে আসে তবু আমার রহমতের দরোজা আমি খুলে দিই। আর আমি রাতের বেলা তোমাকে এমনভাবে ঘুম পাড়িয়ে দিই যে, যেন তুমি আমার কোন অবাধ্যতাই করোনি!'

তো আমার ভাই!

নবী কী করেন? নবী আমাদের বলেন, আল্লাহ্র থেকে সবকিছু হয়। আল্লাহ্ই বাঁচান ও মারেন। তিনি ইজ্জত দেন, তিনিই অপমান করেন। কাজেই আল্লাহ্র দিকে এগিয়ে যাও। দৌড়ে চলো। তাঁর জন্যে মৃত্যুকে বরণ ও আপন করে নাও।

আল্লাহ্ কি রকম রাহ্মান, রাহীম, কারিম বা দয়ালু?

'ইন্ তাকার্‌রাব ইলাইয়া শিব্‌রা–'

'তুমি এক বিঘত আমার দিকে এসো–'

'তাকার্‌রাব্‌তু ইলাইহি জিরাআ–'

'আমি এক হাত এগিয়ে যাবো তোমার দিকে–'

'ইন তাকার্‌রাব্ ইলাইআ জিরাআ–'

'তুমি এক হাত এগিয়ে এসো–'

'তাকার্‌রাব্‌তা মিনহু বায়া–'

'আমি দু'হাত এগিয়ে যাবো–'

'ইন্ আতানি ইয়াম্‌শি–,

'তুমি চলতে থাকবে–'

'আতায়তুহু হারওয়ানা–'

'আমি তোমার দিকে দৌড়ে আসবো।'

তার মানে আল্লাহ্র রহমত বা দয়া দৌড়ে আসবে।

কত বড় কারিম, রাহ্মান, রাহিম, দয়ালু আল্লাহ্তায়ালা। বান্দা সামান্য উদ্যোগ নিবে তিনি দৌড়ে এসে তাকে বুকে জড়িয়ে নেবেন। সুব্হানাল্লাহ!

তো ওই আল্লাহ্তায়ালাকে মন দেয়া এবং সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর প্রভাব দিল থেকে বের করা হচ্ছে সফলতার প্রথম সিঁড়ি।

আমি ওই আল্লাহ্তায়ালাকে মানবো। যিনি ছাড়া কেউ কিছু করতে পারে না, তিনি সবকিছু ছাড়া যাবতীয় কাজ সম্পাদন করেন। আমি বিশ্বাস আনবো আল্লার প্রতি তাঁর সমস্ত ক্ষমতা ও গুণাবলী সহকারে। তাঁর গুণবাচক নাম কি? রাহ্মান, রাহিম, কারীম, জাব্বার, হান্নান, মান্নান। তিনি দয়ালু, পরম করুণাময়। তিনি আমাকে ভালবাসেন মা'র চেয়ে। মায়ের ভালবাসার চেয়ে সত্তুরগুণ বেশি ভালবাসেন।

যে মায়ের একটা মাত্র ছেলে। চোখের তারা সে মায়ের। অন্তরের একমাত্র শান্তির কারণ সে। কলিজার টুক্‌রা। কিন্তু ওই মাকেই ছেলে যখন একবার ডাকে 'মা–'। মা জবাব দেন 'জ্বি'। আবার ছেলে ডাকে 'মা'। 'জ্বি'– জবাব দেন মা।

ছেলে আবার ডাকে। মা জবাব দেন। আবার ডাকে ছেলে। মা জবাব দেন। ছেলে বার বার ডাকে। হঠাৎ বিরক্ত হয়ে যান মা। বলেন, 'মা' 'মা' ডেকে মাথা খাবি নাকি? চুপ কর্!'

অথচ বান্দা যখন তার প্রভুকে ডাকে 'আল্লাহ্!'

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন সত্তর বার তার জবাব দেন। সুব্হানাল্লাহ!

আবার ডাকে 'ইয়া আল্লাহ্!'

'লাব্বাইক ইয়া আবদি!'

'আমি হাজির আছি হে আমার বান্দা!' জবাব দেন আল্লাহ্। সত্তুর বার! আল্লাহু আকবার।

এই ভাবে বান্দা হাজার বার ডাকে। 'ইয়া আল্লাহ্।' সত্তুর হাজার বার জবাব দেন আল্লাহ্।

'লাব্বাইক' 'লাব্বাইক'---!

একটা ঘটনা আছে।

এক মূর্তিপূজক ছিল। সে আল্লাহ্তায়ালা সম্পর্কে কিছুই জানতো না। আমরা তো মুসলমান হিসাবে আল্লাহ্তালার জাত ও সীফাতকে জানি। তো সেই পূজারী পূজার ঘরে ঢুকে মূর্তিকে ডাকতো 'সনম' 'সনম'---।

সত্তর বছর ধরে সে ডাকলো। একদিন হঠাৎ। ফসকে ভুল একটা শব্দ বেরুলো তার মুখ থেকে। 'সামাদ'।

আসমান থেকে সাথে সাথে প্রতি উত্তর ভেসে এলো 'লাব্বাইক ইয়া আব্দি!'

ফিরিশতারা আরজ করলো, 'হে আল্লাহ্! এই পূজারী তো আপনার সম্পর্কে জানেই না।'

'কিন্তু সে আমাকে ডেকেছে।' বজ্রনির্ঘোষে আল্লাহ্ বললেন।

'ভুল করে ডেকেছে, হে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন! তবু আপনি জবাব দিলেন?!'

'আরে ফিরিশতারা! আমি সত্তর বছর ধরে অপেক্ষা করছি কখন আমার এই বান্দা আমার নাম উচ্চারণ করবে। একবার মাত্র। আর সাথে সাথেই 'আমি হাজির বান্দা' বলবো। যদিও সে ভুল করে আমাকে ডাকে।'

হায় দুর্ভাগা মানুষ!

তুই চিনলি না তোর দয়াল মালিককে!

মালিক রাহমান, মালিক রাহীম, মালিক কারীম।

তিনি চান তাঁর বান্দার অন্তর আর কারো দিকে না পড়ুক। আর কারও দিকে ঝুঁকে না যাক। আমার এতো আদরের বান্দা সে যেন আমারই সৃষ্ট অন্য কোনও জিনিসকে মন না দিয়ে বসে।

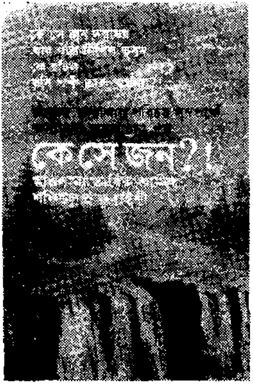

পাঁচ

তো এই আম্বিয়া আলাইহিসসালামের কাজ ছিল যাতে আমরা ওই দয়ালু মালিকের সাথে মিলিত হই, সম্পর্ক করি। যাঁর হাতে আসমান জমিনের যাবতীয় ভান্ডার।

ভাই,

দুনিয়াতে বড় কাকে বলে?

যার কাছে অনেক বেশি সম্পদ আছে, বেশি জমিন আছে, জমিদারি আছে। যার আছে অনেক বড় ব্যবসা, ক্ষমতা। কিন্তু আসলে সে বড় নয়। বরং তিনি বড় যিনি তাকে ওই সব জিনিস দান করে বড় করেছেন দুনিয়ার মানুষের কাছে। যিনি তাকে জমি, ব্যবসা, ক্ষমতা আর সম্পদ দিয়েছেন তিনি মহা ক্ষমতাধর, প্রবল পরাক্রান্ত। আল্লাহ্ বড়। আর এই যে বড়ত্ব, বড়াই আর প্রতাপ এতো সামান্য সময়ের জন্যে। আজ যদি তার জমিন কেড়ে নেয়, কেড়ে নেয় ক্ষমতা, সম্পদ, ব্যবসা ও পদমর্যাদা?

তো কেউ তাকে আর জিজ্ঞেসও করবে না। অনেক বড় কর্মকর্তা, অবসর নিয়ে নিক কেউ তাকে মূল্য দেবে না।

আরেক সম্পর্ক আছে। যা মানুষকে সবচেয়ে বড় করে। তা হচ্ছে, 'মান রাফাআস্ সামাআ বি কুদরাতিহি-' 'যিনি আকাশকে উঁচু করে দিয়েছেন আপন অপার ক্ষমতা বলে...'

'বিগায়রি আমালিন তারাওনাহা-'
'যিনি বিনা খুঁটিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন আকাশকে'
'আলাম নাজ্আলিল আরদা মিহাদা-'
'কি আমি জমিনকে তোমাদের জন্যে করে দিইনি বিছানা?'
'অল জিবালা আওতাদা-'
'আমি কি পাহাড়গুলোকে পুঁতে দিই নি পেরেকের মতো?'
'অ-বানায়না ফাওকাকুম শাব্আন সিদাদা-'
'আমি সাত আকাশকে করে দিয়েছি ছাদ-'
'আন্না সাদাব্ নাল মা আসাব্বা-'
'কি আমি পানি বর্ষণ করে দিইনি?'
'সুম্মা শাকাক্নাল আরদা শাক্কা-'
'জমিনকে কি আমি চিরে ফেলিনি?'
'খালিকুল হাব্বি অন্ নাওয়া-'
'বীজ থেকে অঙ্কুরোদগম কি আমি করিনি?'
'ইয়ুলিজুল লাইলা ফিন্ নাহার-'
'কি আমি রাতকে বদলে দিই নি দিন দিয়ে?'
'ইয়ুলিজুল নাহারা ফিল্ লাইল-'
'আবার কি দিনের পেছনে রাত্রিকে অনুসরণ করাইনা?'

রাত ও দিনকে বড় করে কে? কে ছোট করে রাত ও দিনকে? আমি আল্লাহ্ করি।

'ইয়ুগ্শিল লাইলা অন্ নাহার-'
'রাত ও দিনকে সামনে ও পিছনে করি আমি।'
'গরম ও শীত আমি আনি।'

'অশ্ শামসু তাজরি লিমুস্ তাকারিল্লাহা জালিকা তাক্বদীরুল আজিজুল আলীম-'

'তিনি সূর্যকে পূর্বে উদয় ও পশ্চিমে অস্ত দেন; যার মাঝে রয়েছে পরাক্রান্ত আল্লাহ্তায়ালার প্রকাশ্য নিদর্শন।'

'অজাআলনা সিরাজাঁও অহ্হাযা-'
'তাকে (সূর্য) তৈরি করেছি জ্বলন্ত তীব্র প্রদীপ হিসেবে-'
'অল কামারা কাদ্দারনাহু মানাজিলা হাত্তা আদাকাল উরজুনীল ক্বাদিম-'

'চাঁদকে আমিই ছোট ও বড় করি। তা কখনও খেজুর গাছের শাখার মতো পাতলা হয় আবার থালার আকার ধারণ করে-'

'অস্সামাআ রাফাআহা-'

'আসমানকে আমিই করেছি উঁচু-'

'জমিনকে নিচু করেছি আমিই। আমার পরাক্রমের দ্বারা। সৃষ্ট বস্তু তৈরি হয়েছে আমি ইচ্ছে করেছি বলে।

'ইন্না ফি খালকিস্ সামাওয়াতি অলআরদি-'

'লক্ষ্য করো, আমার তৈরি আকাশ ও জমিনের দিকে-'

'অখ্তিলাফিল লাইলি অন্ নাহার-'

'লক্ষ্য করো, দিন ও রাত্রির পরিবর্তন।'

রাত আসে, আঁধারই আঁধার! সূর্য ওঠে, আলোয় আলো! সূর্য অস্ত যায়, ফের অন্ধকার। গাঢ় কালো অন্ধকার।

'অল ফুল্কিল লাতি তাজরি ফিল বাহ্রি বিমা ইয়ান ফাউন নাস-'

সাগরের বুকে ছুটে চলেছে ছোট জাহাজ। কে তাকে পৌঁছে দেয় তীরে? একমাত্র তিনি আল্লাহ্। একা। একাকী তিনিই সমাধান করেন সকল সমস্যার। এক মহাসমুদ্রে এতো বড় ক্ষমতা রয়েছে যে তার একটা ঢেউ গোটা দুনিয়াকে নিমজ্জিত করে দিতে পারে সমুদ্রের অতল তলায়। সেখানে সেই উত্তাল, বিশাল পাহাড়ের মতো ঢেউগুলোর মাঝে একটা ছোট্ট জাহাজ তো কিছুই না। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, 'ওই উত্তুঙ্গ উর্মিমালার মাঝে আমিই ভাসিয়ে রাখি জলযানগুলোকে। আমিই পৌঁছে দিই তীরে।'

'অমা আনজালনাহু মিনাস সামায়ি মিম্মা-'

'তারপর দেখো তোমরা বৃষ্টির দিকে। আকাশ থেকে কোমল ফোঁটায় যা নেমে আসে মাটির বুকে।'

যদি ফোঁটাগুলো সুতীক্ষ্ণ ধারালো করে দিতেন তাহলে ধ্বংস হতো পৃথিবী; ঘর বাড়ি অট্টালিকার ছাদ ফুটো হতে হতে ভেঙে পড়তো।

তো এই আল্লাহ্, রাব্বুল আলামীন, যিনি সমস্ত সৃষ্টি বস্তুর মালিক। তাঁর মুঠোয় রয়েছে বিশ্ব ব্রম্মান্ড।

'অল আরদু জামিয়ান কাব্দাতুহু।'

'জমিন তাঁর কব্জা (মুঠো)র ভেতর।'

'অস্ সামাওয়াতি মাত্বিয়াতুন বিইয়ামিনিহি-'

'এবং আকাশগুলো তাঁর মুঠোর ভেতর-'

'ইয়ুখ্রিজুল হাইয়া মিনাল্ মাইয়িতি-'

'তিনি জীবনের ভিতর থেকে মৃত্যুকে বের করে আনেন-'

'ইয়ুখরিজুল মাইয়িতা মিনাল হাইয়ি-

'তিনি মরণের ভিতর থেকে বের করে আনেন জীবনকে-'

তিনি মরুভূমিকে পরিণত করেন শস্য শ্যামল সবুজে। সাগরের পানিকে তৈরি করেন বাষ্পে। হাওয়াকে আদেশ করেন বাষ্পকে শূণ্যে ওঠাতে। সেখানে বাষ্পকে আদেশ দেন মেঘ হতে। মেঘকে হুকুম দেন বৃষ্টি হতে।

'ইয়ুসাদ্দিতুর রাদে বিহাম্দিহি-'

'তারপর ফিরিশতা তাকে খিঁচতে থাকে-'

এরপর ওই মেঘমালা থেকে নেমে আসে বৃষ্টি। ফোঁটায় ফোঁটায়। জমিনের দিকে। এদিকে জমিনকে হুকুম দেন 'বুককে চিরে দে'। জমিন চিরে দেয়। বৃষ্টির ফোঁটা আশ্রয় নেয় তার পেটে।

'আ আন্তুম আন্জাল তুমুহু মিনাল্ মুজ্নি আম্ নাহ্নুল মুনজিলুন-'

'বৃষ্টি তোমরাই বর্ষণ করাও, না আমি আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করি?'

তারপর বীজকে বলেন, 'তোর বুক চিরে ফেল্! বীজ অঙ্কুরিত হয়। কান্ড তৈরি করেন। তাকে বলেন, 'শিকড় তুমি মাটির আরো গভীরে যাও।' সে আরও গভীরে যায়। সেখানে তাকে ফের আদেশ দেন, 'মাটি থেকে খাদ্য ও পানি সংগ্রহ করো।'

সে তাই করে। এবার উপরে তোমার ডালপালা ছড়িয়ে দাও। তারপর পাতাকে আদেশ দেন, 'পাতা উপরের দিকে ওঠো'। ওঠে। বাতাসকে বলেন, 'বাতাস তুমি এতো জোরে প্রবাহিত হয়োনা যে পাতা ছিঁড়ে যায়, উড়ে যায়। হাওয়া থমকে যায়। ছোট্ট একটা পাতাকে হাওয়া উড়িয়ে নিতে পারে। কিন্তু আল্লাহ্‌র হুকুম। সে জোরে প্রবাহিত হয় না। এমনিভাবে শিকড়কে নিচে যেতে বলেন। পাতা, ডালপালাকে উপরে উঠতে বলেন।

'কাজার্ ইন আখ্‌রাজ্জা সাত্‌রাহু; ফাআজারাহু ফাস্‌তাগলাজ্জা ফাস্‌তাআ আলা শুকিহি–'

এটা আমার রব একাই করেন। তিনি জমিনকে চিরে দেন, বীজের বুক ফাটিয়ে দেন, শিকড়কে নিচে নেমে যেতে বলেন, পাতাকে উপরে ওঠান, পাতাকে বড় করেন। ডালকে বলেন, 'শাখা তৈরি করো'। শাখা তৈরি হয়। শাখাকে বলেন, 'প্রশাখা তৈরি করো।' প্রশাখা তৈরি হয়।

তাকে বলেন, 'কলি তৈরি করো।' কলি তৈরি হয়। কলিকে বলেন, 'ফুল তৈরি করো' ফুল তৈরি হয়ে যায়। ফুলকে বলেন, 'ফল তৈরি করো–।' ফল তৈরি হয়ে যায়।

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, 'অমা তাখরুজু মিন্ সামারাতিম্ মিন্ আক্‌মামিহা–' 'আমি জানি গাছের কোথায় কোন্ জায়গায় ফল আসবে। আমি সব জানি ।'

'অমা তাহ্‌মিনু মিন্ উন্‌ফা।' 'অমা তাদাও ইল্লা বিইজ্‌নিহী' 'আমি জানি, গর্ভবতী নারীর পেটের ভিতর কি আছে? আর এও জানি সমুদ্রের তলায় কি আছে। কোটি কোটি মাছের পেটের ভিতর কি আছে আমি জানি । মানুষ তো বটেই , কোটি কোটি মাদী জীব জানোয়ার, সাগরের অতল তলার লাখ লাখ মাদী মাছ, মাটির উপরে ও গভীরের কোটি কোটি মাদী কীট–পতঙ্গের পেটের ভিতর কি আছে তাও তিনি , আল্লাহ্ জানেন ।

কতগুলো মুরগীর ডিম মানুষ খাবে, কতগুলো পচবে ,কতগুলো ডিম পাড়বে ,কতগুলো বাচ্চা ফুটানোর জন্যে বসানো হবে, তার থেকে কতগুলো নষ্ট হবে আর কতগুলো বাচ্চা হয়ে বেরিয়ে আসবে তিনি, মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন জানেন। বাচ্চা গুলোর ক'টা মোরগ আর ক'টা মুরগী হবে তাও তিনি জানেন। 'অশিয়া ইল্‌মুহু।' সব তাঁর জ্ঞানের মধ্যে রয়েছে। সব কিছুর ওপর মহাজ্ঞানী আল্লাহ্‌র জ্ঞান ছায়া ফেলে রেখেছে।

'অসিয়া সামিউল আখলাক' তাঁর শোনার ক্ষমতা এতদূর পর্যন্ত রয়েছে যে গোটা দুনিয়ার মানুষ কথা বলতে শুরু করে, আর সেটা যদি সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে শেষ দিন পর্যন্ত যত মানুষ এসেছে, আর আসবে সবাই মিলে বলে, তবুও তিনি তা এক পলকে শুনে নেন। প্রত্যেকের আলাদা কথা, ভাবভঙ্গী ,দাবী–দাওয়া, চাওয়া–পাওয়া সব তিনি শুনে নেন হুবহু। তা জীবিত হোক বা মৃত ,যুবক হোক বা বৃদ্ধ, দানব হোক বা মানব, কীট বা পতঙ্গ, জীব হোক বা জানোয়ার, হিংস্র জীব হোক বা নিরীহ প্রাণী, কালো মানুষ হোক বা সাদা, আরবী হোক বা আজম, পশ্‌তুতে হোক বা হিন্দী, আরবীতে বলে বা বাঙলায়, উর্দুতে বলে বা হিব্রু, ইংরেজীতে বলে বা ফ্রেঞ্চ, ডাচ ভাষায় বলে বা ল্যাটিন– সারা দুনিয়ার সব ভাষাভাষীর মানুষ বলুক বা বিচিত্র নিজস্ব ভাষায় জীব জানোয়ার, কীট পতঙ্গ, পোকা মাকড় সবাই যদি একসাথে আল্লাহ্‌র কাছে চাইতে থাকে আল্লাহ্ তা শুনে নেন। পলকে। এক মুহূর্তে।

'লা ইয়ুস্‌মিলুহু শামআন্ আন্ শাম্,অলা কাওলাম্ আন্ কাওল, অলা মাসআলাম্ আন্ মাসআলা।' আল্লাহ্‌তায়ালা এমন প্রতিপালক ও শ্রোতা যে, যে কোনও ভাবে যে কোনও ভাষায় –যা কিছু বলে সব শুনে ফেলেন কোনও শোনাতে ভুল হয় না। আর প্রত্যেকের কথা শোনেন । কমা, দাঁড়িসহ।

'অলা ইয়াতাবার্রাম বি আল্হাহি অবিল হাজাত।'

'আর তোমাদের চাওয়া, পাওয়া করে দেখাতে আমার কোনও অভাব পড়ে না।'

কোনও মানুষের কাছ থেকে জান বাঁচাতে চাও তো তার কাছে ধার চাও ; সে তোমার বাড়ির রাস্তা ছেড়ে দিবে । কিন্তু মহান রাব্বুল আলামিনের সাথে সম্পর্ক গভীর করতে চাও তো তার কাছে তোমার যাবতীয় প্রয়োজন চাও। তিনি তোমার বন্ধু হয়ে যাবেন ; তাঁর রহমত টুকরো টুকরো হয়ে চলে আসবে তোমার কাছে । তাঁর কাছে চাইলে খুশি হন, না চাইলে নারাজ হন। তিনি এমন দেনেওয়ালা, এমন দাতা যে জান্নাতে সবাইকে একত্রিত করবেন। সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ দিন পর্যন্ত যত লোক বেহেশতী হয়েছে তাদের সবাইকে ডাকবেন। বলবেন 'আমার বান্দা আজ তুমি চাইবে আমি দেবো। আজ চাও।'

'লান কুমাতিমাল ইয়াওমা বিক্বাদ্রি আমালিকুম-'

'আজ তোমাদের পূণ্য কর্মের প্রতিদান হিসেবে দেব না। দেবো আমার রহমত থেকে। কাজেই চাও।'

বান্দা বলবে, 'হে আল্লাহ, আমি আর কী চাইবো, তুমি তো সবকিছু দিয়েছো!'

'না বান্দা, তবুও চাও।'

'আচ্ছা, হে পরম প্রভু, তুমি আমাদের উপর রাজী হয়ে যাও,' তখন বান্দা বলে।

আল্লাহ্ পাক বলেন, 'বিরাদা-ই ইয়ান্কুম আহলাল্তুকুম বি দুয়ারী-'

'আরে! রাজী হয়ে গেছি বলেই তো এখানে বসিয়েছি। আজ এখন চাও, কী চাইবার আছে?'

চাইতে চাইতে ক্লান্ত হয়ে যাবে বান্দা। তখন আল্লাহ্তায়ালা বলবেন, 'সামান্য চেয়েছ, আরো চাও।' আবার চাইতে শুরু করবে। ক্লান্ত হয়ে পড়বে তারা।

তখন আল্লাহ্তায়ালা বলবেন, 'সামান্য চেয়েছ। আরও চাও।'

'আর কি চাওয়ার আছে?'

'এখন পর্যন্ত তো তোমরা তোমাদের শান মতো চেয়েছ। এবার আমার শান মতো চাও।'

এবার বান্দারা চিন্তান্বিত হয়ে পড়বে। কী চাওয়া যায়? চাওয়ার তো আর কিছু দেখছি না। আজ তাদের বুদ্ধি কিন্তু পার্থিব বুদ্ধি নয়, বেহেশতী বুদ্ধি। বেহেশতী মস্তিস্ক, বেহেশতী মেধা, বেহেশতী চিন্তাক্ষমতা। তবু তারা আর খুঁজে পাচ্ছে না। তাদের চাওয়ার আর কী বাকী থাকতে পারে।

আবার আল্লাহ্তায়ালা বলেন, 'বান্দা, আরো চাইতে থাকো।'

বান্দা আবার প্রার্থনা করতে থাকবে। ক্লান্ত, দিশেহারা। তারা বলবে, 'ও আল্লাহ্, আর তো চাওয়ার কিছুই দেখছি না! কি চাইবো!'

আল্লাহ্তায়ালা বলেন-

'ইয়া ইবাদি ক্বাদ রাদিতুম বিদুনি মা ইয়াশাকু লাকুম-'

'আরে আমার বান্দা, তুই তো নিজের শান মতো চেয়েছিস। আমার শান মতো কিভাবে তুই চাইবি? যা, তোর শান মতো যা চেয়েছিস তা-ও দিলাম। আর আমার শান অনুযায়ী যা তুমি চাইতে পারো নাই তা-ও দিলাম।

দাতা তো এমনই হওয়া চায়।

এখন বলেন ভাই, এমন দাতা প্রতিপালকের প্রতি মন প্রাণ না সঁপে দেয়া কতবড় অন্যায়! এই অন্তরে আল্লাহ্ ছাড়া আর কারও প্রভাব না থাকা। স্রেফ আল্লাহ্। একমাত্র আল্লাহ্রই স্থান এই অন্তরে থাকবে। আর আল্লাহ্তায়ালা তার বান্দার কাছে চান ভালোবাসা। যেমন স্ত্রী চায় স্বামীর অন্তরে একমাত্র তার ভালবাসা বিরাজ করুক। তারপর সে তাকে শুকনো রুটি দিক খেতে আর পরতে

দিক মোটা কাপড়। কোনও আপত্তি নেই। তেমনি আল্লাহ্তালাও চান বান্দার অন্তর জুড়ে সব সময় আমার ভালবাসা, আমার স্মরণ বিরাজমান থাকুক।

আর যদি স্বামী অন্যের হয়ে যায় তারপর যতই সোনা দানা আর ধন সম্পদ স্ত্রীর পায়ের তলায় ফেলে দেয় তাতে স্ত্রী সুখী হয় না। তেমনি আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ও বান্দার অন্তরে দৃষ্টি রাখেন। দেখেন সেখানে তিনি আছেন না অন্য কোন সৃষ্ট বস্তুর ভালবাসা রয়েছে। আমরা কি জানি কেন ইয়াকুব আলাইহিস্সালাম এর কাছ থেকে তার নয়নের মণি, আদরের দুলাল নবী সন্তান, ইউসুফ আলাইহিস্সালাম কে কেড়ে নিয়েছিলেন? বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিলেন? চল্লিশ বছর ধরে পিতা পুত্র আলাদা ছিলেন।

কেন?

মিশর থেকে শ্যামদেশ (বর্তমান সিরিয়া) মাত্র এক মাসের পথ অথচ কেউ কারো দেখা পাচ্ছে না। জানতে পারছে না। কে কোথায়? কতদূর? কেমন আছে? ইউসুফ আলাইহিস্সালাম এর অনুমতি নেই যে পিতাকে জানায় আমি কাছে আছি, পাশেই আছি; ভাল আছি। কেঁদো না ।

ওদিকে চোখের পানি ফেলতে ফেলতে ইয়াকুব আলাইহিস্সালাম এর চোখ অন্ধ হয়ে গিয়েছে।

'অব ইয়াদ্‌দাতা আয়না মিনাল হুজ্‌নি ফাহুয়া কাবিম।'

তারপর যখন দেখা হলো ইয়াকুব আলাইহিস্সালাম আবার চক্ষুষ্মান হলেন। বাপ বেটার মিলন হলো।

তখন আল্লাহ্তায়ালা ইয়াকুব আলাইহিস্সালাম কে বললেন, 'তুমি কি জানো, কেন তোমাকে তোমার সন্তান থেকে আলাদা করে দিয়েছিলাম ? কারণ একদিন তুমি নামাজ পড়ছিলে । পড়তে পড়তে আচমকাই তোমার কানে ভেসে এলো ইউসুফের কান্নার শব্দ ।

তোমার দৃষ্টি পিছলে চলে গেল ইউসুফ আলাইহিস্সালামের দিকে। আমি তীব্র অভিমানে সিদ্ধান্ত নিলাম বিচ্ছিন্ন করবো তোমাকে ইউসুফের কাছ থেকে। আমার সামনে দাঁড়িয়ে আমারই সৃষ্ট ইউসুফের দিকে আমার নবীর দৃষ্টি! নবী হয়ে স্রষ্টাকে অবহেলা করে সৃষ্টির দিকে নজর। আল্লাহ্ তার সাথে কারও অংশীদারী পছন্দ করেন না। আল্লাহ তায়ালা মহান বিশ্বপ্রভু তার ভালবাসায় কারও অংশী পছন্দ করেন না। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম এর মতো খলিল যখন তার নবী পুত্র ঈসমাইল এর দিকে বার বার মমতার দৃষ্টি ফেলছেন জবাই এর পূর্ব মুহুর্তে (আর এটা স্বাভাবিক পিতা তার পুত্রকে এমন সঙ্গীন মুহূর্তে দেখবেই। তা জেনে হোক বা অজান্তেই।)

তো ঠিক তখনি অদৃশ্য থেকে রাব্বুল আলামীন ঘোষণা করলেন, 'ইব্রাহিম, ছুরি চালাও --ছুরি চালাও --!!

সত্তুর বার ছুরি চালালেন ইব্রাহিম আলাইহিস্সালাম।

প্রথম বারেই দুম্বা রাখতে পারতেন আল্লাহতালা। কিন্তু বার বার তাকে দিয়ে ছুরি চালালেন। ছুরি চালাতে চালাতে অন্তর থেকে তাঁর সব অপত্য স্নেহের উদ্দীপনা নিঙড়ে বের করে নিলেন। প্রতিবার ছুরি চালাচ্ছেন ছেলের গলায়! আপন ছেলে! নবী! বুক ভরা ভালবাসা! তিল তিল করে বলি দিচ্ছেন। উজাড় করা পুত্র প্রেম মুখ থুবড়ে পড়ছে। আসমান জমিন নিথর। রুদ্ধশ্বাস। আসমানের বাসিন্দাদের মাঝে কান্নার রোল !

সত্তুর বার ছুরি চালানোর পর পুত্রের জন্য আর কিছুই রইলো না নবী ইব্রাহিম এর মনের কোণে! বাকী থাকলো আল্লাহকে রাজী খুশি করার নিশ্ছিদ্র আর নির্ভেজাল উদ্দীপনা! উদ্যম!

ছয়

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের কাছে এটাই আল্লাহর চাওয়া। সব কিছু ছেড়ে আমার সাথে সম্পর্ক করো প্রেমের, ভালবাসার আর আনুগত্যের মহান সম্পর্ক। আমার জন্যে আত্মবলিদান দাও। আমি ছাড়া সবকিছুকে বের করে দাও অন্তর থেকে। আমি আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে সবচেয়ে উত্তম।

এজন্যে বান্দা যখন নামাজে দাঁড়ায় তখন মগ্ন হয় আল্লাহর প্রতি। পূর্ণ মনোযোগ দেয় সর্বশক্তিমানের দিকে। তারপর কখন জানি আচমকাই কীসের চিন্তা, কীসের ভাবনা তাকে উদাসীন করে দেয়। অন্যমণস্ক হয় আল্লাহর থেকে। তখন আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আসমান থেকে আওয়াজ দেন, 'ইয়া ইবনি আদাম! ইলা মান্ তাল্‌তাফিৎ। ইলা মান্ হুয়া খায়রুম মিন্নী?'

হে বনী আদম, তুমি আমার দিক থেকে মুখ ফেরালে কেন? তুমি কি আমার চেয়ে উত্তম কিছু পেয়েছ? আমার চেয়ে বেশি কী সৌন্দর্য তুমি পেলে? তুমি কাকে দেখছো? কার ভাবনা পেয়ে বসলো তোমাকে? যে তুমি আমার মতো দয়ালু কে ভুলে গেলে? বান্দা বিশ্বাস করো, আমার চেয়ে বেশি সুন্দর, বেশি উত্তম আর কিছু নেই। তুমি কার দিকে মুখ ফেরালে, বান্দা? তুমি আমাকে ছেড়ে? কাকে দেখছো? আল্লাহ্ আকবার! আল্লাহ্ আকবার!

বলুন দোস্তো, স্বয়ং আল্লাহ্, স্রষ্টা নিজে তার বান্দার কাছে এমন অনুরোধ উপরোধ করছে! আমাদের কাছে তাঁর কী ঠেকা? কী প্রয়োজন আমাদের তাঁর কাছে। কী মূল্য আছে তার কাছে আমাদের?

তবু আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বান্দাকে ডাকতে থাকেন। আল্লাহু আকবার! আশ্চর্য! তিনি মালিক হয়ে বান্দাকে ডাকতে থাকেন। সেই আল্লাহ্ যার এতো বড় মাহাত্ম ও পরাক্রম যে তিনি যখন জিব্রাইল আমিনের মতো এতো বড় ফিরিশতা (যার মাথা সিদরাতুল মুনতাহা আর পা তাহ্‌তাস্ সারা। আর দেহ্ গোটা দুনিয়া জুড়ে বিস্তৃত) কে ডাকেন, 'হে জিব্রাইল!' সাথে সাথে আসমানের উপর থেকে সাত জমিনের নিচ পর্যন্ত দীর্ঘ ও ছয়শত পাখা বিশিষ্ট সুবিশাল জিব্রাইল আলাইহিস্‌সালাম, যার পায়ের আঙুল থেকে মাথার চুল পর্যন্ত পৌছাতে সাড়ে চোদ্দ হাজার বছরের পথ পেরুতে হয়, তিনি ভয়ে প্রকম্পিত হয়ে একটা পাখির মতো কাঁপতে থাকেন। যার সামনে আসমান ঝুঁকে আছে, তারা মন্ডলী ঝুঁকে আছে। পাথর রয়েছে সিজদায়। পাহাড়গুলো তার সামনে ঝুঁকে রয়েছে। সিজদায় রত আছে সমুদ্র সাগর, নদ-নদ খাল-বিল, মহাসমুদ্র। গাছ-পালা সিজদা করছে। এক একটা পাতা সিজদা করছে। যিনি রাহীম, ওয়াহ্‌হাব, রাজ্জাক, মালিকাল মুল্‌ক, রাহিমাল মাসাকীন, জুল জালালি অল্ ইকরাম, আর হামার রাহিমীন, মাতিন, আওয়ালুল আওয়ালিন, আখিরাল আখিরিন, অ

তাওয়াব, জুল কুয়াতিল মাতিন, আলবার, ওয়াকিল, ওয়ালি–এত বড় গুণাবলীর আল্লাহ তায়ালা যিনি কোন কিছুর সাহায্য ছাড়া গোটা বিশ্বজগতকে একা একাই সৃষ্টি করেছেন। এমন পবিত্র মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ তায়ালা পায়খানা পেশাব আর নাপাকি ভরা মানুষকে ডাকতে থাকেন।

'আরে বান্দা আমি তোর দিকে চেয়ে আছি আর তুই কার দিকে?'

'মান্‌জা তুহা, মাশহুম তুবা , আম্‌রি গায়িব!' 'আরে! আমি তোর দিকে চেয়ে রয়েছি, তুই কাকে দেখছিস?'

তারপরও যদি বান্দা তার দিকে ফিরে না তাকায় তখন আল্লাহতায়ালা ডেকে বলেন, 'আমার বান্দা তুই কাকে দিখছিস? আমার সৃষ্টিকে? না–না তুই আমার দিকে দেখ!'

এবারও যদি বান্দা তার দিকে রুজু না তখন আল্লাহতায়ালা আবার বলেন, 'ও আমার বান্দা তুই কাকে দেখছিস? আমার সৃষ্টিকে। না–না, তুই আমার দিকে ফিরে দেখ!'

এখনও যদি বান্দা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দিকে মনোনিবেশ না করে তখন আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন, 'কী আশ্চর্য! আমার এই বান্দার দেখছি আমাকে কোন প্রয়োজন নেই!!' তো ভাই, এমন আল্লাহ্‌কে নিজেকে নিঃশেষ করে পেতে হবে এমন আল্লাহ্‌র জন্যে বরণ করে নিতে হবে মৃত্যু কে।

আল্লাহতালা আমাদের কাছে চান তার ভালবাসা নয় ইশ্‌ক! ইশ্‌ক! একটা হচ্ছে ভালবাসা আর একটা হচ্ছে ইশ্‌ক! ভালবাসা ভাগ করা যায়। কিন্তু ইশ্‌ক শুধু একজনের জন্যেই হয়। যা একজনের জন্যে তাকে জগতের সব কিছু ভুলিয়ে দিয়ে শুধু এক জনের দিকে দিশাহারা আর মোহগ্রস্থ করে রাখে। ভালবাসা সবার জন্যে। স্ত্রীর জন্যে, মা–র জন্যে, বাবার জন্যে, সন্তানের জন্যে, চাকরির জন্যে, বসের জন্যে, বোনের জন্যে, ভায়ের জন্যে, পদের জন্যে, মর্যাদার জন্যে, ক্ষমতার জন্যে, কন্যার জন্যে হয়। কিন্তু এই ভালবাসা গাঢ় হতে হতে এমন প্রগাঢ় ভালবাসায় রূপান্তরিত হয়ে কোনও এক জনের জন্যে হয়ে যায়। সবাইকে; সবার ভালবাসাকে ভুলিয়ে দেয়। এমনকি নিজের সত্ত্বাকে পর্যন্ত ভুলিয়া দেয় শেষ পর্যন্ত নিজের জীবনকে তার পায়ের তলায় রেখে দেয়। এতই গভীর সেই প্রেম যে নিজের জীবনকে তার প্রেমিকের জন্যে বলিদান দিতে দ্বিধা করে না। তাকে বলে ইশ্‌ক! 'আল্লাজিনা আমানু আশাদ্দুহুব্বুল লিল্লাহ্।' যারা ঈমান এনেছে তারা আমার আশিক, এই আশাদ্দু হুব্বুল শব্দের অর্থ হচ্ছে ঈশ্‌ক।

আল্লাহ্ আমাদের কাছে কি চান?

তিনি চান আমরা সবার কাছ থেকে সরে এসে সব ভালবাসা নিয়ে একমাত্র তাঁর দিকে ফিরে আসি। স্রেফ একজন। তিনি আল্লাহ্। তাঁর হয়ে যাই। আর কারো নয়। 'শুধু আমার জন্যে, এমন কি তোমার নিজের জন্যেও তোমার আর কিছু থাকবে না। তুমি শুধু আমার হবে।'

আরে ভাই, আমরা তো আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কের স্বাদ জানি না। এর মাঝে যে কী শান্তি, কী আবেশ আর আনন্দ! যদি সম্পর্ক করতাম তো বুঝতাম কতো অনাবিল সে শান্তি! ভাই! সৃষ্ট জিনিসের প্রেম বা ইশ্‌ক্ কোথায় নিয়ে যায় মানুষকে! সে সব 'কিছু ভুলে যায়। 'মজনু'র নাম শুনেছেন? তার আসল নাম ছিল 'তাওবা'। আরবীতে কায়েস নামে সে পরিচিত। আমাদের কাছে সে 'মজনু' নামে বিখ্যাত। আসলে তার নাম ছিল তাওবা। বাপের নাম সুম্মা। তিনি সর্দার বা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। তো 'তাওবা'র সাথে ইশ্‌ক্ হয়েছিল লায়লার। বাপ একদিন তাকে হেরেম শরীফে আটকালো। তাকে বলা হলো, 'আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে তুমি লায়লার সাথে সম্পর্ক ছেড়ে দাও। তাওবা করো এখানে। এই বায়তুল্লাহ তে।' সে হাত ওঠালো–

'ইলাহী, তুবতু মিন্ কুল্লিল মুআফি; অলাকিন হুব্বাল লায়লা লা আতুবু।'

'হে আল্লাহ, সব গুনাহ থেকে আমি তাওবা করছি কিন্তু লায়লার সাথে সম্পর্ক ছাড়তে পারছি না।'

ভাই, সৃষ্ট জিনিসের সাথে সম্পর্ক! হায়! মাটি, পেশাব, পায়খানার মানুষের সাথে প্রেম! তার থেকে তাওবা করতে পারছে না। সে বলল–

'আওয়াহুম আলা তাস্লিবনি হুব্বাহা আবাদা; অ ইয়ার হামাল্লাহু আবাদান কামা আমিনা।'

'হে আল্লাহ, লায়লার সাথে আমার ঈশ্ক চিরদিনের করো। আর যারা আমার সাথে আমিন বলছে তাদেরও মঙ্গল করো।'

মজনু কুকুরের পা'য়ে চুমু খাচ্ছে।

'কুকুরের পায়ে চুমু খাচ্ছ কেন?' লোকেরা আশ্চর্য হয়ে বলল।

'আরে ভাই!' সে কান্না ভেজা স্বরে বলল, 'তোমরা কি জানো না, এই কুকুর লায়লার শহরের গলি দিয়ে আসা যাওয়া করে।'

'সেজন্যে–!?'

'হ্যাঁ ভাই, তাও সব সব সময় নয়। কখনো সখনো। তাই ওর পায়ে চুমু খাচ্ছি আমি।'

ভাই,

আল্লাহতায়ালার সৃষ্টির সাথে এই ঘটনা ঘটেছে। ইশ্কের কারণে। এই ইশ্ক আল্লাহতায়ালার সাথে গড়ে ওঠে মানুষের সে জন্যেই আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম দুনিয়াতে এসেছিলেন। এখন আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক গড়ে ওঠার পথ কি? উপায় কি? সেটা হচ্ছে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালার সাথে সম্পর্ক গড়ার সেতুবন্ধন।

'আনা নাবীয়াল আম্বিয়া।'

'আমি নবীদেরও নবী।' বলেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম।

'লিবাদিল হাম্দি বিয়াদিহ ইয়াওমাল ক্বিয়ামাতি।'

'প্রশংসার পতাকা আমার হাতে থাকবে কাল কিয়ামাতের দিন।'

'সাইয়্যিদুহুল ইয়া আদামু ইয়াওমাল কিয়ামাহ্।'

'আদম সন্তানদের সর্দার হবো কিয়ামাতের দিন।'

'মা ফাতিউল জান্নাতু বিয়াদিহ্ ইয়াওমাল কিয়ামাতি।'

'জান্নাতের চাবি আমার হাতে থাকবে কিয়ামাতের দিন।'

এমন নবী ছিলেন আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম। কোনও মানবসন্তান আল্লাহকে দেখেনি, দেখতে পাবে না। মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ তায়ালাকে বললেন, 'হে আল্লাহ, আমি তোমাকে দেখতে চাই।'

'তুমি আমাকে দেখতে পাবে না, মুসা।' বললেন আল্লাহতায়ালা।

'হে আল্লাহ, আমি তোমাকে দেখতে চাই।' জিদ ধরলেন মুসা।

'ঠিকআছে। দেখো।'

সত্তর হাজার পর্দা আল্লাহর আরশের সামনে আছে। সেটা সরালেন আল্লাহতায়ালা। তাঁর জাতে আলীর নূরের একটা কণার ঝলক ছুঁড়ে দিলেন।

'জাআলাহু দাক্কা–'

পাহাড় চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে ধুলোয় পরিণত হলো। মুসা আলাইহিস সালামের মতো দুর্দান্ত নবী চল্লিশ দিন পর্যন্ত বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকলেন।

অথচ আপন হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সাথে কী ব্যবহার করলেন?

'হা আলাল্লাজি আস্রা বিআব্দিহি লায়লাম্ মিনাল্ মাস্জিদুল হারাম ইলাল্ মাস্জিদুল আক্সা।'

এক পা মুবারাক বায়তুল্লাহে আরেক পা মাসজিদুল আকসায়। দু'রাকাত নামাজ পড়লেন। সমস্ত নবীদের নিয়ে। তিনি ইমাম। তারপর উঠলেন প্রথম আকাশে। দেখা হলো আদম আলাইহিস সালামের সাথে। উঠলেন দ্বিতীয় আকাশে। দেখা হলো ইয়াহিয়া ও জাকারিয়া আলাইহিস সালামের সাথে। ঈসা আলাইহিস সালামের সাথে দেখা হলো তৃতীয় আকাশে। ইউসুফ আলাইহিস সালামের সাথে দেখা হলো চতুর্থ আকাশে। পঞ্চম আকাশে দেখা হলো ইউনুস আলাইহিস সালামের সাথে। ষষ্ঠ আকাশে উঠলেন। দেখা হলো হারুন আলাইহিস সালামের সাথে। মুসা আলাইহিস সালামের সাথে দেখা হলো। সপ্তম আকাশে দেখা হলো ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের সাথে। এরপর সিদরাতুল মুনতাহা। এখানে এসে জিব্রাঈল আমিন হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে গেলেন। বললেন, আর ওপরে ওঠার অনুমতি আমার নেই।'

এরপর আরশ্ মহল্লা থেকে নেমে এলো একটা মহামূল্যবান রত্ন খচিত শাহী তাখ্ত। তিনি তাতে চড়লেন। সেই তাখ্ত তাঁকে নিয়ে উড়তে শুরু করলো।

'সুম্মা দানাফাতা দাল্লা ফাকানা কাবা কাওসায়নি আও আদ্না ফা আওহা ইলা আব্দিহিমা আওহা মা কাদাবাল্ ফুআদামা আরা আফা তা মারুনা অমা ইয়ালা ইয়ারাও।'

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতো কাছে গেলেন, এতো নিকটে গেলেন যে আর কেউ সেখানে পৌঁছাতে পারেনি। পারবেও না।

তো ভাই,

আল্লাহর সাথে কে সম্পর্ক গড়বে? যে নবী আলাইহিমুস সালামের তরীকায় আসবে। যিনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের তরীকায় আসবেন। যিনি এই পবিত্র আদর্শ মতো চলবেন তিনি কালো মানুষ হয়েও সফলকাম। যে এই আদর্শ মতো চললো না সে কুরাইশী, হাশমী, সৈয়দ হয়েও ব্যর্থ। আবু লাহাব কুরাইশী, সৈয়দ ও হাশমী। কিন্তু জাহান্নামী। (তাব্বাত ইয়াদা আবি লাহাব.....')।

আর বিলাল ইবনে রাবাহ (রাঃ)। পিতার নাম পর্যন্ত ঠিক জানা যায় না। দাদার নাম কেউ জানে না। মোটা দীর্ঘ দেহ। কোঁকড়া চুল, গর্তে ঢোকা চোখ। কালো কুচকুচে গায়ের রঙ। দুনিয়াতে তিনি কত সম্মান পেলেন! মসজিদে নববীর মুয়াজ্জিন। মুয়াজ্জিনের কী মূল্য!, আমরা জানিনা। আমরা তো জানি জেনারেল, মেজর, কমিশনার আর ডাক্তার সাহেবের মূল্য। মুয়াজ্জিনের মুল্য কতটুকু তা আমরা আজ জানিনা। আমাদের চিন্তা চেতনার পরিবর্তন হয়ে গেছে। আমরা আজ মূর্খ হয়ে রয়েছি। মুয়াজ্জিন সে, যাকে কবরের মাটি খেতে পারে না। 'লা ইয়াদা আদ্দু ফি কাব্রিহি।' বড় বড় বাদশাহকে কবর ছিন্ন ভিন্ন করে দেবে। বড় বড় ক্ষমতাধরকে কবর নিষ্পেষিত করে ফেলবে। যদি ঈমান, আমল ও তাকওয়া না থাকে। আর মুয়াজ্জিন? তাকে ছোঁয়া কবরের মাটির জন্যে হারাম।

'আসওয়ালু আনা কাল্ ইয়াওমাল্ কিয়ামাহ্।'

'কাল কিয়ামাতের দিন মুয়াজ্জিন সবচেয়ে উঁচু জায়গায় দাঁড়াবে।'

লম্বা গর্দান মানে সে সবচেয়ে উঁচু জায়গায় দাঁড়াবে। গোটা হাশরবাসী এক সাথে তাঁর উজ্জল নূরানী চেহারা দেখতে পাবে। এতো উঁচুতে! ঘোষণা হবে। 'মুয়াজ্জিন কোথায়?'

ঘোষণা হবে, 'ইমাম কোথায়, কোথায় ওলামা? এদেরকে আগে মোতির মিম্বরে নিয়ে বসাও। বাকীদের পরে হিসাব নিকাশ হবে।'

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম একবার আজানের ফজিলত আলোচনা করলেন। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, 'আল্লাহর রাসুল, তাহলে তো দেখছি

আজান দেয়ার জন্যে আপনার উম্মত তরবারি বের করে ফেলবে। (অর্থাৎ এতো বড় পূণ্য পাবার জন্যে একে অপরকে হত্যা করতে কুণ্ঠিত হবে না।)

'কাল্লা ইয়া ওমার,' হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বললেন, 'কক্ষণো তা নয় ওমর! এমন একদিন আসবে যখন আমার উম্মত আজান তাদেরকে দিয়ে দেবে, যারা সমাজে অবহেলিত, অপমানিত, দুঃস্থ ও দুর্দশাগ্রস্থ। আর আজান দেয়াকে সবচেয়ে অবমাননাকর মনে করবে।' এতো মুয়াজ্জিন সম্পর্কে! আজ আমাদের জ্ঞান, বোঝার শক্তি ও চিন্তাধারা সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। আমরা আলিম, মুয়াজ্জিন, হাফিজ, ক্বারী এদেরকে কোনও মর্যাদাই দিই না। কিন্তু আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের দরবারে এদের কতো সম্মান দেখুন–

'ইন্না ফিল্ জান্নাতি নাহ্রান ইস্মুহু, রায়আন আলাইহি মাদিনাতুম মিম্ মারজান লাহু সাবউনা আল্ সাবাব্, মিম্ বাদিন্না ফিত্তা লাহামিন আল্ কুরআন।'

'বেহেশতে একটা ঝর্ণা আছে। যার নাম রায়আন। যার ওপর একটা প্রাসাদ আছে। নাম মারজান। যাতে সত্তর হাজার সোনা রূপার দরোজা রয়েছে। যা হাফিজে কুরআনকে আল্লাহতায়ালা পুরস্কার স্বরূপ দেবেন।'

আজ হাশরের মাঠে সব ডিগ্রিধারীরা পিছনে পড়ে রইলো। আগে কে আছে? হাফিজে কুরআন। আজানদাতা। আর ইলমের অন্বেষণকারীরা।

বিলাল (রাঃ) মুয়াজ্জিন হলেন। আর মর্যাদার এমন স্তরে পৌছুলেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সেহেরি খাচ্ছিলেন। হযরত আলী (রাঃ) সাথে ছিলেন। বকরির গোশ্‌ত ও রুটি দিয়ে তৈরি সারীদের সেহেরি। এমন সময় বেলাল (রাঃ) এলেন। বললেন, 'খাওয়া বন্ধ করে দিন।' মসজিদে চলে গেলেন। ফিরে এলেন আবার। দেখতে, যে যদি খাওয়া শেষ হয় তো আজান দিয়ে দেবেন। দেখলেন তখনও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম খাবার খাচ্ছেন। বললেন, 'ইয়া রাসুলুল্লাহ! ওয়াল্লাহি লাক্বাদ আফ্‌তাফ্‌তা।' 'হে আল্লাহ্‌র রাসুল, কসম আল্লাহ্‌র! সুব্হে সাদিক হয়ে গেছে।' হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম হাত সরিয়ে নিলেন খাবার থেকে। বললেন, 'বেলাল, তোমার ভালো হোক। কোথায় ভোর হয়েছে। তুমি চাঁদের আলো দেখে ভুল করেছ। তবুও তোমার কসম যাতে মিথ্যে না হয়ে যায় সেজন্যে আল্লাহতালা ভোর করে দিয়েছেন। আমি নবী, খাওয়া না শেষ করা পর্যন্ত আল্লাহতালা সুব্হি সাদিক করবেন না।'

যেদিন থেকে রাত কেটে গিয়ে ভোর হয় তখন থেকে সেদিন পর্যন্ত আর কখনো সুবহি সাদিক হবার আগে ভোর হয়নি। কিয়ামত পর্যন্ত কখনো হবেও না। কিন্তু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের হাত ধরার কারণে, তাঁর সাথে আত্মীয়তার জন্যে, তাঁর আদর্শে নিজেকে সাজানোর ফলে এমন ক্ষমতা ও শক্তি পয়দা হয়েছে সে আল্লাহতায়ালা তাঁর নিয়মকে লঙ্ঘন করে সকাল হবার আগেই সকাল করে দিলেন। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, যদি বিলাল (রাঃ) না বলতেন, আর কসম না খেতেন, তাহলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম যতক্ষণ খাবার খেতেন ততক্ষণ পর্যন্ত সুবহি সাদিক হতো না।

আখেরী নবী আকা ই নামদার, তাজিদারে মাদিনা, মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অনুসরণ কারীদের আল্লাহতায়ালা এই সম্মান দিয়েছেন। আর কি পুরস্কার দিবেন?

হযরত বিলাল (রাঃ) এর কবর শ্যাম (বর্তমান সিরিয়া) দেশে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, 'হাশরের মাঠে আমার ডান পাশে উঠবে আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ), বাঁ দিকে ওমর ফারুক (রাঃ) আর আমার পায়ের নিচ দিয়ে উঠবে বিলাল (রাঃ)। তাঁর (সাঃ) পায়ের নিচ দিয়ে! হাশরের মাঠে সমগ্র মানব চলবে পায়ে হেঁটে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম চলবেন বোরাকে।

'ইয়ুশারুন্নাসো রিজালা বাইয়ুখ্‌শারো রাকিবান আলাল বুর্‌রাক্।'

আর বিলাল (রাঃ) সাদা রঙের উটের আগে অগ্রসর হবেন। চালক আগে আর পেছনের সিটে তার মালিক। হাশরের মাঠে বিলাল (রাঃ) যখন নামবেন তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম পেছনে বিলাল আগে আগে। তিনি উটনীর ওপর বসে আজান দিবেন। সমগ্র মানব জাতি সেই আজানের আওয়াজ শুনতে পাবে। যখন 'আশহাদু আল লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' এখানে আসবে তখন গোটা হাশরবাসীর বলবে 'সাদাকতা'-'সাদাকতা'। সত্য বলেছ, সত্য বলেছ। যখন বলবেন 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' তখন হাশরবাসী বলবেন 'সাদাকতা' 'সাদাকতা'।

এই হচ্ছে আনুগত্যের পুরস্কার।

আর কি পুরস্কার পাবেন?

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, 'যখন আমি জান্নাতে যাবো-আমিই সর্বপ্রথম জান্নাতে যাবো। তখন আমার বাহনের লাগাম থাকবে বিলালের হাতে। সে আমার আগে আগে চলবে। সে আগে প্রবেশ করবে। সাথে আমি।'

এ হচ্ছে সম্পর্ক গড়েছে যাঁরা আল্লাহর সাথে তার পুরস্কার। আল্লাহর তরফ থেকে।

'ইন্নিল আরেফে রাজুলান বিস্‌মিহি অ বিস্‌মি আবিহে অ-উম্মিহি লা-ইয়াদি বাবাম্ মিন্ আবওয়াবা মিন জান্নাতি। ইলা ক্বালাল মারহাবা, মারহাবা!'

'আমি এমন এক ব্যক্তিকে চিনি, যাঁর মা ও বাবাকে চিনি; তিনি যখন বেহেশতে প্রবেশ করবেন তখন জান্নাতের প্রতিটি দরজা সমস্বরে বলবে, 'মারহাবা মারহাবা।' আপনার আগমন শুভ হোক। আপনি আমার দরজা দিয়ে প্রবেশ করুন।'

হযরত সালমান (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, এমন সৌভাগ্যবান ব্যক্তিটি কে?'

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বললেন, 'সে আবুবকর ইবনে আবু কোহাফা (রাঃ)।'

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, 'রাইতু কাস্‌বান ফিল্ জান্নাহ্-'

'রাতে একটা স্বপ্ন দেখলাম। একটা সুবিশাল প্রাসাদ! যার একটা ইট মোতির, একটা ইট ইয়াকুতের,একটা আবার জবরজদ পাথরের। মেশ্‌ক্ দিয়ে তৈরি তার গাঁথুনি, জাফরান দিয়ে তার খাদ। আমি জিজ্ঞেস করলাম---

'লিমান হাযা?'

'এটা কার?'

'ক্বিলাদ ফাতাম মিন কুরাইশ!'

'কুরাইশ বংশের এক যুবকের,' উত্তর এলো।

'জানান্‌তু আন্নাব হুলি।'

'আমি মনে করলাম আমিও কুরাইশ বংশের যুবক। এটা বুঝি আমার।'

'ফাজ্ হাব্‌তু লি ইয়াদ্‌খুলাহু।'

'আমি তাতে প্রবেশ করতে চাইলাম।'

'ইন্নাহু ওমার ইবনুল খাত্তাব।'

'হে আল্লাহর রাসুল, এটা ওমর ইবনুল খাত্তাবের,' ফিরিশতারা বলল।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বললেন, 'হে ওমর, তোমার রাগকে মনে পড়লো, সেজন্যে ভেতরে যাইনি। নইলে দেখেই আসতাম।'

হযরত ওমর (রাঃ) কাঁদতে লাগলেন। বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, আমার মা বাবা আপনার ওপর কোরবানী হোক। আমি কি আপনার সাথেও রাগ করবো?'

'আওয়া আলাইকা আও ইয়ারা, ইয়া রাসুলুল্লাহ!'

তারপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ওসমান (রাঃ) এর দিকে ফিরে বললেন, 'ইয়া ওসমান, ইন্না লিকুল্লি জামিআন্ রাফিকান্ ফিল্ জান্নাতি আন্‌তা রাফিকী ফিল্ জান্নাহ্।'

'হে ওসমান, বেহেশ্‌তে সব নবীর একজন করে সাথী থাকবে, আমার সাথী হবে তুমি।'

হযরত আলী (রাঃ) পাশে বসেছিলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁর হাত ধরলেন। বললেন, 'ইয়া আলী, আতাহারতা আন্ ইয়াকুনা মান্‌জিলোকা মুকাবিলা মান্‌জিলি।'

'হে আলী, বেহেশ্‌তে তোমার ঘর আমার বাসার সামনে হবে। তুমি খুশি তো?'

হযরত আলী (রাঃ) নীরবে কাঁদতে লাগলেন। অঝোরে।

তালহা (রাঃ) ও জুবাঈর (রাঃ) দু'জনে পাশে বসেছিলেন। তাঁদের উদ্দেশে এবার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বললেন, 'ইয়া তালহা অ ইয়া জুবাঈর! ইন্না লিকুল্লি নাবীয়্যাল্ হাওয়ারিয়্যিন্ ফিল্ জান্নাহ্ অ–আন্‌তা মা হাওয়ারিয়্যিন ফিল্ জান্নাহ্!

'হে তালহা ও জুবাঈর! জান্নাতে সব নবীদের সাহায্যকারী থাকবে। বেহেশতে তোমরা দু'জনে হবে আমার সাহায্যকারী।'

এই হচ্ছে সাথে থাকার, সঙ্গলাভের ফজিলত।

জান্নাতে একদিন হঠাৎ দেখা যাবে সূর্যের আলোর মতো নূর ঠিকরে বেরুচ্ছে। চারদিক আলো ঝলমল। জান্নাতের পাহারাদার রিদওয়ানকে কেউ জিজ্ঞেস করলো, 'কি ব্যাপার, রিদওয়ান! আমরা তো শুনেছিলাম এখানে কোনও দিন সূর্য উঠবে না। সারাক্ষণ ছড়িয়ে থাকবে মায়াবী আলো। আজ যে এতো আলো বর্ণমালার ছটা নিয়ে সূর্য উঠলো। রিদওয়ান বলবে, 'আল্লাহর ওয়াদা সত্য! জান্নাতে সূর্য ওঠেনি।'

'তাহলে এতো আলোর কীসের?'

'জান্নাতুল ফিরদাউসে রয়েছেন হযরত আলী (রাঃ) ও ফাতিমা (রাঃ), 'রিদওয়ান বলবে, 'তাঁরা আজ বসেছিল। কোনও কথায় হেসে উঠেছে স্বামী ও স্ত্রী। তাদের দাঁত বেরিয়ে পড়েছে। তার আলো এতো তীব্র ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে সব বেহেশতে।'

এই হচ্ছে সঙ্গী হবার সম্মান।

একজন কালো লোক এলো। সে বলল, 'হে আল্লাহ্‌র রাসুল, আমি তো কালো, কুৎসিত আর কদাকার। আমি ঈমান আনলে কী পুরস্কার দেয়া হবে?'

'তুমি যদি ঈমান আনো তো জান্নাত পাবে। এমন এক জান্নাত যেখানে তোমাকে সুদর্শন করা হবে। তুমি এতই উজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট হবে যে, তোমার রূপের ছটা এক হাজার বছর দূরের মানুষ দেখতে পাবে।'

এই হচ্ছে নবীর সাথী হবার ফজিলত।

যে তার সাথে থেকেছে সে মুক্তি পেয়েছে। যে সরেছে সে ধ্বংস হয়ে গেছে। আল্লাহর কাছে সরাসরি কেউ পৌঁছাতে পারবে না। তাঁর কাছে পৌঁছানোর জন্যে রয়েছে সেতু বা সিঁড়ি। নবীর জীবনাদর্শ হচ্ছে সেই সিঁড়ি বা সেতু। যে সেই সিঁড়িতে উঠবে সে পৌঁছে যাবে জান্নাতে। যে ওই পবিত্র আদর্শকে আঁকড়ে ধরবে সে আল্লাহ্ পাক জাতে আলী পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। তাকে দেয়া হবে চিরকালের আবাস বেহেশত। চির বসন্তের, সুখময়, শান্তিময়, আরাম ও আয়েশে থাকার বাড়ি ও বাগান।

সাত

এখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এর জীবন-যাপন আমাদের ভিতর কিভাবে আসবে? তাঁর জীবনের দুটো দিক ছিল। এক হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আল্লাহতায়ালার রাসুল ছিলেন। দুই, তিনি ছিলেন শেষ নবী। তারপর আর কোনও নবী আসবে না। অন্যান্য নবীদের সাথে উম্মতের সম্পর্ক ছিল মাত্র একটা। কিন্তু আমাদের সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের দুটো সম্পর্ক। তিনি শ্রেষ্ঠ নবী ও শেষ নবী।

'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ।' এই কালিমার দুটো অংশ। চারটা বিশ্বাস। চারটা পাঠ বা জ্ঞান রয়েছে। আর চারটা হচ্ছে তার চাওয়া।

কেউ কিছু করতে পারে না। আরশ মহল্লা থেকে তাহ্‌তাস্‌ সারা পর্যন্ত। যা কিছু সৃষ্টি রয়েছে তার কিছুর কোনো ক্ষমতা নেই যে কাউকে জীবন, মরণ, ইজ্জত দেয় বা অপমান করে। রুজি দেয় বা রুজি ছিনিয়ে নেয়। এটা হচ্ছে 'লাইলাহা'র বিশ্বাস।

'ইল্লাল্লাহ'। এ বিশ্বাস হচ্ছে একমাত্র আল্লাহ সবকিছু করতে পারেন। তিনি রুজি দেন, সম্মান দেন, জীবন দেন, ছিনিয়ে নেন জীবন মৃত্যু দিয়ে। অপমান করেন তিনিই। ভালো ও মন্দ করেন তিনিই।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, 'মান ইয়াতামাদা আনা ফাক্বাদ্‌ কাল্লা।'

'যিনি নিজ মালের ওপর ভরসা করেন আল্লাহ তার মালকে কমিয়ে দেন।' মাল দিয়ে যে কিছু হয়না সে দেখতে পাবে।

'মান ইয়াতামাদা আলা সুলতানি ফাক্বাদ্‌ কাল্লা।'

'যে নিজের রাজত্বের ওপর ভরসা করে তাকে রাজত্বের মাঝে রেখে আল্লাহ অপমান করে দিবেন।'

'মান ইয়াতামাদা আলা ইল্‌মিহি ফাক্বাদ্‌ কাল্লা।'

'যে নিজের জ্ঞানের উপর অহঙ্কার করবে সে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে।'

আমি সব কিছু জানি, বেশি জানি, সব চেয়ে ভালো জানি-এমন অবস্থা যখন একজন আলিমের তখন সে গোমরাহ্‌ হয়ে যাবে।

'মান ইয়াতামাদা আলা আক্‌লিহি ফাকাদিফ্‌ তাল্লা।'

'যে নিজের বুদ্ধির ওপর ভরসা করে তার বুদ্ধি লোপ পাবে।' সে নির্বোধ প্রমাণিত হবে।

'মান ইয়াতামাদা আলাল্লাহ্‌, ফালা বাল্লা, অলা দাল্লা, অলা বাল্লা, অলাখ্‌তাল্লা।'

'আর যে আল্লাহর ওপর ভরসা রাখবে তার মাল কমবে না, তার ইল্‌ম কমবে না, তার রাজত্ব নষ্ট করা হবে না, সে পথভ্রষ্ট হবে না, সে নির্বোধ হবে না। সে কখনও অপমানিত হবে না।'

তো কালিমার একটা দিক হলো 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ।' কেউ কিছু করতে পারে না। কাজেই যারা অক্ষম আমি তাদের নই। 'ইল্লাল্লাহ্‌'। আল্লাহ সব কিছু করেন সব কিছু ছাড়া। তিনি সক্ষম। আমি সক্ষমের পক্ষে। আমি আল্লাহর।

'লাইলাহা-'নফি, 'ইল্লাল্লাহ'-ইসবাত

'মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ।' 'মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল।' এই অংশটুকু জাহির বা প্রকাশিত। এটা ইসবাত্। এর অপ্রকাশিত দিক হচ্ছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পরে আর কোনো নবী আসবে না। এটা হচ্ছে নফি। ইসবাতের ভেতর লুকিয়ে আছে নফি। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আদর্শে দুনিয়া ও আখিরাতের শান্তি ও সফলতা। আর অন্য কোনও তরীকায় দুনিয়ার শান্তি নাই; আখিরাতেরও। এই 'নফি' দিকটা লুকোনো রয়েছে ইসবাতেই ভেতর। কাজেই নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পর আর কোনও নবী নাই।

যেহেতু নবী আর আসবে না। 'নফি' অংশটুকু আমাদের কাছে কী চায়? একথাই বলে যে, তিনি শেষ নবী। তারপরে আর কোনও নবী আসবে না। কাজেই তাঁর অসমাপ্ত দায়িত্ব দাওয়াতের কাজ আমাদের করতে হবে। তাঁর আনা খবর গোটা মানব জাতির কাছে পৌছাতে হবে। কেয়ামত পর্যন্ত মানুষ ও জ্বিনের কাছে পৌছানোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

এই দুই কাজ যে করবে সে 'মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' এর দুটো চাওয়া পূর্ণ করলো। তার সাথে তৈরি হবে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের গভীর, গাঢ় সম্পর্ক।

অবশ্য যে ব্যক্তি পড়ে নিয়েছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' তার সাথে আল্লাহতায়ালার সম্পর্কের পূর্ণতার এক দরোজা অর্জন হয়েছে। হয়তো সে চোর, জুয়াড়ী, মদ্যপ, সুদখোর তবুও কালিমার কারণে সে প্রথম দরোজায় পৌছেছে।

কালিমা পড়নেওয়ালা তাওবা করলো তো এক দরোজা আগে বাড়লো। নামাজ পড়লো তো আরেক দরোজা এগুলো। রোজা রাখলো, আরো একটা দরোজা পেরুলো। হজ্ব করলো, আরেক দরোজা আগে বাড়লো। জাকাত দিল তো আরো উন্নতি করলো। নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ মেটালো আরো আগে বাড়লো। লেন-দেন ঠিক করলো আরো এক ধাপ এগিয়ে গেলো। হালাল কামাই করলো, হালাল রুজি খেল আরো মর্যাদা বেড়ে গেল।

কিন্তু কামেল দরোজায় তিনি পৌছুলেন যিনি 'মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' এর চাওয়া পূর্ণ করলো। সেটা হচ্ছে, আজ থেকে নবীর তরীকায় চলবো আর তাঁর আনীত ধর্মের দাওয়াত গোটা বিশ্ব মানবতার কাছে পৌছানোর জন্যে আমি আমার সর্বস্ব ত্যাগ করবো। শেষ নবীর ফেলে যাওয়া কাজ নিয়ে আমি চলে যাবো পৃথিবীর পথে পথে। তখন আল্লাহ তায়ালার সাথে কামিল দরোজার সম্পর্ক কায়েম হবে।

এই জগতের প্রতিটি মানুষ আল্লাহকে চেনে, জানে, মানে এই আমার চাওয়া। মানুষ যে আল্লাহতায়ালাকে মানছে না সে জন্যে এক দুঃখ নিয়ে ফিরবো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ব্যথায় ব্যথিত হবো। এক একজন মানুষের মঙ্গল আকাঙ্খায় আমি থাকবো অস্থির। লোকেদের অন্তরে আমি ঢুকিয়ে দিব আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রেম, ভালবাসা। এই আমার কাজ। এক একজন মানুষ জাহান্নাম থেকে বাঁচে। এ-ও বাঁচে ও-ও বাঁচে। প্রত্যেকে মুক্তি পায়। এই ব্যথা নিজের বুকে নিয়ে মানুষের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরতে থাকবো।

আরে ভাই! আমরা এই দুনিয়াতে দেখি, ময়লা কাপড় ফেলে দেয় পরিষ্কার কাপড় পরার জন্যে। ময়লা চাদর বিছানা থেকে সরায় নতুন চাদর বিছানোর জন্যে। অপরিষ্কার পাত্রে খাবার খায় না। দুর্গন্ধময় পাত্রে পান করে না। অপরিষ্কার ঘর ঝাড়ু দেয়। পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলে। আজ ভাই, আল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্ন, সৃষ্টি বস্তুর ভুল বিশ্বাস ও ভালবাসায় অভিষিক্ত মানুষের ময়লা, দুর্গন্ধ, অপরিষ্কার অন্তরকে দাওয়াত দিয়ে দিয়ে ধুয়ে সাফ করো। আল্লাহ সেই পরিষ্কার অন্তরে অবতরণ করবেন। কায়েম হবে বান্দার সাথে আল্লাহর গভীর গাঢ় সম্পর্ক।

আল্লাহ্র সাথে কামিল তাআল্লুক বা পূর্ণাঙ্গ সম্পর্ক কখন কায়েম হবে? যখন দুই দায়িত্ব আমি পালন করবো। এক নবুওতকে স্বীকার করা, দুই খাতমে নবুওতের দায়িত্ব পালন করা। নিজে দ্বীনের ওপর চলবো আর দ্বীনের প্রচার নিয়ে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়বো। তখন দ্বীনের এই দুই দিক পূর্ণ হবে। আল্লাহর সাথে তৈরি হবে প্রগাঢ় সম্পর্ক।

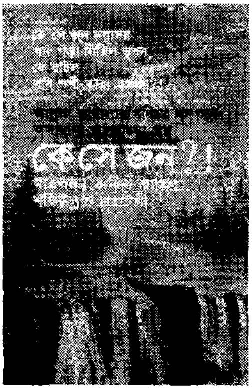

আট

সাহাবারা 'রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু' ছিলেন। তাঁদের মক্কা ছাড়ার কোনও দরকার ছিল না। আর মদীনা ছাড়ারও কোনও দরকার ছিল না। তাঁদের উপর তো আল্লাহতালা রাজী হয়ে গিয়েছিলেন। বদরের যুদ্ধে যাঁরা অংশ নিয়েছিলেন তাঁরা তো আরো বেশি মর্যাদা সম্পন্ন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন–

'লা আল্লাল্লাহা ইখ্‌তালা আলা আহ্‌লি বাদ্‌রিন ফাকালা লাহুম ঈমানু মাশিতুম ফাইন্নি ক্বাদ্‌ সাফারতু লাকুম।'

'হে বদরের যুদ্ধের সাথীরা, আল্লাহতায়ালা বলেন তোমরা যা ইচ্ছে করো; আমি তোমাদের আগেরও পেছনের সব গুনাহ মাফ করে দিয়েছি।'

এই বদর ও অহুদের বীর যোদ্ধারা আল্লাহর পয়গাম নিয়ে ঘরে ঘরে দুয়ারে দুয়ারে ফিরেছেন। কিন্তু এই সব সাহাবীদের তো আর মানুষের দুয়ারে যাবার দরকার ছিল না।

আবু তালহা আনসারী (রাঃ) কে বোখারা, রুম এর কোনও বিজন বনে দাফন করা হয়েছে। কেউ জানেও না ঠিক কোথায় তাঁর কবর।

আবু আইউব আনসারী (রাঃ) ইস্তাম্বুলে।

হিশাম বিন আস (রাঃ) বদরী সাহাবী। তাঁর দেহ টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে আছে আজরাদিন এর ময়দানে। নোমান ইবনে মোকাররম (রাঃ), তাঁর আহত দেহ ছটফট করতে করতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে নেহাওয়ান্দের ময়দানে।

মায়াম্মার ইবনে মাহদী (রাঃ), ইয়েমেনের সর্দার। তাঁর কবর নেহাওয়ান্দের বিজন মাঠে।

ওকুবা বিন নাফে (রাঃ), বিসকেরাতে। আবু লুবাবা (রাঃ) ও আবু জুমা (রাঃ) তিউনিসিয়াতে। মাআবাদ ইবনে আব্বাস ও আবু দুর ইবনে আব্বাস (রাঃ) সুমালি। কাশেম বিন আব্বাস রুশ সমরকন্দে। হুযাইফা বিম মুসলিম আল বাহী (রাঃ) ফারগানাতে তাঁদের কবর। মাআজ ইবনে জাবাল (রাঃ), যাঁর হাতে ওলামাদের পতাকা থাকবে; মদীনার ইল্‌মের মজলিশ ছেড়ে ইয়ারমুকের মরুভূমিতে গিয়ে শুয়ে আছেন। ওবায়দুল্লাহ্ বিন জাররাহ (রাঃ), আব্দুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা, জায়িদ বিন হারিসা, জাফর ইবনে আবু তালিব (রাঃ) ও পঁচিশ হাজার সাহাবী (রাঃ) ও তাবেঈনের কবর রয়েছে উরদুনের মুতায়।

সত্তর জন সাহাবা কুফায়।

সত্তর জন সাহাবা লিবিয়ায়।

পাঁচশো সাহাবা মিশরে।

ওকুবা বিন আমের ও ফজল বিন আব্বাস (রাঃ) সিরিয়ায়।

এক একজন সাহাবা দুনিয়ার এক প্রান্ত থেকে আরেক কোণে ছুটে চলেছেন। না খোঁজ আছে স্ত্রী'র, না ঠিকানা আছে সন্তানের। না গোছাতে পারছেন ঘর-সংসার। কেন তারা এমন ছুটে চলেছেন পৃথিবীর পথে পথে? কেন দুনিয়ার অলিতে-গলিতে, মাঠে-ময়দানে পড়ে আছে তাদের কবর? আল্লাহর ঘর বায়তুল্লাহের পাশে, জান্নাতুল বাকীতে, মদীনা মানোয়ারায় তাদের কবর হলো না কেন? আল্লাহর ঘর, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের রওজা মোবারক ছেড়ে কোথায় কোথায় পড়ে থাকলেন তারা? কেন?

শত শত হাজার হাজার সাহাবা (রাঃ) দেঁর কবর দুনিয়ার আনাচে কানাচে পড়ে আছে। নিজ বাসভূমি আর বাড়ি থেকে এতো দূরে আসার উদ্দেশ্য কি ছিল? চাকরি? ব্যবসা? তাদের উদ্দেশ্য ছিল স্রেফ দ্বীন ইসলাম কিভাবে দুনিয়ায় জিন্দা হয়ে যায়। দুনিয়ার সব কটা পাকা আর কাঁচা বাড়ি ইসলামের সুশীতল শান্তির ছায়ায় আশ্রয় নিক। দুনিয়াতে কিভাবে তৌহিদের বাণী উঁচু হয়। সাহাবা (রাঃ)দেঁর জন্যে স্ত্রী ছাড়া, সন্তান ছাড়া, ঘর-সংসার ছাড়া, ব্যবসা ছাড়া, বাণিজ্য ছাড়া কোনও কষ্টের ছিল না। কসম খোদার, তাঁদের জন্যে সবচেয়ে কষ্টের ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সঙ্গ ছাড়া। সেটাও তাঁরা করেছেন। শুধু দ্বীন ইসলামের খাতিরে। আর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের জন্যেও সবচেয়ে কষ্টের ছিল সাহাবা (রাঃ) দেঁর ছেড়ে থাকা।

মাআজ ইবনে জাবাল (রাঃ) কে যখন নিজ হাতে ইয়ামেনে পাঠাচ্ছেন তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বললেন, 'মায়াজ, মনে হয় তোমার আর আমার শেষ দেখা।'

'আসাআল্লাহ তালাকাদি বা'দা আমি হাজা।' 'যখন তুমি ফিরে আসবে তখন হয়তো আমাকে দেখবে না। কিন্তু আমার কবর তো দেখবে!'

মাআজ আর সহ্য করতে পারলেন না। কেঁদে দিলেন। 'যিস্ আন্ ফিরাকি রাসূলুল্লাহ!' বলতে গিয়ে ডুক্‌রে কেঁদে উঠলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ও কাঁদতে লাগলেন। তাঁর চিবুক বুক ছুঁলো। মাআজ জোরে কাঁদতে লাগলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম দেখলেন যে তাঁর কান্না দেখে মাআজ আরো কাঁদবে তখন তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন মদিনার দিকে। তাঁর কপোল বেয়ে গড়িয়ে পড়া মুক্তোর মতো টলটলে অশ্রু মুছে নিলেন। বললেন, 'হে মাআজ, দুঃখ ক'রোনা, ব্যথিত হ'য়োনা-'ইন্না আওলান্নাসি বিআল্ মুত্তাকুন, মান কানু অ-হায়সু কানু।' 'ক্বিয়ামতের দিন আমার সবচেয়ে কাছে সে হবে যে দ্বীনের জন্যে দূরে গিয়ে সেখানেই মারা যায়। সেখানেই তার কবর হয়।'

নিজ হাতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁর সাহাবীকে বিদায় দিচ্ছেন। সরিয়ে দিচ্ছেন দূরে নিজ ভালবাসা থেকে। প্রেম থেকে । কেন?

আল্লাহর জন্যে। দ্বীনের জন্যে।

জাফর ইবনে আবু তালিব, জায়িদ ইবনে হারিসা, আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা- এই তিনজনের কবর হয়েছে মুতায়।

কোথায় চলে গেছেন এই সব মহামানবেরা? বাড়ি ঘর সংসার ছেড়ে!

জাফর ইবনে আবু তালিব যুদ্ধ করছেন মুতায়। তিন হাজার মাইল দূরে মদীনার মসজিদে নববী। সাহাবী (রাঃ) এর সামনে বসে আছেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম। তাঁর চেহারায় বেদনা ও উৎকণ্ঠার ছাপ। তিনি উত্তেজিত স্বরে বললেন, 'ওই যে জাফর যুদ্ধ করছে! সে শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে! দুশমনও তাকে আক্রমণ করেছে। ওর হাত কাটা যাচ্ছে...' যুদ্ধের নির্মম ঘটনাগুলো দেখে বর্ণনা করছেন। হুবহু। এমন একজন কোমল হৃদয় যাঁকে কালামে পাকেও সহানুভূতিশীল এবং দরদী বলা হয়েছে। তিনি তাঁর চোখের সামনে তাঁরই সাথীর মর্মান্তিক মৃত্যু দৃশ্য দেখছেন। দেখছেন কিভাবে তাঁর সাথীর

হাত কাটছে, পা কাটছে। ক্ষত বিক্ষত হচ্ছেন, রক্তাক্ত হচ্ছেন। অবশেষে ঢলে পড়ছেন মৃত্যুর কোলে। তিনি বললেন, 'জাফর শহীদ হয়েছে!' শোকের তীব্রতায় তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এলো। নিজেকে কোনরকমে সংবরণ করতে চেষ্টা করলেন। তারপর চোখের পানি চেপে বললেন, 'জাফর বেহেশ্‌তে প্রবেশ করেছে।' তাঁর দু'চোখ ছাপিয়ে বেরিয়ে এলো শোকের অশ্রু। হযরত আলী (রাঃ) 'র ছোট ভাই। নিজের চাচাত ভাই জাফর। মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সে মারা গেলেন। তাঁর ছোট ছোট বাচ্চা রয়েছে। নিজ হাতে তিনি তাঁকে ঠেলে দিয়েছেন মৃত্যুর দিকে।

নিজ মাহবুবের, আর এতো বেশি ভালবাসার পাত্রের নির্মম মর্মান্তিক হত্যাকান্ড চেয়ে দেখলেন। কেন? যাতে এই রক্ত, এই আত্মবলিদানের কারণে আল্লাহতায়ালা দয়া করে হেদায়াত দিয়ে দেন কিয়ামত পর্যন্ত মানবজাতিকে।

এবার হাতে ঝান্ডা তুলে নিয়েছেন জায়িদ ইবনে হারিসা। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম মদিনার মসজিদ থেকে সব দেখতে পাচ্ছেন। তিনি বললেন, 'জায়েদ যুদ্ধ করছে। প্রবল বিক্রমে। ঝাঁক ঝাঁক শত্রু তাকে ঘিরে ফেলেছে। সে শহীদ হয়েছে।'

হায়, আফশোস! আজ যখন তাবলীগে চিল্লা, তিন চিল্লার কথা বলা হয় তখন আমরা আপত্তি তুলি আমাদের ছোট ছোট বাচ্চা আছে। ছোট ছোট বাচ্চা ফেলে কোথায় চলে গেছেন জাফর (রাঃ)? তাঁর বাচ্চাদের চোখের পানি আজ কে মুছে দেবে? নাকি তাঁদের বাচ্চার চেয়ে আমাদের বাচ্চার মূল্য বেশি? যদি তাঁরা তাদের বাচ্চাদের বিচ্ছেদ আর বিরহ যাতনা সহ্য না করতেন আমরা কালিমা তৌহিদের কথা কি বলতে পারতাম?

হায়! হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁর নিজের বাচ্চাদের আগে এতিম করেছেন। জাফর তাঁর চাচাত ভাই। তাঁর বাচ্চা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিজের বাচ্চার মতই। তিনি নিজের পরিবারের বয়স্ক এবং যুবকদের আগে কোরবানী দিয়েছেন। এই ছিল নবুওতের শান্! আমাদের মতো নয়। অন্যেরা কোরবানী হয়ে যাক; আমরা বেঁচে থাকি। কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আগে নিজের কোরবানী পেশ করেছেন।

একজন সাহাবী (রাঃ) এসে খবর দিলেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! জাফরের ঘরে কান্না কাটির রোল পড়ে গেছে।'

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের চেহারা মুবারাক বেদনায় নীল হয়ে গেল। তিনি বললেন, 'যাও তাদেরকে সান্ত্বনা দাও।'

আবার কিছুক্ষণ পর এসে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম! জাফরের ঘরে খুব কান্নাকাটি হচ্ছে।'

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বললেন, 'যাও তাদের সান্ত্বনা দাও।'

সাহাবী চলে গেলেন।

আবার খানিক পরে ফিরে এসে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! জাফরের ঘরে কান্নাকাটির রোল পড়ে গেছে!'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বললেন, 'যাও, তাদের সান্ত্বনা দাও। আজকের দিন তাদের জন্যে কেয়ামতের চেয়েও ভারী। বড় কঠিন দিন।' বলে তিনি ঝর ঝর করে কেঁদে দিলেন। কেঁদেই চললেন। সাহাবী (রাঃ) এর বেশ কবার আসায় আম্মাজান আয়েশা (রাঃ) খুব রাগ আর বিরক্ত হলেন। তাঁর ক্ষোভ ছিল বার বার এসে কেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের দুঃখের বোঝা বাড়াচ্ছেন। কেন বিরহের আগুনকে উস্‌কে দিচ্ছেন? কেন তাজা করছেন নীরব ব্যথাকে?

বাশির ইবনে কারাবা (রাঃ) ছোট সাহাবী। বালক। অল্প বয়স। হিজরত করে মদিনাতে এলেন। আসার পরই ইন্তেকাল হয়ে গেল তাঁর মায়ের। বাশির একা

হয়ে গেলেন। এই বাচ্চার আর কোন আশ্রয় ছিলনা। একমাত্র তাঁর পিতা। কারাবা (রাঃ)। একবার এক যুদ্ধে এক কাফেলার সাথে কারাবা (রাঃ) শরীক হলেন। মা হারা বালককে ফেলে গেলেন। একাকী বাশির। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সাথেই থাকলেন। তিনি অপেক্ষায় ছিলেন। কবে তার বাবা ফিরবে। তাঁর একাকীত্ব দূর হবে।

দিন যায়।

এক দিন শোনা গেল ফিরে এসেছে সেই দলটি। মদিনার উপকণ্ঠে। বাশির এই কথা শুনে ছুটে বাইরে চলে এলেন। এই মনে করে যে বাবাকে মসজিদে ঢোকার আগেই স্বাগতম জানায় তাহলে বাবা খুশি হবেন। আর সেও বাবার চেহারা দেখে বিরহের জ্বালা জুড়োবে। যে পথ দিয়ে মদিনাতে দলটি ঢুকবে তার পথের পাশে একটা উঁচু টিলার ওপর বসে রইলেন তিনি। ছোট ছেলেটি। পিতার অপেক্ষায়। বসে আছে। উদগ্রীব। দলটা দুই পাহাড়ের মাঝ দিয়ে ঢুকলো। বাশিরের অস্থির চোখ খুঁজছে পিতাকে। পাচ্ছে না। একসময় দলটা তার সামনের পথ ধরে চলে গেল। বাবাকে খুঁজে পেলেন না বাশির। তাঁর কচি অন্তর কেঁদে উঠলো। দ্রুতগতিতে নিচে নেমে এলো সে। ছুটছেন। মদিনার মসজিদের দিকে। মনে আশা। হয়তো দেখার ভুল হয়েছে। কিন্তু চলার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ালো একটা ছায়া। চোখ তুলে তাকালেন। দেখলেন হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম। তিনি পায়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। মুখোমুখি হলো বাশির। তার চোখ অশ্রুভেজা। সে বলল, 'মাআ দাফা আলা আবী, ইয়া রাসুলুল্লাহ্!' 'হে আল্লাহর রাসুল! আমার আব্বা কোথায়? দলটিতে তাকে দেখছি না যে!'

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম করুণার আধার। সবচেয়ে কোমল অন্তর যাঁর। তিনি এমন নির্মম সত্যের কী উত্তর দেবেন? ভেবে পান না। বাচ্চার চোখে চোখ রাখতে পারেন না। মুখ ঘুরিয়ে রাখলেন।

যেদিকে মুখ ঘুরিয়েছিলেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ছেলেটা সেদিকে দ্রুত এসে আবার কান্নাভেজা স্বরে শুধালো, 'ইয়া রাসুলুল্লাহ! মাআ দাফা আলা আবী!'

'হে আল্লাহর রাসুল! আমার আব্বা কই? তাকে কোথায় রেখে এলো?'

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম চোখের পানি ধরে রাখতে পারলেন না। কপোল বেয়ে উপচে পড়লো অশ্রুধারা। 'ফাশ্তারাআ, অ কারাবা!' তিনি কাঁদছেন। অঝোরে।

বাশির বলেন, 'যখন আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে কাঁদতে দেখলাম তখন সব বুঝে নিলাম। মুহূর্তেই পিতার অনুপস্থিতির কারণ পরিষ্কার হয়ে গেল আমার কাছে।'

তিনি চিৎকার করে বললেন, 'আজ্হাশ্তু বিল বুকা-!' 'হায়! আমি আজ আশ্রয়হীন! একা হয়ে গেলাম। মা ছিল না, আজ বাবাকে ও হারালাম!'

এমনি সব ব্যথার পাহাড় চিরে প্রবাহিত হয়েছিল দ্বীনের, ইসলামের ঝর্নাধারা। হায়, হায়!

কী ভাই, আমাদের বাচ্চারা কি তাঁদের বাচ্চাদের চেয়েও দামী!

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম দু'পা এগিয়ে কোলে তুলে নিলেন বালকটিকে। বুকে চেপে ধরলেন। বললেন, 'না-না বাশির! তুমি অনাথও না, আশ্রয়হীনও না।' 'অমা তার্দা আন্ ইয়াকুনা রাসুলুল্লাহি আবাক্, অ-আয়িশাতা উম্মুক্!' 'বাশির তুমি কি চাওনা আজ থেকে আল্লাহর রাসুল তোমার পিতা আর আয়িশা তোমার মা হোক?'

বাশির কেঁদে উঠলো। বললো, 'আমি রাজী, হে আল্লাহর রাসূল, 'আমি রাজী!' এই সব দুঃখের আর নীরব ব্যথার পাহাড় সমান বোঝা নিয়ে চলেছিল সেদিনের মহামানবেরা।

আরে ভাই! দু'চারটা সংসার নষ্ট হয়েই তো আবাদ হয় হাজার লক্ষ ঘর।

কিছু দুনিয়া বিলীন হয়ে তৈরি হয় বিশাল বর্ণাঢ্য নতুন দুনিয়া। নদীর এ কূল গড়ে ও কূল ভাঙে।

এক চাকুরিজীবি পিতা সকাল সন্ধ্যা প্রাণান্ত পরিশ্রম করে। অফিসে, আদালতে। এক ব্যবসায়ী সকালে বের হয়। এ দুয়ারে ধাক্কা খায়, ঐ দুয়ারে ধাক্কা খায়। এক অমানবিক জীবন, অনিয়মের জীবন। আর তারই কারণে একজন মেয়েলোক সুন্দরভাবে রুজি পাচ্ছে। ভালো পোশাক পরছে। তার ব্যক্তিগত সখ, আহলাদ, আরাম ও আয়েশকে হারাম করেছে। তখন আবাদ হয়েছে একটি ঘর।

একজন মানুষ হালাল রুজির জন্যে কী অসীম পরিশ্রমই না করে। অফিসের বসের ধমক, ঘুষ থেকে বেঁচে ঈমান রক্ষা করা। সেখানে রয়েছে বেপর্দা মেয়েলোক, তাদের হাত থেকে ঈমান বাঁচানো। এ অফিস থেকে ও অফিস ছুটাছুটি করা। তার মাথা যেন চিন্তায় চিন্তায় ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। তার শরীর যেন ক্লান্তিতে আর শ্রান্তিতে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যেতে চায়। তখন একটি ঘর সোনার সংসারে পরিণত হয়। একজন মানুষের ক্লান্তি, শ্রান্তি, মানসিক ও শারিরীক পরিশ্রম একটা সংসারে এনে দেয় সুখের বন্যা।

ভাই!

এই উম্মত এসেছিল আল্লাহর দ্বীন দুনিয়াতে জিন্দা করার জন্যে। নিজেদের জীবনের নিয়ম, সুখ ও শৃঙ্খলার বেড়া ভেঙে ফেলে বিশৃঙ্খল হয়ে দুনিয়ার কোণে কোণে চলে যেতে। আমাদের সুখ, নিয়ম ভেঙে যায় যাক। তবু পৃথিবীর মানুষ আল্লাহর কথা শুনুক, আল্লাহকে চিনে নিক, তাদের জীবন সুখী হোক, সমৃদ্ধ হোক। সুখ ও আনন্দে ভরে যাক তাদের দুনিয়া ও আখেরাত। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সাহাবা (রাঃ) নিজেদের সংসার নষ্ট করে, জীবনের সুখ-শৃঙ্খলা নষ্ট করে বের হয়ে পড়েছিলেন পৃথিবীর পথে পথে। দুনিয়ার অলিতে গলিতে। তাবেঈনগণ ও একই পথের পথিক ছিলেন। তাঁরা তাঁদের পরবর্তী পর্যন্ত দ্বীন পৌঁছে দিয়েছেন। অলিআল্লাহ গণ আমাদের পর্যন্ত দ্বীন পৌঁছে দিয়েছেন অসীম ত্যাগ ও তিতিক্ষার বিনিময়ে।

ভাই, 'পরমপ্রভুর শপথ!' ঘরে বসে থাকা এই উম্মতের জন্যে সমূহ আর ভয়ানক বিপদের কারণ ও জুলুম। আমাদের বেরিয়ে পড়তে হবে। কারণ, স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের বের করে দিয়েছেন। 'উখরিজাতি লিন্নাস।' মানবের কল্যাণের জন্যে বের করেছি তোমাদের। আমাদের ফিরতে হবে দেশ থেকে দেশে। দেশান্তরে। গলি থেকে গলিতে। দুয়ারে দুয়ারে।

এটাই আমাদের কাজ।

আরে ভাই,

এক একজন মানুষের জন্যে অন্তরে ব্যথা নিই। জগতের সব মানুষের জন্যে ব্যথা আর জ্বালার বিষপান করি। সারা দুনিয়ার মানুষের ব্যথার সমব্যথী হই। কেউ কোথাও ছটফট করছে বেদনায়,কেউ কোথাও অসুখে পড়েছে, কেউ পড়েছে বিপদে। তার জন্যে কেঁদে উঠতে হবে আমাকে। মহামহিম দয়ালু আল্লাহর কাছেও প্রার্থনা করতে হবে, 'হে আল্লাহ, তাকে তুমি দুনিয়ার কষ্ট থেকে বাঁচাও আর বাঁচাও পরকালের কষ্ট থেকে। তাকে তুমি বাঁচাও দুনিয়ার, দুঃখ, ব্যথা, বেদনা, তাপ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা আর অসুখের কষ্ট থেকে। সাথে আখিরাতের ও।'

এই হোক আমার সারাক্ষণের ভাবনা, কামনা, দুশ্চিন্তা, ব্যথা আর দুঃখ।

এটাই আমাদের নবীর শিক্ষা।

হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আবুবকর (রাঃ) এর সাথে বিয়ে হয়েছিল হযরত আতিকা (রাঃ) সাথে। সুন্দরী স্ত্রী। সুন্দর তার ভালবাসা। স্ত্রীর ভালবাসার বাঁধনে জড়িয়ে পড়লেন আবদুল্লাহ। এতই বেশি আর প্রগাঢ় যে আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়া ছেড়ে দিলেন। আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) তাঁকে বোঝালেন। 'বেটা, বিবির প্রেমের বাঁধনে এমনভাবে জড়িয়ে পড়ো না যে দ্বীনের কাজ নষ্ট হয়, ক্ষতি হয়।'

বলেন ভাই,

স্ত্রীর প্রেমে পড়ে কি আমরা কেউ দোকান ছেড়ে দিই? অফিসে যাওয়া বন্ধ করি? ব্যবসা পাতি ছেড়ে দিই? তাহলে তো বাবা–মা শাসন করবে। এমন কি যার রূপে গুণে মজে সব ভুলতে বসেছি সেই সাধের স্ত্রীই এসে বলবে, 'তুমি কাজ কাম ছেড়ে দিলে খাবো কি? যাও, তাড়াতাড়ি দোকান শুরু করো। অফিসে যাও। সমস্ত ভালবাসাই তো প্রয়োজনের জন্যে। আমার প্রয়োজন মেটাও তাহলেই ভালবাসা পাবে।'

কাজ না করলে ভালবাসা জানালা গলে পালায়।

ওখানে কাজ ছিল কি?

কালিমা তাইয়্যিবার প্রচার। দুনিয়া জুড়ে আল্লাহর নাম উঁচু করা।

হযরত আবুবকর (রাঃ) ছেলে কে বলেন, 'বাবা, তুমি আমার ছেলে হয়ে কী করছো?' তবুও যখন সে বুঝলো না। তখন তিনি বললেন, 'যাও তুমি তোমার স্ত্রীকে তালাক দাও।'

সব পিতার কথায় স্ত্রীর তালাক জায়েজ হয় না। আবুবকর (রাঃ) এমনই এক পিতা যাঁর কথায় পুত্রের স্ত্রীর তালাক জায়েজ হয়ে যায়। তিনি বললেন, 'তুই যদি আমার ছেলে হয়ে দ্বীনের কাজ না করিস তো তোর স্ত্রী তালাক দিয়ে দে!'

দ্বীনের জন্যে ছেলের ঘরকে উজাড় করে দিলেন!

পিতার কথা শুনতেই হবে। তালাক হয়ে গেল। আবার শুরু হলো আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়া। ঠিক হয়ে গেলেন। কিন্তু আতিকা (রাঃ)'র কথা ভুলতে পারলেন না। একদিন। তুষার ঘন রাত। ঝোড়ো হাওয়া বইছে। আবদুল্লাহর অন্তরে ব্যথার ঢেউ। আতিকাকে তাঁর মনে পড়ছে। তিনি আবৃত্তি করছেন।

'আতিকা লা আন্ সাকিমা মা গারাকারেকুম অলা নাহাকুম মিন্ ফামা মুল মুতাওওয়াকা;

আশিকো ক্বালবি কুল্লা ইয়াওমিল মিন্ লায়লাতিন ইলাইকা বিমা তুখ্ফিন নুফুস্ মুআল্লাকা।'

'হে আতিকা, তোমাকে আমি কখনও ভুলতে পারবো না। যতদিন দিন আর রাত হবে, যতদিন সূর্য চমকাবে, চাঁদ কিরণ দেবে ততদিন তোমার স্মৃতি আমার অন্তরে জাগরুক থাকবে।'

আবুবকর (রাঃ) যখন ছেলের বিরহ্ ব্যথার কথা জানতে পারলেন তখন অস্থির হয়ে রুজু করে আবার বিয়ে দিয়ে দিলেন।

কিন্তু আল্লাহর মহিমা!

আবদুল্লাহর মৃত্যু ঘরে হলো না। যুদ্ধের ময়দানে শত্রুর ছোঁড়া সুতীক্ষ্ণ ফলা বুকে বিঁধে রক্তাক্ত করে দিল তাকে।

তিরিশ বছরের সুদর্শন যুবক। আহত অবস্থায় মদিনায় নিয়ে এলো। তীর তখনও বের করা হয়নি। রক্তাক্ত স্বামীর পাশে সুদর্শনা যুবতী স্ত্রী দাঁড়িয়ে। চোখের পানিও শুকিয়ে গেছে। বিমূঢ়, রুদ্ধবাক, অশ্রুভেজা স্ত্রী'র চোখের সামনে ছটফট করতে করতে মারা যাচ্ছে তাঁর যুবক স্বামী। তীরবিদ্ধ, রক্তাক্ত অবস্থায়ই মারা গেলেন তিনি।

হযরত আতিকা (রাঃ) বিরহকাতর, বিধুরা। তাঁর অশ্রুভেজা কণ্ঠে উচ্চারিত হলে, 'আলাইকা লা তান্‌ফাক্কু ই-হাজিরাতান আলাইকা অ-ইনালফাক্কু ইন্‌দি আকবারা।' 'আমিও কসম খাচ্ছি আজ থেকে আমার শরীর কখনও নরম কাপড় পরবে না। আমার শরীরে আর কখনও সুগন্ধি ছড়াবে না।'

'লিল্লীহ্ আয়নান মান্ রাহ্‌ফাতান্ মিন্‌লাহ্ আকাবারাকা আহ্‌মা ফিল হায়া ইয়ু আক্‌সারা।'

'তুমি কত সুন্দর বীর যুবক ছিলে! তৌহিদের বাণীকে উঁচু করার জন্যে শত্রুর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে।'

'মাগাত, তাহ্‌রিহিনা সাল্লাত হামামাতু আয়কতা অমা তারদাল লাইলুস সাবহুল অ মুনাওয়ারা।'

'যখন পর্যন্ত সূর্য ও চাঁদ উঠবে, পাখিরা গাছে গাছে ডাকবে; আকাশে আলো ছড়াবে আর আঁধার হবে তোমার ভালবাসা চমকাবে। তোমাকে মনে পড়বে। তোমার ভালবাসা আমাকে অস্থির করবে।'

ভাই, এভাবেই দ্বীন দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

আরে ভাই, আমরা আজ কালিমাকে সারা পৃথিবীতে প্রচার করা নিজের কাজ বুঝিনি। আমাদের তাওবা করা উচিত। এক একজন মানুষের হেদায়াতের, মুক্তির আকাঙ্খা বুকে নিয়ে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অন্তরের ব্যথাকে পুঁজি করে দুনিয়ার প্রতিটি মানুষের কাছে পৌছানোকে আমি আমার কাজ মনে করিনি।

এক একজন মানুষের ব্যথায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ব্যথিত ছিলেন। জাবালা বিন এরহাম মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। সে মদীনা ছেড়ে তুরস্কের ইস্তাম্বুলে চলে যায়। হযরত ওমর (রাঃ) এর জামানা চলে এলো। তিনি কাসেদ বা দূত পাঠালেন। বললেন, 'যাও। ওখানে জাবালা আছে। তার সাথে দেখা করো। তাকে আবার ফিরে আসার দাওয়াত দাও। দূত সেখানে গেল। জাবালার সাথে দেখা। তাকে দাওয়াত দিল। জাবালা বলল, 'যদি ওমর আমাকে খেলাফত ও তার মেয়েকে বিয়ে দেয় তাহলে আমি ইসলাম গ্রহণ করবো।'

দূত বললেন, 'তাঁর মেয়ের ব্যাপারে কথা দিতে পারি যে আমি তার সাথে আপনার বিয়ের জন্যে রাজী করাবো। কিন্তু খেলাফত তো পরামর্শের ব্যাপার। এ ব্যাপারে আমি দায়িত্ব নিতে পারছি না।'

'তাহলে যাও মদিনায় গিয়ে জিজ্ঞেস করে এসো খেলাফত দিতে তৈরি কিনা।' জাবালার কথায় বিদ্রুপ। দূত ফিরে এলো মদিনায়। উটের পিঠে চড়ে আট হাজার মাইল পথ পেরিয়ে। দুর্গম, দুস্তর মরু। হযরত ওমর (রাঃ) শুনলেন জাবালার কথা। তিনি দুঃখিত ও উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'আরে ভাই! তুমি তার কথায় রাজী হলে না কেন? খেলাফতের ওয়াদাও তুমি করে আসতে!'

দূত উটের পিঠ থেকে নামতে পারেনি। তিনি বললেন, 'খলিফাতুল মুসলিমীন, আমীরুল মু'মিনীন। খেলাফতের কথা আমি কী করে বলতে পারি?'

'ঠিক আছে, তুমি এখনই ফিরে যাও। জাবালাকে বলো, সে ইসলাম ধর্মে ফিরে এলে তাকে আমার কন্যার সাথে বিয়ে দেব আর খেলাফতও সে পাবে।'

আবার সেই দুস্তর মরুভূমি। সাপ, নেকড়ে, মরুঝড় আর হায়েনার ভয়ভীতি ভরা হাজার হাজার মাইল পথ চলা। অবশেষে একদিন দূত এসে পৌছে গেলেন ইস্তাম্বুলের সীমানায়। শহরে ঢুকতেই দেখতে পেলেন একটা শবযাত্রা। শবদেহকে ঘিরে কিছু মানুষ। তিনি কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কার লাশ এটা?'

'জাবালা বিন এহরাম,' ওদের মাঝ থেকে কেউ বলল, 'আরবের সর্দার!'

শোকের ছায়া নেমে এলো দূতের চেহারায়। তাঁর চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়লো দু'ফোটা জল।

জাবালার দিন ফুরিয়ে গেল। দুনিয়ার জীবন শেষ। সে ইসলাম পেল না। ওমর ফারুক (রাঃ) দূতের কাছে সব শুনে খুব ব্যথিত হলেন। তাঁর চেহারায় কালো ছায়া নামলো।

কেন ভাই?

তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের দরদে দরদী ছিলেন। তাঁর অন্তরে অনুশোচনা হয়তো তিনি হুজুরের উম্মতের জন্যে সঠিক দায়িত্ব পালন করতে পারেননি। কী হতো একজন মুরতাদ ঈমান ছাড়া চলে গেলে! কী হতো এতো বড় একজন পরাক্রান্ত বাদশাহর একজন প্রজা মুরতাদ হয়ে মারা গেলে? আসলে তাঁদের অন্তরের সব সময়ের চাহিদাই ছিল একজন উম্মতও যেন জাহান্নামে না যায়। তার জন্যে কী চরম উদ্বেগ, কী অস্থিরতা আর আবেগের চূড়ান্ত যে নিজ রাজত্ব ও কন্যা–সব দিতে তৈরি। তবুও সে হেদায়াত পাক। মুসলমান হোক।

কারণ তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সাহচর্যে ছিলেন। ইসলামের প্রকৃত মহীয়ান ও গরীয়ান দিকটা সঠিকভাবে তাঁর সামনে খোলা ছিল। তাই এত বড় ত্যাগের বিনিময়েও একজনের হেদায়াত চেয়েছিলেন।

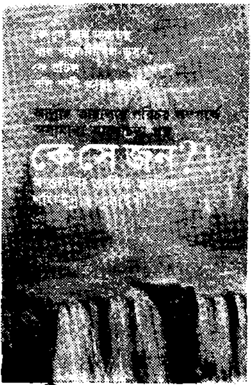

নয়

ওহাশী (রাঃ) কে আপনারা জানেন। তিনি সাহাবী ছিলেন। রাদিআল্লাহু তালা আনহু। হযরত হামজা (রাঃ) এর হত্যাকারী। হযরত হামজা (রাঃ) ছিলেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের খুবই প্রিয়জন। চাচা, ভাই ও বন্ধু। তাঁর ইসলাম গ্রহণে শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছিল মুসলমানদের। ওহাশী এই হামজা (রাঃ)কে হত্যা করেছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে হঠাৎই হযরত হামজা (রাঃ)কে দেখতে পেলেন না হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম। একটু আগেও দু'হাতে তরবারি নিয়ে শত্রুর ভীষণ ভিড়ে তাঁকে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখেছেন। বীর বিক্রমে যুদ্ধ করছিলেন। এখন কোথায় গেল? তিনি দু'জন সাহাবী (রাঃ) কে তাঁর খোঁজ করতে পাঠালেন। তাঁরা সেখানে গিয়ে দেখলেন শহীদ হয়ে গেছেন হামজা (রাঃ)। তাঁর বুক চিরে ফেলেছে। পেট ফাড়া। নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে গেছে। তাঁর কলিজা চিরে ফেলেছে। শুধু তাই নয়, কে যেন চিবিয়েছে। এই বীভৎস দৃশ্য দেখে শোকে, দুঃখে দু'জন সাহাবী যেন বোবা হয়ে গেলেন। তাঁরা ফিরে এলেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের কাছে।

'হামজা কোথায়? কী অবস্থা তাঁর।' হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন।

তাঁরা উত্তর দিতে পারলেন না। শুধু বললেন, 'আপনি নিজে গিয়ে দেখে আসুন, ইয়া রাসুলুল্লাহ।'

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সেখানে এলেন। ছিন্নভিন্ন লাশ। তিনি নির্ণিমেষে চেয়ে রইলেন। তাঁর ঠোঁট কেঁপে উঠলো। চোখ ফেটে বেরিয়ে এলো পানি। ধীরে ধীরে বসে পড়লেন। লাশের পাশে। ছুঁয়ে দেখলেন রক্তাক্ত চাচাকে। হাতে তাজা রক্ত চলে এলো।

সেই রক্তের দিকে চেয়ে রইলেন। অনেকক্ষণ। তারপর তেইশ বছরে যে দৃশ্য কেউ দেখেনি তা দেখলো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ডুকরে কেঁদে উঠলেন। উচ্চকিত স্বরে। শিশুর মতো। এতো জোরে কাঁদলেন যে বহুদূর পর্যন্ত সে শব্দ পৌঁছে গেল। দূর থেকে সাহাবারা ছুটে ছুটে এলেন। সবারই চোখে মুখে শোক আর বিস্ময়। মিশ্র প্রতিক্রিয়া। কারণ তাঁরা তাঁদের নবীকে এত বেশি শোকাভিভূত হতে আর দেখেননি। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কাঁদছেন, হযরত আলী (রাঃ) কাঁদছেন, সাহাবা (রাঃ) গণ কাঁদছেন। কান্নার রোল পড়ে গেল। এক মর্মস্পর্শী দৃশ্য। অসহ্য বেদনায় গুমরে গুমরে কাঁদছেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম। তাঁর প্রাণপ্রিয় ভাই, চাচা, ও বন্ধুর লাশ তাঁর সামনে। আর এমন পবিত্র, দামী লাশ!

তায়েফে এত পাথর আর ইট তাঁর ওপর পড়েছিল যে তিনি বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু চোখ থেকে পড়েনি এক ফোটা পানি। আজ চাচার লাশকে সামনে দেখে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম দিশাহারার মতো কাঁদছেন। এমন সময় আসমান থেকে নেমে এলেন জিব্রাইল আমিন। তিনি বললেন, 'ইয়া রাসুলুল্লাহ! আল্লাহতালা বলেন, 'আপনি দুঃখ করবেন না। আমি হামজাকে আরশে নিয়ে গেছি।' আর হামজা হচ্ছেন, 'হামজাতু আসাদুল্লাহি অ-আসাদুর রাসুল। হামজা (রাঃ) আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বাঘ।'

তো কত দুঃখ পেলেন তিনি!

এই ওহাশী (রাঃ) মক্কা বিজয়ের পর পালিয়ে গেল তায়েফে। মক্কা থেকে প্রায় ছ'শো কিলেমিটার দূরে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম একজন সাহাবীকে সেখানে পাঠিয়ে দিলেন। 'যাও, ওহাশীর সাথে দেখা করো। তাকে বলো, সে যেন কালিমা পড়ে নেয়। আল্লাহ পাক তাকে মাফ করে দেবেন। সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।'

আজ দুনিয়াতে মানুষ প্রতিশোধ স্পৃহায় এমন হয় যে সামান্য ক্ষতির কারণে অপরকে হত্যা করে ফেলে। যেন মাছি মশা মারছে। কীট পতঙ্গের চেয়ে কমে গেছে মানুষের দাম। সামান্য স্বার্থের জন্যে এক দু'জন নয় হাজার হাজার লাখ লাখ মানুষ হত্যা করে ফেলছে। সে নামাজ পড়ে, রোজা রাখে, হজ্জ করে, জাকাত দেয়। অথচ সামান্য কারণে ছিনিয়ে নিচ্ছে মানুষের অমূল্য প্রাণ। কাল হাশরের মাঠে সবচেয়ে প্রথম যে বিচার হবে তা হচ্ছে মানুষ খুন করার। এর থেকে মুক্তি পাওয়া খুব কঠিন হবে। হত্যাকারী হাতে কাটা গর্দান নিয়ে আসবে। তার থেকে নালিশ উঠবে, 'হে আল্লাহ, সে আমার প্রাণ হরণ করেছিল। কেন?'

কোন কোন আলিম বলেন মুক্তি পাবেনা খুনী, হত্যাকারী। যদি ঈমান এনে থাকে তবুও সে জাহান্নাম থেকে রেহাই পাবে না।

তবে তাওবা কারীর কথা আলাদা। তার তো সব গুনাহই ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যায়। যেমন বনী ইস্রাইলের এক ব্যক্তি এক'শ জনকে হত্যা করেছিল। তারপর তাওবা করে। দয়ালু আল্লাহ তাকে মাফ করে দেন।

তো ভাই, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ভুলে গেলেন প্রতিশোধ নেবার কথা। তাঁর এতো বড় আপন জনের গভীর শোকব্যথা সহ্য করে নিলেন উম্মতের হেদায়াতের জন্যে। সেখানে দূত পাঠালেন। তাকে ইসলামে দীক্ষিত হবার জন্যে দাওয়াত দিতে।

তায়েফে পৌঁছে সেই সাহাবী (রাঃ) ওহাশীর সাথে দেখা করলেন। তাঁকে শোনালেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পয়গাম। সে বললো, 'আমি এই কালিমা পড়ে কি করবো? আমি তো শিরক করেছি। আমার গুনাহ্ মাফ হবার নয়।'

সাহাবী বললেন, 'আল্লাহ্ মাফ করে দেন সব গোনাহ।'

ওহাশী বললেন, 'আমি চুরি করেছি, ব্যভিচার করেছি, মানুষ খুন করেছি। এমনকি আমীর হামজার হত্যাকারীও আমি। আমি শরাব পান করেছি। আমার আর মাফ পাবার কোনও রাস্তা নেই। অন্য কোনো কথা বলো। তুমি ফিরে যাও।'

সেই দূত ফেরত এলো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে ওহাশীর সব কথা শোনালেন। তিনি তাকে বললেন, 'তুমি ফিরে যাও তায়েফে। আর ওহাশীকে এ কথা বলো যে, আমার মহান প্রতিপালক এ কথা বলেন, 'ইল্লা মান তাব্ অ-আমান অ-আমিলা

আমালান সালিহা, ফা-উলাইকা ইয়ুবাদ্দিলুল্লাহ শায়্যিআতিন হাসানাত অকানাল্লাহু গাফুরার রাহিমা।'

'তাওবা করো, ঈমান আনো, সৎকর্ম করো। আল্লাহতায়ালা গুনাহকে নেকীতে পরিণত করবেন। ওহাশী শুনে বললো, 'এ বড় কঠিন শর্ত। ঈমান আনো, সৎকর্ম করো-এ আমাকে দিয়ে হবে না। অন্য কোনও রাস্তা বলো।'

সাহাবী আবার ফিরে এলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বললেন, 'তুমি আবার ফিরে যাও।'

আরে ভাই, এই যাওয়া আসা কত কষ্ট! এখন তো টেলিফোনে কথা হচ্ছে। প্রায় ছ'শো কিলোমিটার দূরে আসা-যাওয়ার কষ্ট! তাও শুধু একজন মানুষের জন্যে। তাও সে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এঁর সবচেয়ে প্রিয়জনের হত্যাকারী। সবচেয়ে বেশি ব্যথা দিয়েছে। সবকিছুকে উপেক্ষা করে মানুষটির হেদায়াতের উন্মাদনায় সাহাবা (রাঃ) ও রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কত কষ্টের জন্যে তৈরি।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সাহাবীকে বললেন, 'তুমি ফিরে গিয়ে তাকে বলো, আমার প্রতিপালক অত্যন্ত দয়ালু। তিনি বলেন,-

'ইন্নাল্লাহা লা-ইয়াগ্‌ফিরা আঁই ইয়ুশ্‌রিকা বিহি অইয়ুশ্ ফিকা মা'দুনা জালিকা লিমাই ইয়াশা।'

'আল্লাহতায়ালা শিরক্ ছাড়া সব গুনাহ মাফ করে দিবেন। যাকে ইচ্ছা।'

ওহাশী এটা শুনে বললো, 'তিনি 'যাকে ইচ্ছা' বলেছেন। আমাকে নাও মাফ করতে পারেন। কথার মধ্যে জটিলতা রয়েছে। অন্য রাস্তা দেখো। তুমি ফিরে যাও।'

তিনি আবার ফিরে এলেন।

আল্লাহু আকবার!

আল্লাহ আমাদের কেমন নবী দিয়েছেন। এমন শফিক নবী! এমন দয়ালু। এমন তাঁর প্রেম উম্মতের প্রতি। নিজের হৃদয়ের জখমকে উপেক্ষা করে ঘৃন্য একজন কাফিরের কাছে বার বার পাঠাচ্ছেন পয়গাম। দেখছেন না সাথীর কষ্ট, দেখছেন না কিভাবে সাথীর আর তাঁর নিজের আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ন হচ্ছে! এখন তো মক্কা বিজয় হয়েছে। এখন আর এতো খোশামদের দরকার কি? সুবহানাল্লাহ!

এই ছিল নবীর তরীকা!

বারে বারে। দুয়ারে দুয়ারে।

আমার ভাই, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের এক আদর্শ আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক পয়দা করে। আর তার বিপরীত, তাঁর আদর্শকে উপেক্ষা করলে আল্লাহ থেকে আলাদা হয়ে যায় মানুষ।

মাত্র একজন মানুষ। তাও ঘোর দুশমন। ওহাশী!

তার জন্যে এতো প্রাণান্ত পরিশ্রম!

একটা টাকা। তাই বলে কেউ তাকে ফেলে দেয় না রাস্তায়। উপেক্ষা করেনা। বলে না, 'মাত্র একটা টাকা! ফেলে দিই।' এক একটা ভোটের জন্যে প্রার্থী কেমন ছুটতে থাকে! এই দুয়ার থেকে ওই দুয়ার! কেন? এই বিশ্বাসে যে একটা ভোটের কারণে জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হতে পারে। এক একটা নম্বরের জন্যে ছাত্র সারা রাত ধরে পড়াশোনা করে। কারণ একটা নম্বর তাকে সফলতার শীর্ষে ওঠাতে পারে। আবার এই একটি নম্বরের জন্যেই পরীক্ষায় সে হতে পারে ব্যর্থ। এক একটা বেতনের স্কেল বাড়ানোর জন্যে এক একজন কর্মকর্তা সারা দিন মান তার দেহ মন লাগিয়ে দেয়। প্রাণান্ত পরিশ্রম করে। টাকা খরচ করে।

কিন্তু ভাই, নবীর একটা তরীকা অবহেলায় পড়ে আছে। চিত্তে কোনো চাঞ্চল্য নেই। সবটাই যে মানতে হবে এমন কি কথা! হায় আফশোস! এটা কি ভালবাসার কথা হলো ভাই! এতো স্বার্থপরের কথা। হিসাব নিকাশ করে যে ভালবাসা বিকায়। সুন্নাত! ঠিক আছে করলেও চলে না করলেও। না ভাই, এ বড় অন্যায়, অবিচার। যিনি তোমার মৃত্যুর সময়

কাছে এসে দাঁড়াবেন, কবরে তোমাকে সাহায্য করবেন। হাশরের মাঠে সব নবী বলবেন, 'ইয়া নাফসি' 'ইয়া নাফ্সি।' তখন তিনি, তোমার নবী তোমার পাশে এসে দাঁড়াবেন। বলবেন, ইয়া হাব্লি উম্মতি, ইয়া উম্মাতি।'

পুলসিরাতে সমগ্র মানব একে অন্যকে ভুলে যাবে। আর তিনি পুলসিরাত আঁকড়ে ধরে বলবেন, 'রাব্বি আন্নি অসাল্লিম-'

'হে আল্লাহ্ তুমি পার করে দাও, তুমি পার করে দাও।'

তো ভাই, একজন মানুষের হেদায়াতের জন্য যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম মেহনত করলেন তখন তাঁর অন্তরকে আল্লাহ্ তায়ালা হেদায়াতের দিকে পরিবর্তন করে দিলেন।

ওহাশী মুসলমান হলেন।

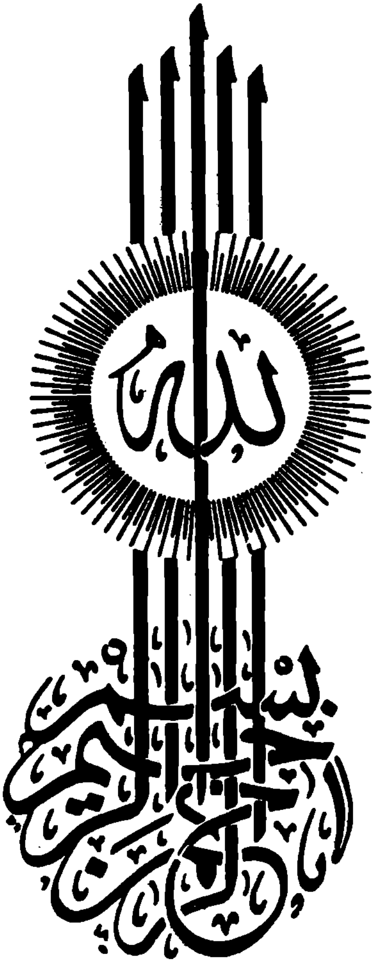

এক.

শ্রদ্ধেয় ভাই, দোস্ত ও বুজুর্গ,

আলহামদুলিল্লাহ্, আল্লাহ্ পাকের দরবারে লাখ শুকরিয়া যে তিনি আমাদেরকে আজকের মাগরিবের তিন রাকাত ফরজ নামাজ মসজিদে এসে পড়ার তাওফিক দিয়েছেন। যে ব্যক্তি এক ওয়াক্ত নামাজ পড়তে পারলো না বড়ই দুর্ভাগ্য তার। সে যদি পরেও এই নামাজ পড়ে নেয় তবু দুই কোটি ৮৮ লক্ষ বছর তাকে জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে হবে।

'রুবিয়া আন্নাহু আ'লাইহিস্ সালাতু অস্সালাম। ক্বালা মান তারাকাস্ সালাতা তাত্তা মাদা ওয়াক্তুহা সুম্মা ক্বাদা উজ্জিবা ফিন্নারি হুক্বা, অল হুক্বু সামানুনা সানাতান অস্ সানাতু সালাসুমিআতিউঁ অশিত্তুনা ইয়াওমান কুল্লা ইয়াওমিন কানা মিক্বদারুহু আলফা সানাতিন–'আর যে ব্যক্তি জেনে শুনে এক ওয়াক্ত নামাজ ছেড়ে দেয় তার নাম দোজখের দরজায় লিখে দেয়া হয়। সে নিশ্চয়ই ওই জাহান্নামে ঢুকবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, একদিন নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম বলেন, 'তোমরা এই দোয়া করো, হে আল্লাহ্! আমাদের মাঝ থেকে কাউকে বঞ্চিত, হতভাগা করো না। তারপর তিনি নিজেই বললেন, 'তোমরা কি জানো বঞ্চিত ও হতভাগা কারা? সাহাবা (রাঃ) বললেন, 'এ ব্যাপারে আপনি ও আপনার আল্লাহ্ বেশি জানেন।' হুজুর (সাঃ) বললেন, যারা নামাজকে ছেড়ে দেয় তারাই বঞ্চিত ও হতভাগা। এক হাদীসে আছে, দশ ব্যক্তি বিশেষভাবে শাস্তি পাবে। তার মাঝে একজন যে নামাজ ছেড়ে দেয়। তার হাত পা বাঁধা থাকবে। তার মুখে ও পিঠে আঘাত করবে ফিরিশ্তা। জান্নাত বলবে, 'তোমার সাথে আমার কোনও সম্পর্ক নেই। আমি তোমার নই ,তুমিও আমার নও।' দোজখ বলবে, 'এসো, আমার কাছে এসো। তুমি আমার, আমিও তোমার।'

জাহান্নামে লম্লম্ নামে একটা মাঠ রয়েছে। তাতে সাপ আছে। উটের ঘাড়ের মতো মোটা। লম্বায় তারা এক মাসের পথ। জুব্বুল হুজুন নামে একটা মাঠ আছে দোজখে। এটা বিচ্ছুদের আবাস। খচ্চরের মতো বড় এক একটা বিচ্ছু। এদের তৈরি করা হয়েছে বেনামাজীকে ছোবল মারার জন্যে। হাফেজ ইবনে হাজার (রঃ)এর একটা থলে কবরে পড়ে যায়। কবর খোঁড়া হলো। সে বিস্ময়ে, ভয়ে বোবা হয়ে গেল। গোটা কবর আগুনের শিখায় পরিপূর্ণ। তার মা বলল, মেয়েটি নামাজে অলসতা করতো আর প্রায়ই নামাজ ক্বাজা করে দিত।

তো ভাই, আল্লাহ্তায়ালা আমাদের এইসব ভয়ানক শাস্তি থেকে মুক্তি দিলেন নামাজ পড়ার তাওফিক দিয়ে। নামাজ এক মহান সম্পদ। গুপ্তধন। আমাদের পূর্বপুরুষেরা নামাজে দাঁড়াতো আল্লাহ্তায়ালার সাথে কথা বলার জন্যে। 'আস্ সালাতু মিরাজুল মু'মিনীন'। মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম যখন ঘরে আসতেন তখন আমাদের সাথে সুন্দর স্বাভাবিক কথা বলতেন। কিন্তু মুয়াজ্জিনের আজান শোনা মাত্র নামাজে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। অস্থির। গুরুগম্ভীর। কথাবার্তা বন্ধ। আমাদের যেন তিনি চিনতেই পারছেন না। হযরত হাসান (রাঃ) বলেন, 'হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম নামাজে এতো বেশি সময় দাঁড়িয়ে থাকতেন যে তাঁর পা মোবারক ফুলে যেত। কাঁদতেন। অঝোরে। ডুকরে ডুকরে। তাঁর চোখের পানিতে নামাজপাটি ভিজে যেত।

হযরত আবদুল্লাহ্ বিন যুবাইর (রাঃ) কা'বা শরীফে নামাজে দাঁড়াতেন। হেরেম শরীফের কবুতরগুলো তাকে মনে করতো শুকনো কাঠ দাঁড়ান আছে। তার মাথার উপর এসে বসতো। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের প্রবল প্রতাপ তাঁর চেতনাকে লুপ্ত করে দিত। 'মান্ হাফাজা আলাস্ সালাতি আকরামুহুল্লাহু তায়ালা বিখাম্‌শি খিসালিন ইয়ুরফাউ আনহু দিকুল আ'য়শাঈ অ আযাবুল কাব্‌রি অ ইয়ু'তিহিল্লাহু কিতাবাহু বিইয়ামিনিহি অইয়ামুররু আলাস্ সিরাতি কাল্ বারকি অইয়াদ্‌খুলুল জান্নাতা বিগায়রি হিসাব'০'যে লোক নামাজকে সুরক্ষা করবে তাকে পাঁচভাবে সম্মানিত করবেন আল্লাহ্তায়ালা। তার রুজীর টানাটানি থাকবে না, কবরের শাস্তি সরিয়ে দেয়া হবে, পুলসিরাত বিজলির মতো পার হয়ে যাবে, ডানহাতে আসবে আমলনামা, বিনা হিসেবে সে যাবে জান্নাতে।'

তো আল্লাহ্ তায়ালা এই নামাজ আমাদের পড়ার তাওফিক দিয়েছেন। যখন কোনও মুসুল্লী অজু করে, অজুর পানির সাথে তাঁর গোনাহগুলো ধুয়ে যায়। ইমাম আজম হানিফা (রঃ) ছিলেন আহলে কাশ্ফ্। তাঁর অন্তর্চক্ষু খোলা ছিল। তিনি অজুখানায় দাঁড়ান থাকতেন। একদিন এক যুবকের উদ্দেশ্যে বললেন, 'এই যুবক, তুমি নামাজও পড়ছো আবার শক্ত গোনাহে লিপ্ত রয়েছো?' যুবকটি চমকে উঠলো। তার গোপন গোনাহের কথা আল্লাহ্ ছাড়া

আর কেউ জানেনা, ইনি বললেন কিভাবে? ইমাম আজম তাঁর মনের কথা বুঝে বললেন, 'অজুর পানির সাথে তোমার গোনাহ ধুয়ে যাচ্ছে। আমি দেখতে পাচ্ছি।'

অনেক মুসুল্লির অবস্থা তিনি দেখলেন। একদিন তাঁর নতুন ভাবোদয় হলো। তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম এর হাদীস সামনে আনলেন। যখন কারও অন্তরে কোনও মুসলমান সম্পর্কে খারাপ ধারণা আসে তখন তার দোয়া কবুল হয় না। তিনি তখন আল্লাহ্তায়ালার দরবারে আরজ করলেন, 'হে আল্লাহ্, যে কাশ্ফের কারণে আমি অপর মুসলমানের গুনাহ্ দেখছি তা বন্ধ করে দাও। কারণ অপর মুসলমান সম্পর্ক আমার ধারণা খারাপ হয়ে যাচ্ছে।' কাজেই ভাই, যখন মুসুল্লি অজু করে তখন তার সব গুনাহ্ অজুর পানির সাথে ধুয়ে যায়।

অজু করা অবস্থায় মুসুল্লি যা দোয়া করে আল্লাহ্ সব কবুল করে নেন। যদি সে ইস্তেঞ্জা থেকে পবিত্র হয়ে এই দোয়া করে–'আল্লাহুম্মা নাক্কি ক্বালবি মিনাশ্ শাক্কি অন্ নিফাকি অহাস্সিন ফার্জি মিনাল্ ফাওয়াহিশি–'

আল্লাহ্তায়ালা তার দোয়াকে কবুল করে নেন।

বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহিমের পর যেন এই দোয়া করে–'আউজুবিকা মিন হামাজাতিশ শায়াতিন অ–আউজুবিকা রাব্বি আইয়্যাহ্দুরুন–হে আল্লাহ্, পানাহ দাও শয়তানের কুমন্ত্রণা ও ওস্ওয়াসা থেকে। দুই হাত ধোয়ার সময় এই দোয়া করবে– 'আল্লাহুম্মা ইন্নি আস্আলুকাল ইয়ুম্না অল বারাকাতা অ–আউজুবিকা মিনাশ্ শুমি অল্ হালাকাতি–'

কুলি করার সময় এই দোয়া পড়বে–'আল্লাহুম্মা আইন্নি আলা তিলাওয়াতিল কুরআনি অ–কিতাবিকা অ–কাসরাতিজ্জিক্রি লাকা–

নাকে পানি দেবার সময় এই দোয়া–'আল্লাহুম্মা আরিহ্নি রাইহাতাল্ জান্নাতি অ–আন্তা আলাইয়া রাদিন–'

নাক থেকে পানি ঝেড়ে ফেলার সময় এই দোয়া–'আল্লাহুম্মা ইন্নি আ'উযু মিন রাওয়াইহিন্নারি মিন শুয়িদ্ দার–'

মুখ ধোয়ার সময় এই দোয়া–আল্লাহুম্মা বাইয়িদ অজ্হি ইয়াওমাহ্ বাইয়াদ্দু অজুহ আওলিয়ায়িকা অলা তুশাব্বিদু অজহি ইয়াওমা তাশাও ওয়াদু অজুহ আ'দায়িকা–'

ডান হাত ধোয়ার সময় এই দোয়া– আল্লাহুম্মা আতিনি কিতাবান বি ইয়ামিনি অহাশিক্নি হিসাবাঁয় ইয়াশিরা–'

বাম হাত ধোয়ার সময় এই দোয়া– 'আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা আনতু' তিয়ানি কিতাবি বিশিমালি আও মিন অরাঈ জাহ্রি–'

মাথা মুসেহ করার সময় এই দোয়া–'আল্লাহুম্মা গাশ্শিনি বিরাহ্মাতিকা অ–আন্জিল মিন্ বারাকাতিকা অ–আজিল্লিনি তাহ্তা জিল্লি আ'রশিকা ইয়াওমা লা' জিল্লা ইল্লা জিল্লুকা–'

কান মুসেহ করার সময় এই দোয়া–'আল্লাহুম্মাজ্আলনী মিনাল্লাজিনা ইয়াশ্তামিউনাল ক্বাওলা ফাইয়াত্তাবিউনা আহ্সানাহু০আল্লাহুম্মা মুনাদাল জান্নাতি মাআল আব্রার০'

ঘাড় মুসেহ করার সময় এই দোয়া– 'আল্লাহুম্মা ফাক্কি রাকাবাতি মিনান্নারি অ–আউজুবিকা মিনাশ্ সালাসিলি অল্ আগ্লাল–'

ডান পা ধোয়ার সময় এই দোয়া–'আল্লাহুম্মা সাব্বিত কাদামি আলাস্ সিরাতি মাআ আক্বদামিল মুমিন–'

বাঁ পা ধোয়ার সময় এই দোয়া–'আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা আন্ তাজাল্লা কাদামতি মিন সিরাতি ইয়াওমা তাজিল্লা আক্বদামুল মুনাফিকিন–'

অজু শেষে এই দোয়া– 'আশ্হাদু আল্ লাইলাহা ইল্লাল্লাহু অহ্দাহু লা শারিকালাহু অ–আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদান আ'বদুহু অ–রাসূলুহু; সুবহানাকা অবিহামদিকা লাইলাহা ইল্লা আন্তা–আ'মিলতু শুআন অ–জালামতু নাফ্সি আস্তাগফিরুকা অ আস্ আলুকাত্ তাওবাতা ফাগ্ফিরলি অতুব আ'লাইয়া ইন্নাকা আনতাত্ তাওয়াবুর রাহিম ০ আল্লাহুম্মাজ আল্নি মিনাত্ তাওয়াবিনা অজআল্নি মিনাল মুতাতাহ্যিরিনা অজ্আল্নি সুবুরাও অশুকুরাঁও অজ্আল্নি আন্ আজ্কুরাকা অউশাব্বিহ্কা বুকরাতাঁও অআসিলা–'

এভাবে আরও দু'য়া রয়েছে। অজুর সময় যে ক'টি দোয়া করা হয় সবই আল্লাহ্তায়ালা কবুল করে নেন। এরপর মুসুল্লি মসজিদের দিকে এগিয়ে আসে। তার প্রতিটি পা রাখায় একটি করে গুনাহ্ মাফ হয়ে যায় একটি করে নেকী লেখা হয়। যখন সে মসজিদের দরজায় ডান পা রাখে আর বলে–'আল্লাহুম্মাফ্ তাহ্লী আব্ওয়াবা রাহ্মাতিক'–'হে আল্লাহ্ তুমি আমার জন্য তোমার রহমতের দরজাগুলো খুলে দাও–'আল্লাহ্ তায়ালা তার জন্য রহমতের সবকটা দরজা খুলে দেন। রহমত তাকে ঘিরে নেয়। সে নামাজের জন্য অপেক্ষা করে আল্লাহ্ তায়ালা তাকে নামাজেরই সাওয়াব দিতে থাকেন।

ইমাম সাহেব নামাজ শুরু করেন, মুসুল্লি তার সাথে তাকবীর বলেন। ইমাম সাহেবের সানা তাআউজ, তাহমীদ শেষ হবার আগেই তার সানা, তাআউজ, তাহমীদ শেষ হয়েছে। সে তাকবীরে উলা পেল। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'মান সাল্লা লিল্লাহি আরবাঈনা ইয়াওমান ফি জামাআতিন ইয়ুদরিকুত্ তাকবীরাল উলা কুত্তিবা লাহু বারাআতানি বারাআতুম্ মিনান্ নারি অ–বারাআতুম মিনান্ নিফাক–যে লোক আল্লাহ্র জন্য প্রথম তাকবীরের সাথে চল্লিশ দিন নামাজ পড়বে তাকে দুটো পুরস্কার দেয়া হয়। একটা দোজখ থেকে মুক্তি আর মুনাফিকী থেকে নিষ্কৃতি।

নামাজের প্রথম তাকবীর যে পাবেন সে যেন দুনিয়া ও তার মাঝে যা কিছু তার চেয়ে উত্তম জিনিস পেল। সব বস্তুর শিকড় থাকে। ঈমানের শিকড় হচ্ছে নামাজ। নামাজের শিকড় হচ্ছে তাকবীরে উলা বা প্রথম তাকবীর। নামাজী যখন 'আল্লাহু আকবার' তাকবীর বলে তা আকাশ ও ভূপৃষ্ঠের প্রতিটি সৃষ্টিকে খুশি করে দেয়। যে প্রথম তাকবির পেল সে যেন আল্লাহ্র পথে এক হাজার উট সদকা করে দিল।

বান্দা যখন নামাজে দাঁড়িয়ে যায় তখন তার ওপর নেকীর বৃষ্টি ঝরে পড়ে। আসমানের সব দরজা খুলে দেয়া হয়। আল্লাহ্তালা ও তাঁর বান্দার মাঝে রয়েছে সত্তর হাজার রহস্যময় রুহানী পর্দা। সব একে একে খুলে যায়। দীর্ঘক্ষণ নামাজে দাঁড়িয়ে থাকার অভ্যাস করলে ওই বান্দার মৃত্যুকষ্ট দূর হয়ে যায়। পুলসিরাত পার হওয়া সহজ হয়।

বান্দা যখন সুরা ফাতিহায় শরীক থাকে সে যেন যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে। কাফিরের সাথে। যেন সে শুরু থেকে অংশ নিয়ে যুদ্ধ করছে শেষ পর্যন্ত। অবশেষে জয় করেছে কাফিরদের দেশ। সে যেন কিতালের মাঠে শত্রুর কাছে আঘাত পাচ্ছে, শত্রুকে যেন সে আঘাত করছে–এমন সাওয়াব অর্জন করছে। আর যে বান্দা সুরা ফাতিহার শেষ ভাগে ইমামের সাথে অংশ নেয় সে যেন কোনও কাফিরের দেশ জয় করার পর গণীমতের মালের ভাগ পাচ্ছে।

বান্দা তার শরীরের ওজন সমান নেকী পায় যখন সে রুকুতে। রুকুর তাসবীহ্ আদায় করছে যখন সে যেন তাওরাত, যবুর, ইঞ্জিল ও কোরআন তিলাওয়াত করে খতম দিয়েছে। সে যখন রুকু থেকে ওঠে, দোয়া পড়ে, আল্লাহ্ তায়ালা তাকে বিশেষ দয়ার দৃষ্টিতে দেখেন। যখন সে সিজদায় যায় তখন সে আল্লাহ্তায়ালার সবচেয়ে বেশি নৈকট্য হাসিল করে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ঐ সময় তোমরা বেশি দোয়া করো। 'সিজ্দাতুন অহিদাতুন খায়ুরুম মিনাদ্ দুনিয়া অমা ফিহা' একটি সিজদা আসমান ও জমিনের মধ্যে যা কিছু আছে তার চেয়ে উত্তম। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তোমরা যদি জান্নাতে আমার সাথে থাকতে চাও, তাহলে বেশি করে সিজদা করো।' সিজদায় পড়ে থাকা আর আল্লাহর সামনে জমিনে কপাল রাখা আল্লাহ্র কাছে সবচেয়ে প্রিয়। নামাজী যখন সিজদা করে তখন সে সমস্ত জ্বিন ও মানব সন্তানের সমপরিমাণ সাওয়াব পায়। আর একবার সিজদার তাসবীহ পড়লে একটা গোলাম মুক্ত করে দেয়ার সাওয়াব পায়। মা'সান ইবনে তালহা (রাঃ) বলেন, আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ক্রীতদাস হযরত সওবানের সাথে দেখা করলাম। বললাম, আমাকে এমন একটা আমলের কথা বলে দেন যা আমাকে সহজে বেহেশতে প্রবেশ করতে সাহায্য করে। তিনি চুপ। আমি আবার শুধালাম। তিনি চুপ। আমি আবার প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন, 'আল্লাহ্র উদ্দেশে বেশি করে সিজদা করো। একটা সিজদা তোমাকে জান্নাতে একটি করে মর্যাদায় উন্নীত করবে, একটি করে গুনাহ মাফ করে দিবে।'

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আত্তাহিয়্যাতুর মধ্যে আঙুলের ইশারা শয়তানের জন্য তার ওপর তলোয়ার,বর্শা মারার চেয়ে মারাত্মক!'

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে আমার উপর দরুদ পড়বে এবং বলবে, 'আল্লাহুম্মা সাল্লিআলা মুহাম্মাদিউ অনাজ্জিল্‌হুল্‌ মাক্‌আদিল্‌ মুকার্‌রার্‌ ইনদিকা ইয়াওমিল ক্বিয়ামাতি।'

–হে আল্লাহ্‌, তুমি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর দয়া করো, তাঁকে ক্বিয়ামতের দিন তোমার কাছের আসন দান করো- তার জন্য সুপারিশ করা আমার ওপর ওয়াজিব।

মুসুল্লী যখন আত্তাহিয়্যাতুতে বসে তখন সে তিনজন মহান নবী, হযরত আইউব, হযরত ইয়াকুব ও হযরত ইয়াহিয়া (আঃ) এর ধৈর্যের সাওয়াব পায়।

'আল্লাহু ইয়াখ্‌তাসু বিরাহ্‌মাতিহী মাই ইয়াশাউ আল্লাহু জুল ফাদ্‌লিল আজীম'- আল্লাহ্‌তায়ালা যাকে ইচ্ছা দান করেন তাঁর বিশেষ দয়া; তিনি দয়ালু, যত খুশি তিনি তা দান করেন।

মুসুল্লী যখন নামাজ শেষ করে সালাম ফেরায় তখন আল্লাহ্‌তায়ালা বেহেশতের আটটা দরজা খুলে দেন। আর বলেন, 'বান্দা, তুমি যে কোনও দরজা দিয়ে ইচ্ছা বেহেশতে প্রবেশ করো।'

তো আমার ভাই, আল্লাহ্‌তালা এমন মহান আমল করার তাওফিক আমাদেরকে দিয়েছেন। তার পর এমন এক মূল্যবান মজলিশ বা সমাবেশে বসার তাওফিক দিয়েছেন যে, কেউ যদি এমন মজলিশে এক সা'আ বা চব্বিশ থেকে পঁচিশ মিনিট সময় বসে তাহলে আল্লাহ্‌তালা তাকে ষাট থেকে সত্তর বছর বে-রিয়া, কবুল ইবাদাতের সাওয়াব দান করেন। বে-রিয়া ইবাদত মানে হচ্ছে এমন ইবাদত যা অন্য কাউকে দেখানোর ইচ্ছা পোষণ করা হয়নি। কথিত আছে, ঈসা (আঃ) এর জামানায় একজন রাহেব (সন্ন্যাসী) জঙ্গলের এক গুহায় আল্লাহ্‌তালার উপাসনার জন্যে বসে যায়। নির্জনতার ভিতর সময় চলে ইবাদাত ও বন্দেগীতে। এই জগতের মানুষের থেকে ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন তিনি। এক সময় ভুলেও গেলেন এই পৃথিবীর কথা। নির্জন গুহার চারপাশ ঘিরে জমে উঠলো লতাগুল্ম, গাছপালা। তের বছর পর। একদিন। এক কাক হঠাৎ পথ ভুলে ঢুকে পড়লো এই গুহায়। ঢুকে পড়েছে ঠিকই কিন্তু বেরুনোর পথ খুঁজে পাচ্ছেনা। তার কা কা রব বেড়েই চললো। কাকের তারস্বরে চিৎকারে ধ্যান ভেঙে গেল রাহেবের। দীর্ঘ তেরো বছর মুহূর্তের জন্যেও আল্লাহ্‌র থেকে আলাদা হয়নি। আজ কাক তার সর্বনাশ করে দিল। আল্লাহ্‌ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দিশাহারা হয়ে পড়লেন। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলেন কাকটিকে। সব রাগ গিয়ে পড়লো কাকের উপর। বিরক্তিভরে তাকালেন কাকের দিকে। পর মুহূর্তেই জমে গেলেন পাথরের মতো। কাকের শরীরে ধরে গেছে আগুন! ঝলসে গেছে সে! কালো পোড়া কয়লার মতো কাকের দেহ কোলে এসে পড়লো রাহেবের। দিশাহারা হয়ে পড়লো সে ভয়ে ও দুঃশিন্তায়। তবে কি আমার কোন পাপ হয়ে গেল? নারাজ হয়ে গেলেন আল্লাহ্‌তায়ালা? তিনি চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন, 'হে আল্লাহ্‌, একী হলো! তুমি কি আমার ওপর অখুশি হয়ে গেলে? নইলে নিরীহ কাক মারা পড়লো কেন?'

সমস্ত অলি ও বুজুর্গ সন্ত্রস্ত ও তটস্থ থাকেন আল্লাহ্‌র ভয়ে। সদাসর্বদা। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএর সাথে হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) এর ছিল গভীর সম্পর্ক। অন্যান্য সাহাবা (রাঃ) তাঁকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আত্মীয় বলে মনে করতেন। কারণ তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সার্বক্ষণিক খেদমতগার ছিলেন। তাঁর মামা ও তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাসায় আত্মীয়ের মতোই অবাধে যাতায়াত করিতেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সম্পর্কে বলেন, 'কেউ যদি কোরান পাক যেভাবে অবতীর্ণ হয়েছে সেভাবে পড়তে চায় সে যেন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) কে অনুসরণ করে। তিনি আরও বলেন, ইবনে মাসউদ (রাঃ) যা বলবে তা তোমরা সত্য মনে করবে। আবু ওমর শায়বানী (রাঃ) বলেন, হুজুর

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে এত বড় সম্পর্ক থাকার পরও তিনি কখনো এমন বলেন নি যে, "নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন"। যদি কখনো তা বলে ফেলতেন তাহলে তাঁর দেহে কাঁপুনি এসে যেত। আমর বিন মায়মুন (রাঃ) বলেন, 'এক বছরের মাঝে একবার তিনি বলে ফেলেছিলেন, 'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন।' কিন্তু বলার সাথে সাথে তাঁর দেহ কেঁপে উঠলো। চোখ পানিতে ভরে গেল। কপালে দেখা দিল ঘাম।

দিল্লীর একজন আলিম ও বুজুর্গ তার মাদ্রাসায় বসে দরস্ দিচ্ছেন হাদিসের। এমন সময় দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকে পড়লেন এক শীর্ণকায় লোক। গায়ে চাদর। খুব দ্রুত পা ফেলে তিনি এগিয়ে এলেন বুজুর্গের কাছে। হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন। বুজুর্গের কানের কাছে নিয়ে গেলেন মুখ। কী যেন বললেন। ছাত্ররা অবাক হয়ে দেখলো তাঁদের ওস্তাদের নূরানী চেহারা কালো হয়ে গেল। দেহ হয়ে গেল নিথর। মৃদু কাঁপুনিও দেখা দিল তাঁর শরীরে। শীর্ণকায় লোকটা তাঁর চাদর পরিয়ে দিলেন ওই আলিমকে। নিজে লম্বা হয়ে শুয়ে মাথা রাখলেন বুজুর্গের কোলে। দর দর করে ঘামছেন ওস্তাদ। কথা নেই। ছাত্ররা অবাক হয়ে দেখছে। বোঝা যায় তাদের ওস্তাদ কী এক অজানা ভয়ে প্রকম্পিত। যেন বজ্রপাত হয়েছে তাঁর উপর। কিছু সময় পর সেই শীর্ণকায় ব্যক্তি মাথা উঠালেন। পরে নিলেন চাদর। কাউকে কিছু না বলে বের হয়ে গেলেন দমকা বাতাসের মতো। যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো আলিমের। দীর্ঘশ্বাস ফেললেন খানিকক্ষণ। তারপর আচমকাই বেহুঁশ হয়ে গেলেন। যখন হুঁশ ফিরলো তাঁর ছাত্ররা হুমড়ি খেয়ে পড়লো তাঁর উপর। প্রচন্ড কৌতূহলে। 'হুজুর, ব্যাপারটা কি? ঐ বৃদ্ধ লোকটি কে? কেন এসেছিল? কী দরকার? চাদর কেন পরালো? কানে কানে কী বলেছিল? আপনার কোলে মাথা রেখে ঘুমালো কেন? আপনি জ্ঞান হারালেন কেন?' এক ঝাঁক প্রশ্ন করে বসলো ছাত্ররা তাদের কৌতূহল দমাতে না পেরে।

তিনি বললেন, ওই শীর্ণ-দীর্ণ মানুষটি এই শহরের কুতুব। মানুষের দায়িত্ব (রুহানী) পালন করতে গিয়ে অনেকদিন পর্যন্ত ঘুমাতে পারেন নি তিনি। কারণ তাঁর ভয় তিনি ঘুমিয়ে পড়লেই অসংখ্য মানুষের ক্ষতি হয়ে যাবে। কিন্তু বড়ই ঘুম পেয়েছে তাঁর। কিন্তু কে তাঁর দায়িত্ব নেবে? তো গোটা শহর খুঁজে আমাকে পেল। ঐ দায়িত্বের কথা আমার কানে শোনাতেই আল্লাহ্‌র ভয়ে আমি কাঁপতে লাগলাম। কাল ঘাম দেখা দিল। চাদরটা পরিয়ে দিতেই মনে হলো সাত আসমান ভেঙে পড়লো আমার ওপর। তিনি চলে যেতেই আমি ভয়ে জ্ঞান হারালাম।

তো ভাই ওই যুবক রাহেব আল্লাহ্‌র ভয়ে দিশাহারা হয়ে গেল। আল্লাহ্ অদৃশ্য থেকে বললেন, 'হে রাহেব, তুমি ভয় পেওনা। আমি তোমার প্রতি খুশি।'

'হে আল্লাহ্, পাখি পুড়ে মরলো কেন?' রাহেব ভয়ার্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো।

'তুমি যে তেরো বছর ধরে আমাকে ডেকে চলেছ, আজ আর তুমি তোমার নাই। তোমার দেখা আমারই দেখা। তুমি বিরক্তির নজরে কাককে দেখোনি-আমি দেখেছি। আমার গায়রাত বা প্রতাপ ছোট্ট কাক সহ্য করতে পারে নি। আগুন ধরে ঝলসে গেছে।'

তেরো বছর বে-রিয়া ইবাদত করে এতো নৈকট্য অর্জন করেছিলেন রাহেব। সত্তর বছর কবুল ইবাদত আমাদের কোথায় পৌঁছে দেবে ভাই!

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আল্লাহু লা'ইয়াকউ'দু কাওমুই ইয়াযকুরুনাল্লাহা ইল্লা হাফ্‌ফাত্‌হুমুল মালাইকাতু অ-গাশিয়াত্ হুমুর রাহমাতু, অনাজালাত আ'লাইহিমুস্ শাকিনাতু অযাকারাহুমুল্লাহ ফিমান ইন্‌দাহু- যে জামাত আল্লাহ্‌র স্মরণ করে, চারদিকে ফিরিশতা তাদের ঘিরে নেয়; আল্লাহ্‌র রহমত তাদের ঢেকে ফেলে তাদের উপর সকিনা নাজিল হয়। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন নিজ মজলিশে তাদের আলোচনা করেন গর্ব ভরে।

তো আমার বুজুর্গ আর দোস্তো, এমন মূল্যবান মজলিশে আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদের বসার তাওফিক দিয়েছেন। মজলিশের চারদিকে ফিরিশতা নাজেল হয়েছে। তাদের একদল দোয়া করছে 'আল্লাহুম্মাগ্‌ফিরহুম'। আরেক দল দোয়া করছে 'আল্লাহুম্মার হাম্‌হুম্'। মানে 'হে

আল্লাহ্ তুমি এদের পাপরাশিকে ক্ষমা করো' 'হে আল্লাহ্, তুমি এদের উপর রহমত নাজিল করো। আল্লাহ্তায়ালা দুই দল ফিরিশতার দোয়াকে কবুল করে নেন। কারণ তারা নিষ্পাপ। এ সময় আকাশ থেকে আওয়াজ আসে, হে অমুকের পুত্র অমুক, আল্লাহ্ তায়ালা তোমার গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, তোমার গুনাহকে বদলে দিয়েছেন পূণ্য দিয়ে। হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'মা মি কাওমিন ইজতামাউ ইয়াজ্কুরুনাল্লাহা লা ইউরিদুনা বিখালিকা ইল্লা অজ্হাহু ইল্লা নাদাহুম মুনাদিম্ মিনাস্ সামায়ি আন কুমু মাগ্ফুরাল্লাকুম ক্বাদ্ বাদ্দান্তু শাইয়্যিআতিকুম হাসানাতিন' 'যারা আল্লাহ্র স্মরণের জন্য জমায়েত হয় আর তাদের উদ্দেশ্য একমাত্র আল্লাহ্ পাককে রাজী করা, তখন আসমান থেকে একজন ফিরিশতা ঘোষণা করে, তোমাদের ক্ষমা করা হয়েছে আর তোমাদের গুনাহকে বদলে দেয়া হয়েছে নেকী দিয়ে। কালামে পাকেও আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, 'ফাউলাইকা ইয়ুবাদ্দিলুল্লাহু শাইয়্যিআতিহিম হাসানাতিন অকানাল্লাহু গাফুরুর রাহিমা'– 'কাজেই ওদের পাপগুলোকে পূণ্যে বদলে দিলেন আল্লাহ্তায়ালা। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু।'

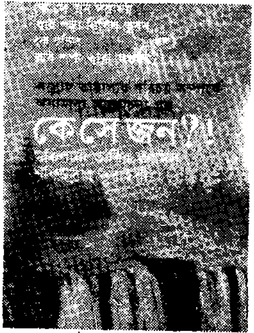

দুই

হযরত ইবনে আনাস (রাঃ) বলেন, একদিন জিব্রাইল (আঃ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এলেন। সেদিন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব মন খারাপ করেছিলেন। জিব্রাইল (আঃ) বললেন, 'আল্লাহতায়ালা আপনাকে সালাম পাঠিয়েছেন। আর জিজ্ঞেস করেছেন আপনার কি কষ্ট?' হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ভাই জিব্রাইল (আঃ)। রোজ হাশরের দিন আমার উম্মতের কি হবে এই চিন্তায় অস্থির আছি। জিব্রাইল (আঃ) বনি সালমা গোত্রের একটা কবরস্থানে নিয়ে এলেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে। একটা কবরে পাখা দিয়ে আঘাত করে বললেন, 'কুম্ বিইজ্নিল্লাহ'– আল্লাহ্র আদেশে উঠো। সাথে সাথে দাঁড়িয়ে গেল একজন সুদর্শন লোক। তার মুখে উচ্চারিত হলো–'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্, আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।'

'নিজের জায়গায় চলে যাও', আবার আদেশ করলেন জিব্রাইল (আঃ)। 'হে আল্লাহ্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম,' জিব্রাইল (আঃ) বললেন, 'যে ভাবে যার মৃত্যু হবে ঠিক তেমনি সে কেয়ামতের দিন উঠবে।'

ভাই, আমরা জানিনা কবে আমরা মরবো। কিভাবে মরবো। মৃত্যুর সময় কি কালিমা আমরা পড়তে পারবো?

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, 'আলাম্ তারা কায়ফা দারাবাল্লাহু মাসালান কালিমাতান্ তাইয়্যিবাতান কাশাজারাতিন তাইয়্যিবাতিন আস্লুহা সাবিতিউ অ ফারউহা ফিস্ সামায়ি। তুতি উকুলাহা কুল্লা হিনুম্ বিইজ্নি রাব্বিহি। অইয়াদ রিবুল্লাহুল আমসালা লিন্নাসি লাআল্লাহুম ইয়াতাজাক্কারুন। অমাসালু কালিমাতিন খাবিসাতিন কাশাজারাতিন খাবিসাতিন নিজ্তুস্সাত মিন ফাওক্বিল আরদি মালাহা মিন ক্বারার।'

'আপনি কি জানেন না যে, আল্লাহ্ পাক কী সুন্দর উপমা দিয়েছেন? কালিমা তাইয়্যিবা যেন একটি পবিত্র বৃক্ষ, যার শিকড় জমিনের ভেতর আর তার শাখা-প্রশাখা উঠে গেছে আকাশের ওপর। আপন প্রভুর আদশে সে ফল দিচ্ছে প্রতি পলকে। আল্লাহ্ তায়ালা উপমা এজন্যে দিচ্ছেন যেন মানুষ বুঝতে পারে। আর খবীস কালিমা বা কালিমায়ি কুফরের উপমা একটি বিষবৃক্ষ যাকে উপড়ে ফেলা হয়েছে। জমিনের উপর। আর জমিনের মাঝে তার কোনও স্থায়িত্বও নেই।'

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, কালিমায়ি তাইয়্যিবার মানে কালিমায়ি শাহাদাত আশ্হাদু আল্লাইলাহা ইল্লাল্লাহ। যার শিকড় মুমিনের মনে। আর তার শাখা-প্রশাখা আকাশ পর্যন্ত। যার জন্য মুমিনের আমল আকাশ পর্যন্ত পৌছে যায়। কালিমায়ি কুফর বা খাবীসা হচ্ছে শিরক্। যা বিষবৃক্ষের মতো। সব গুনাহ তার থেকে সৃষ্টি হয়।

তো কালিমার হাক্বীকাত আমাদের আমলকে পৌছে দেয় আকাশ পর্যন্ত। হাক্বীকাত কি? কালিমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসুল্লাহ। মাত্র চব্বিশটি অক্ষরের ও সাতটি মিলিত শব্দের তৈরি এ কালিমাটি ব্যাপক অর্থবোধক ও তাৎপর্যপূর্ণ। এই কালিমার ব্যাখ্যার মাঝে রয়েছে এই পৃথিবীর সব সমস্যার সমাধান। এ কালিমার যাত্রা শুরু হলো মানবমনের সবচেয়ে জরুরী প্রশ্নের উত্তরের মাধ্যমে। তা হচ্ছে-

প্রভুত্ব কার?

মানুষের না আল্লাহ্র?

এটা এমনই এক প্রশ্ন যার সাথে ভাষা, জন্মসূত্র, ধর্ম, গোত্র, বর্ণ, দেশ ও কাল এর কোনটারই সম্পর্ক ছিল না; এ সম্পর্ক ছিল ইনসানিয়াত বা মানবতার। এই কালিমার চারটা অংশ, চারটি গভীর জ্ঞান আর চারটা চাওয়া।

লা ইলাহা-নাই কোনও উপাস্য।

তার মানে গোটা জগতে যা কিছু সৃষ্ট বস্তু তার সবরকম ক্ষমতাকে অস্বীকার করা। সৃষ্ট বস্তুর থেকে কিছু হওয়া দেখা, বোঝা-সবই ভুল। ধোঁকা। এটি হচ্ছে একটি অংশ, একটি গভীর জ্ঞান। আর এর চাওয়া হচ্ছে, যেহেতু সৃষ্ট বস্তু কিছুই করতে পারে না। তাই আমি সৃষ্টির উপাসনা করবো না। তার প্রশংসা করবো না। তার থেকে কিছু হয় বিশ্বাস করবো না। তার প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা রাখবো না। নত হবো না কখনও। সৃষ্টির কারণে আল্লাহ্র অবাধ্য হবো না। আমি সৃষ্টি বস্তুর বাঁধন থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন, মুক্ত। আমি না আমেরিকার, না রাশিয়ার, না ইউরোপ বা চীন ও জাপানের। আমি আমার অফিসারের নই, এই এলাকার কমিশনারের নই, নই কোনও ক্ষমতাধর ব্যবসায়ীর। আমি স্বাধীন।

আল্লাহ্তালার এই উলুহিয়াত বা প্রভুত্ব সম্পর্কে কালামে পাকের পাতায় পাতায় রয়েছে বর্ণনা। 'ইলাহ' শব্দটি, এসেছে কমপক্ষে আশি বার। 'ইলাহান' এসেছে ১৬ বার। 'ইলাহাকা' ২ বার। 'ইলাহাকুম' ১০ বার। 'ইলাহুনা' ১ বার। 'ইলাহাতুন' ২ বার। 'ইলাহাতিন' ১৮ বার। 'ইলাহাতিকা' ' ১বার। 'ইলাহাতিকুম' ৪ বার। 'ইলাহাতিনা' ৮ বার। 'ইলাহাতুকুম' ২ বার। 'ইলাহাতি' ১ বার। প্রায় ১৪৪ বার।

আল্লাহ্তায়ালা বলেন, 'ইজক্বালা লিবানিহি মা' তা'বুদুনা মিম বা'দি। ক্বালু না'বুদা ইলাহাকা অইলাহা আবাইকা ইব্রাহিমা অ-ইসমাইলা অ-ইসহাকা ইলাহাও অহিদা০-যখন তিনি নিজ ছেলেদের বললেন, তোমরা আমার পর কীসের ইবাদত করবে? তারা বলল, 'আমরা তাঁরই ইবাদাত করবো আপনি ও আপনার পূর্ব পুরুষ ইব্রাহিম, ঈসমাইল ও ইসহাক যাঁর উপাসনা করেছেন। এই আলোচনা করেছেন সুরা বাকারার ১৩৩ নয় আয়াতে। এই একই সুরার ১৬২ নয় আয়াতে বলেনঃ 'অইলাহুকুম ইলাহুউ অহিদ০ লাইলাহা ইল্লা হুয়ার রাহমানুর রাহিম'-'আর তিনিই তোমাদের উপাস্য যিনি একমাত্র মা'বুদ তিনি ছাড়া অন্য কেউ উপাস্য নেই; তিনি পরম দয়ালু ও করুণাময়।' একই সুরার ১৬৩ নং আয়াতে বলেন, 'ইন্না ফি খালকিস্ সামাওয়াতি অল আরদি অখ্তিলাফিল্ লাইলি অন্ নাহারি অল ফুলকিল্ লাতি ফিল বাহ্রি বিমা ইয়ানফাউন্নাসা অমা আনজালাল্লাহু মিনাস্ সামায়ি মিম্ মায়িন০ ফা আহইয়া বিহিল্ আর্দা বা'দা মাওতিহা মিন কুল্লি দাব্বা'-'নিশ্চয়ই

আসমানসমূহ আর জমিন, দিন ও রাতের আসা–যাওয়া, জাহাজ, সাগরে যা চলছে মানুষের জন্য লাভজনক সামগ্রী নিয়ে, আর পানি যা আল্লাহ্তালা আকাশ থেকে বর্ষণ করেন, তারপর সরস ও সতেজ করেন মাটিকে; সব ধরনের প্রাণীকুল ছড়িয়ে দিয়েছেন সেই জমিনে। বায়ুর পরিবর্তন আর মেঘের মাঝে যা, আকাশ ও মাটির মাঝামাঝি বন্দী থাকে –এসব তার সৃষ্টির প্রমাণ, যা জানে শুধু জ্ঞানীরা'। সুরা আল ইমরানের ২ আয়াতে বলছেন, 'আল্লাহু লা–ইলাহা হুয়াল হাইউল কাইয়ুম' –আল্লাহ্ এমন যে তিনি ছাড়া উপাস্য হিসেবে আর কেউ নেই।' একই সুরার ৫ আয়াতে, 'ইন্নাল্লাহা লা ইয়াখ্ফা আলাইহি শাইয়ুন ফিল্ আরদি অলা ফিস্ সামায়ি' –'নিশ্চয়ই আল্লাহ্র কাছে এমন কোন বিষয় গোপন নেই যা মাটি ও আকাশে রয়েছে'। একই সূরার ৬ আয়াতে,'হুআল্লাজি ইউসাব্বিরুকুম ফিল আরহামি কায়ফা ইয়াশাউ। লাইলাহা ইল্লা হুয়াল আজিজুল হাকিম' –'তিনি এমন সত্তা যিনি জরায়ুর মাঝে আকার দেন তোমাদের; তিনি ছাড়া কেউ উপাস্য নেই; তিনি পরাক্রমশালী ও তত্ত্বজ্ঞ। একই সুরার ১৭ আয়াত, 'শাহিদাল্লাহু আল্লাহু লাইলাহা ইল্লা হুয়া অল্ মালাইকাতু লা–উলুল ইল্মি ক্বারিমান বিল্ কিশ্তী' –'সাক্ষ্য দিয়েছে ফিরিশতা ও জ্ঞানীরা যে, আল্লাহ্তায়ালা ছাড়া আর কেউ উপাস্য নেই; তিনি ন্যায়ের সাথে শৃঙ্খলা রক্ষাকারী।' পরের আয়াতে আল্লাহ্ পাক বলেন, 'লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল আজিজুল হাকিম' –'তিনি ছাড়া কেউ উপাস্য নেই, তিনি পরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী। ৬২ আয়াতে কারীমাতে বলেন, 'অমা মিন ইলাহিন ইল্লাল্লাহু, অইল্লাল্লাহা লা হুয়াল আজিজুল হাকিম' –'আর কেউ উপাস্য নেই আল্লহ ছাড়া। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রবল পরাক্রান্ত ও মহাজ্ঞানী'। সুরা 'নিসা'র–৮৭ আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, 'আল্লাহ্ লা–ইলাহা ইল্লা হুয়া লা ইয়াজ্মাআন্নাকুম ইলা ইয়াওমিল ক্বিয়ামাতি লারায়বা ফিহি০ অমান আস্দাকু মিনাল্লাহি হাদিসনা০– 'আল্লাহ্ এমন যে, তিনি ছাড়া কেউ উপাস্য হবার যোগ্য নয়, তিনি নিশ্চয়ই কায়েম করবেন কিয়ামতের দিন; যাতে কোনও সন্দেহ নেই। আল্লাহ্তায়ালার চেয়ে বেশি সত্য আর কার কথা হবে?' একই সুরার ১১৭ আয়াতে আল্লাহ্তায়ালা বলেন, 'অলা তা'কুলু সালাসাতুন ইন্তাহু খায়রাল্লাকুম০ইন্নামাল্লাহু ইলাহুউ অহিদ০সুবহানাহু ইয়্যাকুল্ লাহু অলাদ০– 'আর বলো না যে, আল্লাহ্ তিন; নিবৃত্ত হও! তোমাদের জন্য তা মঙ্গলজনক; প্রকৃত উপাস্য এক আল্লাহ্; তিনি সন্তানের পিতা হওয়া থেকে অতিশয় পবিত্র।' সুরা 'আনআম' এর ৪৬ আয়াতে আল্লাহ্তায়ালা বলেন,'ক্বোল আরাআয়তুম ইন্ আখাজাল্লাহু শাম্আ'কুম অ–আব্সারাকুম অ–খাতামা আলা কুলুবিকুম মান্ ইলাহুন গায়রুল্লাহি ইয়াতি কুম্বিহি' –'আপনি বলুন, আচ্ছা বলো তো যদি আল্লাহ্ তোমাদের শোনার ও দেখার শক্তি কেড়ে নেন আর তোমাদের অন্তরসমূহের উপর যদি মেরে দেন মোহর। তখন আল্লাহ্ ছাড়া আর কে আছে তা তোমাদের ফিরিয়ে দেন'? একই সুরার ১০৯, ১০২ ও ১০৬ আয়াতে আল্লাহ্তায়ালা তাঁর উলুহিয়াত সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। সুরা 'আলআরাফ' এর ৫৯ আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, 'লাকাদ্ আরসাল্না নুহান্ ইলা কাওমিহি ফাক্বালা ইয়া কাওমিবুদুল্লাহা মালাকুম মিন্ ইলাহিন্ গায়রুহু' –আমি নুহকে তার সম্প্রদায়ের কাছে পাঠালাম। তিনি তাদেরকে বললেন, 'হে আমার জাতি তোমরা শুধু আল্লাহ্র ইবাদত করো। তিনি ছাড়া তোমাদের কোনও উপাস্য নাই'। একই সুরার ৬৫ আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, 'অইলা আদিন আখাহুম হুদা০ক্বালা ইয়া কাওমিবুদুল্লাহা মালাকুম মিন ইলাহিন গায়রুহু' –আমি আদ জাতির কাছে পাঠালাম তাদের ভাই হুদকে সে বলল, হে আমার জাতি তোমরা আল্লাহ্তালার ইবাদাত করো তিনি ছাড়া কেউ উপাস্য নাই।' এভাবে ৭৩, ৮৫ আয়াতে আলোচনা হয়েছে আল্লাহ্তায়ালার উলুহিয়াত সম্পর্কে। একই সুরার ১৫৮ আয়াতে আল্লাহ্তায়ালা বলেন, 'ক্বোল ইয়া আইয়্যুহান্নাসু ইন্নি রাসুলুল্লাহ্ ইলায়কুম জামিয়া০লিল্লাহি লাহু মুলকুস্ সামাওয়াতি অল আরদ্০লাইলাহা ইল্লা হুয়া ইয়ুহ্য়ি অইয়ুমিতু' –'আপনি বলে দিন, হে মানব, তোমাদের সবার কাছে আমাকে পাঠিয়েছেন আল্লাহ্র রাসুল হিসাবে সেই আল্লাহ্ যিনি আকাশ ও জমিন সমূহের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখেন; তিনি ছাড়া অন্য কেউ উপাস্য নন; তিনি জীবন ও মৃত্যুর বিধানদাতা। সুরা 'তাওবা'র ৩১ আয়াতে বলেন, 'ইত্তাখাজু আহ্বারাহুম অ–রুহ্বানাহুম আও বাবাম মিন্

দুনিল্লাহি অল্ মাসিহাব্না মারইয়াম অমা উমিরু ইল্লা লি–আ বু'দু ইলাহাঁও অহিদ লাইলাহা ইল্লা হুয়া০ সুবহানাহু আম্মা ইয়ুশরিকুন'০–তারা আল্লাহ্কে ছেড়ে নিজেদের আলেম ও ধর্মযাজকদেরকে প্রভু মেনেছে, আর মরিয়ামের পুত্র মাসীহকেও! অথচ তাদের উপর আদেশ এই যে তারা শুধু আল্লাহ্র ইবাদত করবে। তিনি ছাড়া অন্য কেউ উপাস্য নেই'। এই সুরার ১২৯ আয়াতে আলোচনা হয়েছে আল্লাহ্তায়ালার উলুহিয়াত সম্পর্কে। সুরা 'ইউনুস' এর ৯০ আয়াতে আল্লাহ্তায়ালা বলেন, 'ক্বালা আমান্তু আল্লাহু লাইলাহা ইল্লাল্লাজি আমান্তু বিহি বানু ইস্রায়িলা অমা-আনা মিনাল মুসলিমিন'-তখন সে (ফিরআউন) বলল, আমি ঈমান আনছি যাঁর ওপর ঈমান এনেছে বাণী ঈস্রাফিল; তিনি ছাড়া কেউ উপাস্য নেই; আর আমি মুসলমান হচ্ছি।' সুরা 'হুদ' এর ১৪ আয়াতে বলেন, 'ক্বোল ফাতু বিআশ্রি সুআরিম মিস্লিহি মুক্তারা ইয়াতি অদ'উ মানিশ্তাতাতুম মিন্ দুনিল্লাহি ইন্ কুন্তুম সাদিকিন০ ফাইল্লাম ইয়াশ্ তাজিবুলাকুম ফাআলামু আল্লামা উন্জিলা বিএল্মিল্লাহি অ আল্ লা ইলাহা ইল্লা হুয়া০ ফাহাল আনতুম মুসলিমুন'–'আপনি বলে দিন, তাহলে তোমরা দশটি সুরা আনো আর সাহায্যকারী হিসেবে সৃষ্ট যাকে যাকে নিতে চাও নাও; যদি তোমরাই সত্যবাদী হও। তারপর তারা যদি না পারে তবে তোমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করো, এই কোরআন তিনি আল্লাহ্ নাজিল করেছেন তাঁর ক্ষমতা দিয়ে; আর এটাও জেনো তিনি ছাড়া আর কেউ উপাস্য নেই; এখন তোমরা মুসলমান হবে কি'? ৫০, ৬১ আয়াতেও উলুহিয়াতের আলোচনা এসেছে। সুরা 'রা'দ'–এর ৩০ আয়াত, 'ইব্রাহিম'–এর ৫২, 'আন–নাহাল'–এর ২,২২, সুরা 'আল আম্বিয়া'–এর ২৫, ২৯, আয়াতগুলোতে একই আলোচনা এসেছে। 'আম্বিয়া'–এর ৮৭ আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, 'আযান্নি ইজ্ জাহারা মুগাদিবান ফাজান্না আল্লান নাক্দিরা আলাইহি ফানাদা ফিজ্ জুলুমাতি আল্ লাইলাহা ইল্লা আনতা সুব্হানাকা ইন্নি কুন্তু মিনাজ্ জালিমিন'–'আর আপনি মাছওয়ালার আলোচনা করেন; তিনি যখন (তাঁর জাতির উপর) ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গেলেন, তিনি ধারণা করেছিলেন আমি তাকে ধরবো না, অবশেষে তিনি প্রগাঢ় আঁধারের ভিতর ডাকলেন, আপনি ছাড়া আর কেউ উপাস্য নেই, আপনি পবিত্র, নিশ্চয়ই আমি অপরাধী'। ওই একই সুরার ১০৮ আয়াতে আলোচিত হয়েছে আল্লাহ্তায়ালার উলুহিয়াত। সুরা 'আন–নাহাল'–এর ৫১, 'আল–কাহাফ'–এর ১১০, 'আত–তাহা'র ৮, ১৪, ৯৮ নম্বর আয়াতেও একই আলোচনা হয়েছে। সুরা 'আল–হাজ্জ'–এর ৩৪ আয়াতে আল্লাহ্তায়ালা বলেন, 'অলিকুল্লি উম্মাতিন জাআল্না মান্ শাকাল্ লিয়াজ্ কুরুস্মাল্লাহি আ'লা মা রাজাকাহুম মিম্ বাহিমাতিল আন্আম০ ফা ইলাহুকুম ইলাহুঁউ অহিদুন ফালাহু আস্লিমু০অবাশ্শিরিল মুখবিতিন'–'আমি প্রত্যেক উম্মতের উপর কোরবানী এই উদ্দেশে নির্ধারিত করেছি যে তারা পশুগুলির উপর আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করে–যা তিনি তাদের দান করেছেন; কাজেই তোমাদের উপাস্য এক আল্লাহ্; আর তোমরা তারই অনুগত হও; আর এইসব মাথা নতকারীদের শোনাও সুসংবাদ। 'সুরা মু'মিনুন' এর ২৩ ও ৩২ আয়াতে আলোচিত হয়েছে তাঁর উলুহিয়াত। ৯১ আয়াতে বলেন, 'মাত্তাখাজাল্লাহু মিউ অলাদিউ অমা কানা মাআহু মিন্ ইলাহিন ইজাল্লাজাহাবা কুল্লু ইলাহিম্ বিমা খালাকা অলা আ'লা বা'দুহুম আলা বা'দিন০সুব্হানাল্লাহি আম্মা ইয়াসিফুন'–'আল্লাহ্তায়ালা কাউকে সন্তান নির্ধারণ করেননি; আর না তার সাথে অন্য কেউ উপাস্য আছে; যদি থাকতো তবে তো প্রত্যেকে নিজের সৃষ্টিকে আলাদা করে নিত আর একে অন্যের উপর চড়াও হতো; এমন গর্হিত ধারণা থেকে আল্লাহ্ পবিত্র।' একই সুরার ১১৬ আয়াতে একই আলোচনা হয়েছে। 'সুরা আন্–নামাল' এর ২৬ আয়াতে আলোচিত হয়েছে আল্লাহ্তায়ালার উলুহিয়াত সম্পর্কে। ৬১ আয়াতে বলেন, 'আম্মান যাআলাল আরদা কারারাও অযাআলা খিলালাহা আনহারাও অজাআলা লাহা রাওয়ামিয়া অজাআলা বায়নাল বাহরাইনি হাজিজা০ অইলাহুম মাআল্লাহি বাল্ আকসুরুহুম লা ইয়ালামুন'–'তিনি সেই সত্তা যিনি জমীনকে বাসস্থান বানিয়েছেন, মাঝে মাঝে নির্ঝরিণী তৈরি করে দিয়েছেন; কোথাও পর্বত সমূহ সৃষ্টি করেছেন এবং দুই নদীর মাঝে এঁকেছেন সীমারেখা; তিনি ছাড়া আর কেউ উপাস্য আছে কি? তাদের অধিকাংশ তা বোঝেনা।' ৬২ আয়াতে বলেন, 'আম্মায় ইয়ুজিবু মুদ্তার্রা ইজা দাআহু অইয়াক্শিফুশ্

ওআ অইয়াজ্ আলুকা খুলাফা আল্ আরদ্০অইলাহুম মাআল্লাহ্ ক্বালিলাম মা তাজাক্কারুন’– ‘তিনি সেই সত্ত্বা যিনি বিপন্নের ডাকে সাড়া দেন ও তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেন আর তোমাদের জমীন ব্যবহারের অধিকার দেন; আল্লাহ্র সাথে আর কেউ উপাস্য আছে কি? কিন্তু তা তোমরা খুব কমই বুঝতে পারো।’ ৬৩ আয়াতে বলেন, ‘আম্মায় ইয়াহ্দিকুম ফি জুলুমাতিল বার্রি অল্ বাহ্রি অমায় ইয়ুরশিলুর রিয়াহা বুশরাম্ বায়না ইয়াদা রাহ্মাতিহি০অইলাহুম মাআল্লাহ্০তায়ালাল্লাহু আম্মা ইয়ুশ্রিকুন’ –‘তিনি সেই সত্ত্বা যিনি স্থল ও জলভাগের গাঢ় আঁধার রাশির ভেতর তোমাদের পথ দেখান আর যিনি বৃষ্টির আগে বাতাসকে পাঠান, যা তোমাদের খুশি করে; তাঁর সাথে আর কেউ উপাস্য আছে কি? আল্লাহ্ তাঁর শরীক থেকে অনেক উর্ধ্বে।’ ৬৪ আয়াতে বলেন, ‘তিনি সেই সত্ত্বা যিনি বস্তুকে প্রথম সৃষ্টি করেন আবার তাদের সৃষ্টি (পুনরুত্থান) করবেন; তিনি তোমাদের আকাশ ও ভূপৃষ্ঠ থেকে রুজি দান করেন; আল্লাহ্র সাথে আর কেউ উপাস্য আছে কি? আপনি বলুন, তোমরা আনো তোমাদের প্রমাণ, যদি সত্যবাদী হও’ ।

সুরা ‘আল কাসাস’ এর ৩৮ আয়াতে আল্লাহ্তায়ালা বলেন, ‘অক্বালা ফিরআউনু ইয়া আইয়্যুহাল মালাউ মা আলিম্তু লাকুম্ মিন ইলাহিম গায়রি ফাআউকিদ্লি ইয়া হামানু আলাত্ত্বীনি ফাজ্আল্লি সারহাল্ লা আল্লি আত্তালিউ ইলা ইলাহি; মুসা অইন্নি লা আজুন্নুহু মিনাল কাজিবিন’ –‘এবং ফিরাউন বলল,’ হে সভাসদ, আমি ছাড়া তোমাদের অন্য কোনও মা’বুদ আছে বলে আমার মনে হয় না; ওহে হামান, তুমি আমার জন্য মাটিকে আগুনে পোড়াও (ইট তৈরি করো)। তারপর আমার জন্য তৈরি করো সুউচ্চ এক প্রাসাদ; যেন আমি মুসার মা’বুদের সন্ধান করতে পারি। আর আমি মনে করি মুসা একজন মিথ্যাবাদী’ ! একই সুরার ৭০ আয়াতে আলোচিত হয়েছে আল্লাহ্র উলুহিয়াত। ৭১ আয়াতে আল্লাহ্তায়ালা বলেন, ‘ক্বোল আরাআয়তুম ইন জাআলাল্লাহু আলাইকুমুল্ লাইলা শারমাদান ইলা ইয়াওমিল ক্বিয়ামাতি মান্ ইলাহুন গায়রুল্লাহি ইয়াতিকুম বিদিয়াইন০অক্বালা তাশমাউন’ –‘আপনি বলেন, আচ্ছা, যদি আল্লাহ্ ক্বিয়ামাত পর্যন্ত রাতকে দীর্ঘ করেন তাহলে কে এমন উপাস্য আছে যে, তোমাদের জন্যে আলো এনে দেবে? তবে কি তোমরা কানে শোন না (এতবড় স্পষ্ট প্রমাণ!); ৭২ আয়াতে বলেন, ‘ক্বোল আরাআয়তুম ইন জাআলাল্লাহু আ’লায়কুমুন্ নাহারা শারমাদান ইলা ইয়াওমিল ক্বিয়ামাতি মান ইলাহুন গায়রুল্লাহি ইয়াতিকুম বিল্ লাইলিমু তাশকুনুনা ফিহ০আফালা তুব্সিরুন’ –‘আপনি বলেন, আচ্ছা, যদি আল্লাহ্ ক্বিয়ামত পর্যন্ত দিনকে স্থায়ী করেন তাহলে কে এমন উপাস্য আছে যে তোমাদের জন্য রাত এনে দেবে, যা তোমাদের জন্য আরামদায়ক; তবুও কি তোমরা দেখনা’? একই সুরার ৮৮ আয়াতে আল্লাহ্র উলুহিয়াত সম্পর্কেই আলোচনা হয়েছে। সুরা ‘আল–ফাতির’ –এর ৩ আয়াতে আল্লাহ্তায়ালা বলেন, ‘ইয়া আইয়্যুহান্নাসুজ্কুরু নে’মাতাল্লাহি আলাইকুম০হাল মিন খালিকিন আল্লাহ্ ছাড়া এমন কোনও স্রষ্টা আছে কি যিনি তোমাদের জন্য আকাশ ও ভূপৃষ্ঠ থেকে রিজিক পাঠান; তিনি ছাড়া আর কেউ উপাস্য নেই; তারপর কোথায় যাচ্ছ তোমরা?’ সুরা ‘আস্সাফফাত’ –এর ৩৫, ‘সোয়াদ’ –এর ৬৫ ‘জুমারা’ – এর ৬, ‘মু’মিন’ –এর ৩, ৩৭, ৬২, ৬৫, ‘হামিম’ –এর ৬, ‘যুখরুফ’ –এর ৮৪, ‘আদ্ দুখান’ –এর ৮, ‘মুহাম্মাদ’ –এর ১৯, ‘আত–তুর’ –এর ৪৩, ‘আল–হাশার’ –এর ২২, ২৩, ‘আত–তাগাবুন’ –এর ১৩, ‘আল–মুজাম্মিল’ –এর ৯ এবং ‘নাস’ –এর ৩ আয়াতগুলোতেও আল্লাহ্তায়ালার উলুহিয়াত সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে সোচ্চারে।

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন বার বার কালামে পাকের পাতায় পাতায় তাঁর সার্বভৌমত্ব ও প্রভুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এই জন্য যে, বান্দা যদি তাঁর প্রভুর ক্ষমতা সম্পর্কে সামান্য সন্দেহ করে, তাঁর ইবাদাত হবে অসম্পূর্ণ। সে নামাজ পড়ে আল্লাহ্র নারাজী বা অসন্তুষ্টি হাসিল করবে, জাকাত দিয়ে হবে অপরাধী, রোজা যাবে বিফলে। হজ্জ করে সে হবে খোদার ক্রোধের কারণ, ইল্ম্ শিখে সে হবে মরদুদ্ বা অভিশপ্ত। তার মধ্যে আসবে না আত্মসমর্পণ। কারণ সে তো তার পরম প্রভুকে পরিষ্কার ভাবে চেনেনি। তাঁর খোদা

সম্পর্কে তাঁর ধারণা অসম্পূর্ণ। তাই প্রথমেই জানতে হবে তিনি কে? কী তার ক্ষমতা? কী বা তার প্রকৃত পরিচয়।

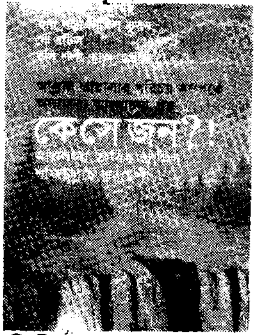

তিন

তিনি আল্লাহ্।

তিনি ছাড়া কেউ উপাস্য নাই। তিনি ছাড়া কেউ মালিক বা প্রভূ নাই। তিনি ছাড়া কেউ খালিক বা স্রষ্টা নাই। তিনি ছাড়া কেউ রাজেক বা রুজী দেবার ক্ষমতা রাখে না। তিনি ছাড়া কেউ হাফিজ নাই বা নিরাপত্তা দিতে পারে না। হাদিস শরীফে এসেছে,'ইন্নালিল্লাহি তিস্আতাঁও ওয়া তিস্য়িনা ইসমান মিআতান গাইরা ওয়াহিদাতিম মান আহসাতা দাখালাল জান্নাতা'-অর্থাৎ 'আল্লাহ্র ৯৯ টি নাম রয়েছে। যারা এ নাম গুলোকে পুরিপূর্ণ বিশ্বাসের সাথে গ্রহণ ও সংরক্ষণ করে তারাই বেহেশ্ত প্রবেশ করবে। এখানে 'আহসা' শব্দ থেকে বুঝানো হয়েছে যে আল্লাহ্র নামগুলোর গূঢ়ার্থ জানবে ও বাস্তবায়ন করা। তাতে আল্লাহ্র সাথে তৈরি হবে গভীর সম্পর্ক। আর আল্লাহ্র নামের মাঝে তাঁর যে গুণের পরিচয় পাওয়া যায় সেই অনুযায়ী তাঁকে বিশ্বাস করা। যেমন 'আল্লাহ্'। এটা আল্লাহ্ পাকের জাতি নাম। এর একটা শাব্দিক অর্থও রয়েছে। যেমন, পূর্ব জামানার কিছু মুহাক্কিক আলিম বলেছেন আল্+ইলাহ্=আল্লাহ্। ইলাহ্ অর্থ সার্বভৌমত্বের অধিকারী। আর আল্ শব্দ দিয়ে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে সেটাকে। তাহলে আল্লাহ্ শব্দের অর্থ দাঁড়াল সার্বভৌম ক্ষমতার একমাত্র ও একচ্ছত্র অধিকারী। কাজেই একমাত্র আল্লাহ্কেই সার্বভৌমত্বের মালিক মনে করতে হবে। আমাদের প্রতিনিয়ত কাজের মধ্যে প্রমাণ রাখতে হবে আল্লাহ্র এই রাজত্বে তাকেই একমাত্র প্রাধান্য দিচ্ছি। আর কারও মাতব্বরি মানি না। তিনি 'রাহমান' ও 'রাহিম'। অর্থাৎ আল্লাহ্ই একমাত্র পরম দাতা ও দয়ালু। আমি এবং আমরা সব সময়ই তাঁর দয়ার উপর নির্ভরশীল। অন্য কারো সাহায্য বা দয়ার ধার ধারিনা। না চীন, না আমেরিকা, না রাশিয়া করো দয়ায় আমরা চলি না। 'আল মালিকু'-আল্লাহ্ই একমাত্র রাজাধিরাজ। মানুষ এলাকার কমিশনার, চেয়ারম্যান, মেম্বার ও মাতব্বরকে মেনে চলে। আমরা সব রাজার রাজা, সর্বযুগের একমাত্র বাদশাহের হুকুম মেনে চলবো। কারণ তিনি আমাদের মালিক। 'আল কুদ্দুসু'-তিনি যাবতীয় অন্যায়, জুলুম নির্যাতন ও যে কোনও প্রকার ত্রুটি থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। তিনি আমাদের পবিত্র মালিক। 'আস-সালামু'-আল্লাহ্ই একমাত্র শান্তি দান কারী, অশান্তি নিবারণ করেন, অশান্তি থেকে বাঁচান। তিনি ছাড়া কেউ শান্তি দিতে পারে না, অশান্তি থেকে বাঁচাতে পারে না। 'আল-মু'মিনু'-তিনি আল্লাহ্ই একমাত্র নিরাপত্তা দানকারী বাদশাহ্। 'আল-মুহাইমিনু'- একমাত্র রক্ষণাবেক্ষণকারী বাদশাহ্। 'আল-আযিযু'-তিনি মহাসম্মানিত, দুর্দান্ত প্রতাবশালী ও অসীম শক্তিধর বাদশাহ্। 'আল-জাব্বারু'-তিনি এমন বাদশাহ্ যিনি যা খুশি তাই-ই করতে পারেন। 'আল-মুতাকাব্বিরু'-সবরকম শক্তি ও

গুণের সমাহার যার তেমন বাদশাহ্। যাঁর গৌরব করা একমাত্র সাজে। কাজেই আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনকে তাঁর শক্তি ও গুণের অধিকারী একমাত্র বাদশাহ্ মেনে নিয়ে তাঁকে এমনভাবে ভয় পেতে হবে যেন অন্য কোনও সৃষ্টির ওপর তেমন ভয় পোষণ না করা হয়। আবার এমন বিশ্বাস রাখতে হবে ওইসব গুণের ও শক্তির একমাত্র অধিকারী আল্লাহ্র প্রতি আমি যতক্ষণ আনুগত্য দেখাবো ততক্ষণ সৃষ্টির তরফ থেকে আমাদের কোনও ভয় নেই। 'আল খালিকু'–দৃশ্যমান যাবতীয় জিনিসের সৃষ্টিকর্তা। 'আল বারিউ' - রুহ্ এবং অদৃশ্য যাবতীয় জিনিষের সৃষ্টিকর্তা। 'আল মুসাওয়িরু'–তিনি দান করেন আকার ও আকৃতি। 'আল গাফ্ফারু'- আল্লাহ্ অনেক বড় ক্ষমাশীল। 'আল–কাহ্হারু'- প্রভাব বিস্তারকারী মহাশক্তিধর। 'আল–ওহ্হাবু'- আল্লাহ্ অনেক বড় দাতা। 'আর রায্যাকু' – আল্লাহ্ই একমাত্র রুজি দানকারী। 'আল-ফাত্তাহ্'–আল্লাহ্ তিনি, যিনি খুলে দেন বন্ধ দরোজা। তার মানে তিনি বিদ্যা, বুদ্ধি, রুজি ও বিভিন্ন নানা ধরনের লাভের দরজা খুলে দেন। 'আল আলিমু'–যিনি সব বিষয়ে সব কিছু জানেন; সর্বজ্ঞ। কাজেই সব ধরনের সমস্যা, অসুবিধা আর বিপদ মুসিবতের দরোজা খুলে দিয়ে মুক্তি দেন যিনি আল্লাহ্, আমরা তাঁরই মুখাপেক্ষী হবো। তিনি সর্বজ্ঞ, সবজান্তা বা সব জানেন। তাঁর কাছ থেকেই জ্ঞান অর্জনের জন্যে সদা সচেষ্ট থাকতে হবে। আর তিনি সবকিছু জানেন বলে আমাকে সদা সতর্ক অবস্থায় থাকতে হবে। এমন কিছু আমার কাছ থেকে ঘটে না যায় যাতে আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হয়ে যায়। 'আল ক্বাবিদু'–যিনি সংকীর্ণ বা ছোট করেন। 'আর বাসিতু'–যিনি প্রশস্ত বা বড় করেন। যে কোনও অবস্থাকে ক্ষুদ্র তিনিই করেন, আবার তিনিই বড় করে দেন। কাজেই তাঁরই ওপর নির্ভর ও ভয় করা উচিত। আর এ ব্যাপারে তাঁর ক্ষমতার ওপর পূর্ণ বিশ্বাস করে, তাঁর ভয়ে ভীত হয়ে তাঁরই কাছে আত্মসমর্পিত হওয়া ও দোয়ায় ব্যস্ত থাকে। 'আল খাফিসু'–তিনিই অবস্থার অবনতি করেন। 'আর রাফিয়্যু'–তিনিই উন্নতি দান করেন। তাঁরই হাতে উন্নতি এবং অবনতি। কাজেই তাঁরই কাছে সবসময় অবনতির হাত থেকে বাঁচার জন্যে আর তাঁরই দেখানো পথে উন্নতি লাভের চেষ্টা করা। 'আল মুয়িযু'–তিনি ইজ্জত দানকারী। 'আল মুজিল্লু'–তিনিই ইজ্জত হরণকারী, অপদস্থ তিনিই করেন। কাজেই তাঁরই কাছে সম্মান চাওয়া, বেইজ্জতি থেকে মুক্তি চাওয়া। 'আস সামীউ'–যিনি সবকিছু শোনেন। 'আল বাসিরু'–সব কিছু যিনি দেখেন। কাজেই নিভৃতেও কোনও এমন কিছু করা যাবে না যা তিনি নিষেধ করেছেন। 'আল হাকামু'–আল্লাহ্ই একমাত্র আদেশ দানকারী ও আইন প্রণেতা। 'আল আদিলু'– তিনি ন্যায়পরায়ণ ও ন্যায় বিচারক। 'আল লাতিফ'–তিনি সূক্ষ্মদর্শী ও বিপদে মুক্তি দাতা। 'আল খাবিরু'–যিনি গোপন খবর জানেন। 'আল হালিমু'–তিনি অতিশয় ধৈর্যশীল। 'আল আজীযু'–তিনি অতি মহান। 'আল গাফুরু'–তিনি অতিশয় ক্ষমাশীল। 'আশ্শাকুরু'–তিনি সঠিক কর্ম সম্পাদনকারী। তিনি বড় মর্যাদা দানকারী। 'আল আলিয়ু'–আল্লাহ্ অতি বড় মহান। 'আল কাবীর'–তিনি সবচেয়ে বড়। 'আল হাফিজু'–তিনি সবকিছু সংরক্ষণ করেন। 'আল মুকীতু'– সবার রুজি দানকারী। 'আল হাসীবু'–তিনি সবার হিসাব গ্রহণকারী। 'আল জালীলু'–অতি বড় মর্যাদাশালী। 'আল কারীমু'–তিনি বড় দাতা। 'আর রাকীবু'– তিনি গোপন ও প্রকাশ্য সব জানেন। 'আল মুজীবু'–করুণ প্রার্থনা শ্রবণকারী। 'আল ওয়াসিউ'–তিনি বিশাল, অফুরন্ত। 'আল হাকীমু'–তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী। 'আল ওয়াদুদ'–তিনি প্রেমময়। 'আল মাজিদু'–তিনি সবচেয়ে সম্মানিত। 'আল বাঈসু'–তিনি কিয়ামতের দিনে পুনরুত্থানকারী। 'আশ্শাহিদু'–তিনি প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষ্যদাতা। 'আল হাক্কু'–তিনি মহাসত্য। 'আল ওয়াকিলু'–একমাত্র কার্যনির্বাহক।

'আল ক্বাবীউ'–তিনি প্রবল পরাক্রমশালী। 'আল ওয়ালিয়্যু'–তিনি একমাত্র বন্ধু 'আল হামিদু'–তিনি প্রশংসার যোগ্য।

'আল মুহসিয়্যু'–তিনি হিসাব সংরক্ষণকারী, 'আল মুবদিউ'–সব বস্তুর প্রথম স্রষ্টা। 'আল মুয়ীদ'–তিনি পুনরুত্থানকারী স্রষ্টা। 'আল মুহ্ঈ'– তিনি জীবনের স্রষ্টা। 'আল মুমিতু'–তিনি মৃত্যুদাতা। 'আল হাইয়্যু'–তিনি চিরঞ্জীব। 'আল কাইয়ুম'–চিরস্থায়ী। 'আল ওয়াজিদু'–প্রকৃত ধনী। 'আল ওয়াহিদু'–তিনি এক। 'আস সামাদু'–তিনি কারও ধার ধারেন না। 'আল ক্বাদিরু'–শক্তিমান। 'আল মুক্তাদিরু'–তিনি সর্বশক্তিমান। 'আল মুকাদ্দিসু'–তিনি অগ্রগামী করেন। 'আল মুয়াখ্খিরু'–তিনি পেছনে ফেলে দেন। 'আল আউয়ালু'–তিনিই আদি। 'আল আখিরু'–তিনিই অন্ত। 'আজ্জাহিরু'–তিনি প্রকাশ্য। 'আল বাতিনু'–তিনিই গোপন। 'আলওয়ালি'– তিনিই প্রথম অধিকার বিস্তারকারী বাদশাহ। 'আল মুতাআলী'–তিনি সর্বোচ্চ ক্ষমতাবান। 'আল বার্রু'–তিনি পরম বন্ধু। 'আত্তাওয়াবু'–তিনি তাওবা কবুলকারী। 'আল মুনতাকিমু'–তিনি শাস্তিদাতা। 'আল আফুউ্য'–তিনি ক্ষমাশীল। 'আর রাউফু'–তিনি অতিশয় সদয়। 'মালিকাল মুলক্'–তিনি বিশ্বজাহানের মালিক। 'যুল জালালি অল ইকরাম'–তিনিই সব প্রভাব প্রতিপত্তির মালিক। 'আল মুকসিতু'–তিনি ন্যায় বিচারক। 'আল জামিউ'–সমবেতকরী। 'আল গানিয়্যু'–প্রকৃত ধনী। 'আর মুগনি'–তিনি ধনীর স্রষ্টা। 'আল মানিউ'–ধনী ও নির্ধন সৃষ্টিকারী। 'আদ্দাররু'–অনিষ্টের মালিক। 'আন নাফিউ'–তিনি লাভ দানকারী। 'আন্নুরু'–তিনি আলো। 'আলহাদি'–তিনি পথ দেখান বা হেদায়েত দান করেন। 'আল বাদিউ'–তিনি প্রথম অস্তিত্ব দান কারী। 'আলবাকী'–তিনিই অবশিষ্ট থাকবেন। 'আল ওয়ারিসু'–সকল সম্পদের একমাত্র উত্তরাধিকার। 'আর রাশিদু'–তিনি সত্য। 'আস সাবিরু'–তিনি ধৈর্যশীল। 'আস সাত্তারু'–তিনি দোষ গোপন রাখেন।

তো ভাই, 'আমানতু বিল্লাহি',–আমি ঈমান এনেছি আল্লাহ্র উপর–'কামা হুয়া বি আসমাইহি'–তাঁর নামের উপর–'অয়া সিফাতিহী'–এবং তাঁর গুণের উপর।

আল্লাহ্র গুণবাচক একটা নাম হচ্ছে 'রাহমান'। তিনি কেমন রাহমান?

মক্কার কাফিররা 'রাহমান' কথাটার মানে বুঝতো না। মুসলমানদের মুখ থেকে 'রাহমান' নাম শুনে তারা বলাবলি করতো' 'অমার্ রাহমান?' রাহমান আবার কি? তাদের 'রাহমান' নামের সাথে পরিচিত করার জন্যে আল্লাহ্তালা অবতীর্ণ করলেন সুরা 'আর রাহমান'। তিনি কেমন রাহমান তার বিশদ পরিচয় দিলেন এই পবিত্র সুরায়। গোটা সুরাতে মানব মন্ডলীর জন্যে তাঁর দেয়া দয়ার নিদর্শন যাবতীয় ইহলৌকিক ও পারলৌকিক নেয়ামত ও অবদান সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন, আর রাহমানু–আল্লামাল কুরআন। তার মানে–করুণাময় আল্লাহ্; শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন।

অর্থাৎ মানবের প্রতি যাবতীয় ইহলৌকিক ও পারলৌকিক দয়ার মাঝে সবচেয়ে অন্যতম যে তিনি মানুষকে শিখেয়েছেন কুরআন। তাঁর সবচেয়ে বড় অবদান, সবচেয়ে বড় দয়া। কারণ, এতে রয়েছে মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ। সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) কোরআনকে সর্বান্তকরণে গ্রহণ করেছিলেন। জীবনের প্রতিটি কণাকে বিলীন করে, শরীরের শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে কুরআনের প্রতি দেখিয়েছিলেন সত্যিকার সম্মান ও মর্যাদা।

আর সেজন্য আল্লাহতায়ালা তাঁদেরকে দুনিয়া ও পরকালীন মর্যাদার ও গৌরবের স্বর্ণ শিখরে পৌছে দিয়েছেন। তারপর আল্লাহতালা বলেন, 'খালাকাল ইন্সানা আল্লামা হুল বায়ান'–'সৃষ্টি করেছেন মানুষ, তাকে শিখিয়েছেন কথা বলা।' অর্থাৎ তিনি কেমন দয়াল তা বুঝিয়েছেন তাঁর দেয়া বিস্ময়কর একটি

নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে। তিনি শুধু আমাদের পোড়ামাটি দিয়ে সৃষ্টিই করেন নি। কথা বলতে শিখিয়েছেন। ভাবপ্রকাশ করার অলৌকিক এ অবদান তার 'রাহমান' নামেরই পরিচয় দেয়। তিনি কুরআন নাযিল করেছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাধ্যমে তা পৌঁছে দিয়েছেন মানব জাতিকে। তাঁর পর আর কোনও নবী নেই। তাই বাকী মানব সন্তানকে কথা বলার ক্ষমতা দিয়ে কুরআনী শিক্ষাকে পৌঁছে দিচ্ছেন শেষ দিবস পর্যন্ত মানবজাতিকে। আল্লাহতায়ালা প্রথমে মানব সৃষ্টির কথা উল্লেখ করতে পারতেন। কিন্তু তিনি প্রথমে বলেছেন আমি শিখেয়েছি কুরআন। কুরআনের শিক্ষা গোটা মানবজগতকে সত্য পথ দেখানো, তাদের নৈতিক চরিত্র ও সৎকর্ম শেখানো। আসলে মানবসৃষ্টির লক্ষ্যই হচ্ছে কুরআন শিক্ষা আর তাতে দেখানো পথে চলা। সেটা ছাড়া মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যেত। সেজন্য 'রাহমান' তার দয়া এভাবে করেছেন। তিনি প্রথমে কুরআন নাজিল করেছেন, তা শিখিয়েছেন তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে। তিনি শিখিয়েছেন তাঁর সাথীদের। তাঁর সাথীরা শিখিয়েছেন পরবর্তীদের। এভাবে কেয়ামত দিবস পর্যন্ত শেষ মানবকে। কাজেই কুরআন শিক্ষার কথা মানব সৃষ্টির আগেই বলা হয়েছে।

মানুষ সৃষ্টির পর অসংখ্য অবদান 'রাহমান' তাদের দিয়েছেন। সেগুলো মানুষের ক্রমবিকাশ, অস্তিত্ব ও স্থায়িত্বের সাথে সম্পর্কযুক্ত। যেমন পানাহার, শীত ও গ্রীষ্ম থেকে আত্মরক্ষার উপকরণ, বসবাসের ব্যবস্থা। কিন্তু সেগুলোর আলোচনা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পরে বলেছেন। এজন্যে যে তাঁর কাছে মানুষকে দেয়া তাঁর দয়ার মাঝে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে কুরআন শেখা ও শেখানো। যার জন্যে তিনি বলেছেন 'আল্লামা হুল বায়ান'–'আমি শিখিয়েছি বর্ণনা করতে।' বর্ণনা না করতে পারলে সে কিভাবে অন্যকে শেখাতো? এখানে 'বায়ান' বা বর্ণনার অর্থ ব্যাপক। মৌখিক বর্ণনা, লেখা ও চিঠিপত্রের মাধ্যমে বর্ণনা ছাড়াও অপরকে বোঝানোর যত উপায় আল্লাহতায়ালা সৃষ্টি করেছেন, সবই এর মধ্যে রয়েছে।

'আশ্‌শামসু অল কামারু বিহুসবান'–সূর্য ও চন্দ্র চলছে হিসেব মতো।

দয়ালু, রাহমানুর রাহীম মানুষের জন্যে ভূমন্ডলে ও নভোমন্ডলে, সৃষ্টি করেছেন অসংখ্য অবদান। এই আয়াতে সূর্য ও চন্দ্রের কথা বলেছেন। বিশ্ব-জগতের গোটা ব্যবস্থাপনা এই দু'টি গ্রহের গতি ও আলোর সাথে জড়িয়ে রয়েছে গভীরভাবে। 'হুসবান' শব্দটি অনেকের মতে ধাতু। এর অর্থ হিসেব। অনেকে বলেন এটি 'হিসাব' শব্দের বহুবচন।

সূর্য ও চাঁদের গতি আর তাদের আপন আপন কক্ষপথে বিচরণের অটল ব্যবস্থা চালু রয়েছে। একটা বিশেষ হিসাব ও পরিমাপ মতো। মানব জীবনের সব কর্মকান্ড নির্ভর করছে সূর্য ও চাঁদের গতির ওপর। এর জন্যেই দিন–রাত্রির পার্থক্য, ঋতু পরিবর্তন আর বছর মাসের নির্ধারণ হয়। সূর্য ও চাঁদের পরিক্রমণের আলাদা হিসেব আছে। সেই হিসেবের ওপর চালু রয়েছে সৌর ও চন্দ্র ব্যবস্থা। এসব হিসাব অনড় আর অটল। লাখো বছর চলে গেলেও এক মিনিট বা এক সেকেন্ডের পার্থক্য হয় নি, হবেও না।

'অন্ নাজমু অশ্ শাজারু ইয়াশজুদান'–

'আর তৃণলতা ও গাছপালা সেজদায় আছে।'

কান্ডবিহীন লতানো গাছকে 'নাজমু' আর কান্ডবিশিষ্ট বৃক্ষকে 'শাজারু' বলে। সবরকম লতা–পাতা ও গাছ আল্লাহতায়ালার সামনে সিজদা করে। মাথা মাটিতে ছোঁয়ানো হচ্ছে সম্মান প্রদর্শন ও আনুগত্যের চরম নিদর্শন। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে সিজদা দানকারী এসব সৃষ্টি (বৃক্ষ, লতা–পাতা, ফলমূল) প্রতিনিয়ত মানুষের উপকার করে যাচ্ছে, নিজ নিজ কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করছে।

এত বিচিত্র সৃষ্টি মানুষের কাজে লিপ্ত থাকা এটিও 'রাহ্‌মানুর রাহীম' এর অসীম দয়া আমাদের প্রতি।

'অস্ সামাআ রাফাআহা অ-আদাআল্ মিজান-'

'তিনি আকাশকে উঁচু করেছেন আর তৈরি করেছেন দাঁড়িপাল্লা।'

আকাশের মর্যাদা পৃথিবীর তুলনায় উচ্চ ও শ্রেষ্ঠ। পৃথিবী তার বিপরীত। তারপরই আল্লাহ্‌তায়ালা মীজান বা তুলাদন্ডের আলোচনা করেছেন। আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে ভারসাম্য রক্ষা করেছেন এই মীজান সৃষ্টির মাধ্যমে। রহস্য এই যে, তিনি ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে মানবকে রক্ষা করেছেন আত্মসাৎ ও নিপীড়ন থেকে। এই আয়াতের ইশারা এই, আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির আসল উদ্দেশ্য ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা। তাহ্‌লেই নশ্বর এই পৃথিবীতে থাকবে শান্তি। এই যে অনর্থ থেকে আমাদের উদ্ধার করলেন এটিও রাহ্‌মানুর রাহিম এর দয়া।

'অল্ আরদা অদাআহা লিল্ আনাম-'

'আর পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছি প্রাণের জন্যে-'

এই ভূপৃষ্ঠ তৈরি করে তিনি আমাদের বসবাসের ব্যবস্থা করেছেন। দয়ালু আল্লাহ্‌ কোরআন পাকের অন্য স্থানে বলেছেন, 'আমি ভূপৃষ্ঠকে তৈরি করেছি তোমাদের জন্য বিছানা স্বরূপ।'

'ফিহা ফাকিহাতুন-'

'এতে আছে ফলমূল-'

যাতে করে তাঁর (আল্লাহ্‌র) বান্দারা স্বাদের, রুচির পরিবর্তন করতে পারে।

'অন্ নাখ্‌লু যাতুল আক্‌মাম্'-

'এবং খোসাসমেত খেজুর-'

'অল হাব্বু জুল আস্‌ফি-'

'আর দিয়েছি খোসাবিশিষ্ট শস্য-'

'আস্‌ফি'-সেই খোসা যার ভেতরে আল্লাহ্‌র অপার মহিমায় শস্যের দানা সৃষ্টি করা যায়। যার জন্যে মোড়কের ভেতরে দানা দূষিত আবহাওয়া ও পোকামাকড় ইত্যাদি থেকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে। শস্যের দানার সাথে 'খোসাবিশিষ্ট' কথাটি যোগ করে বুদ্ধিমান মানুষের দৃষ্টি এ দিকে আকৃষ্ট করা হয়েছে যে, তোমরা যে রুটি, ডাল ইত্যাদি রোজ খাচ্ছো, এর এক একটা দানাকে সৃষ্টিকর্তা কেমন সুকৌশলে মরা মাটি ও পানি দিয়ে তৈরি করেছেন। এগুলো মানুষের প্রতি দয়ালু আল্লাহ্‌তালার অসীম দয়ার প্রকাশ। তাঁর 'রাহ্‌মান' নামের পরিচয়।

তারপর কিভাবে দানাটিকে কীট-পতঙ্গ থেকে নিরাপদ রাখার জন্যে আবরণ দিয়ে ঢেকে দিয়েছেন। সেগুলো শেষমেশ তোমাদের গ্রাসে পরিণত হয়েছে। আর খোসাগুলো খোরাক হয়েছে তোমাদের চারপেয়ে পোষা জানোয়ারের। ওগুলো তোমাদের দেয় সুপেয় দুধ। যা তোমরা পান করো। তৃপ্ত হও। আর ওরা তোমাদের বোঝা বহন করে।

'অর রায়হান'-

'আর সুগন্ধি ফুল-'

আল্লাহ্‌তায়ালা মাটি থেকে উৎপন্ন বৃক্ষ থেকে তৈরি করেছেন নানা রঙের সুগন্ধি ফুল। যা আমাদের অনুভূতি কে পবিত্র করে, দেয় নির্মল আনন্দ। তিনি, রাহ্‌মান, আমাদের অতিক্ষুদ্র ও সূক্ষ্ম খুশির দিকে খেয়াল রেখেছেন।

'ফাবি আইয়ি আলায়ি রাব্বিকুমা তুকাজ্জিবান-'

'অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ দয়াকে অস্বীকার করবে?'

স্রষ্টা নিজেই তাঁর দয়ার কথা, দানের কথা স্মরণ করিয়ে প্রশ্ন করছেন অপত্য স্নেহে অন্ধ পিতার অভিমানী কণ্ঠে। বলো, এতোসব কি আমি দয়া করিনি? তবে কেন ভুলে যাচ্ছো এমন রাহমানকে?

'রাব্বুল মাশরিকাইনি অরাব্বুল মাগরিবাইন'–

'তিনি উভয় পূর্ব ও উভয় পশ্চিমের মালিক–'

সূর্যের উদয় ও অস্ত দিয়েছেন যেন আমরা দিনে কর্মমুখর আর রাতে নিদ্রার আরাম অনুভব করতে পারি।

'মারাজাল বাহ্‌রাইনি ইয়ালতাকিয়ান–'

'তিনি পাশাপাশি দুই সমুদ্র প্রবাহিত করেছেন–'

আল্লাহতায়ালা দুনিয়াতে দুই ধরনের সাগর সৃষ্টি করেছেন। মিষ্টি ও লোনা পানির। ভূপৃষ্ঠের কোথাও আবার এই দু'ধরনের সাগর মিলিত হয়েছে। যেখানে তারা একত্রিত হয় সেখানে বেশ দূর পর্যন্ত দু'দিকের পানি আলাদা থাকে। যেন মনে হয় মাঝখানে একটা রেখা টেনে দেয়া হয়েছে। একদিকে থাকে লোনা অন্যদিকে মিষ্টি পানি। লোনা পানি তার সীমানা ছেড়ে মিষ্টি পানিতে এসে পড়লেই তা মিষ্টি হয়ে যায়, ফের মিষ্টি পানি লোনা সমুদ্রে এসে পড়লেই তা হয়ে যায় লোনা। কোথাও এই মিষ্টি ও লোনা পানি উপর–নিচে প্রবাহিত হয়। পানি সূক্ষ্ম ও তরল পদার্থ। তবু তারা মিশ্রিত হয়ে একাকার হয় না।

'বায়নাহুমা বারজাখুল লা ইয়াব্‌গিয়ান–'

'উভয়ের মাঝে রয়েছে এক দেয়াল, যা তারা অতিক্রম করে না।'

দয়ালু রাহমান খোদা দুই মিলিত সাগরের মাঝে টেনে দিয়েছেন এক অদৃশ্য রেখা বা অন্তরাল। ফলে তারা মিলিত হয়েছে কিন্তু মিশ্রিত হয়নি।

'ইয়াখ্‌রুজু মিনহুমাল লুলুউ অল্ মারজান–'

'উভয় সমুদ্র থেকে তৈরি হয় মোতি ও প্রবাল–'

'লু–লু' শব্দের অর্থ মোতি আর 'মারজান'–এর মানে প্রবাল। উভয়ই মহামূল্যবান রত্ন। এই মোতিও প্রবাল সমুদ্র থেকে বের হয়। সেটা মিষ্টি পানি নয় লোনা পানির সমুদ্র থেকে। মোতি অবশ্য দু'ধরনের সমুদ্রেই তৈরি হয়। মিষ্টি পানির স্রোতধারা প্রবাহমান। সেজন্যে তার থেকে মোতি বের করা সহজ নয়। মিষ্টি পানির স্রোত লোনা সমুদ্রে পতিত হয় আর সেখান থেকেই মোতি বের করা হয়। মানুষের সৌন্দর্যের জন্যে পরম করুণাময়ের এই দান তিনি যে রাহমান তার পরিচয়।

'অলাহুল যাওয়ারিল মুন্‌শাআতু ফিল্ বাহ্‌রি কাল আলাম–'

'সমুদ্রে ভেসে বেড়ান, পাহাড় সদৃশ্য নৌকা বা জাহাজগুলো তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন–'

'যাওয়ারি' শব্দটি 'যাবিয়া' শব্দের বহুবচন। এর এক অর্থ নৌকা বা জাহাজ। 'মুন্‌শাআতু' শব্দটি 'নেশা' থেকে উদ্ভুত। এর অর্থ ভেসে ওঠা। উঁচু হওয়া অর্থে এখানে নৌকার পাল বোঝানো হয়েছে। এই যে সাগরের উর্মিমালা,অকূল দরিয়া পারাপারের মাধ্যমে নৌকা বা জাহাজের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন; মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন, রাহমানুর রাহীম মানুষের মাথায় যার নির্মাণ কৌশলের ছবি এঁকে দিয়েছেন তা তার অপার করুণা।

'অলিমান খাফা মাকামা রাব্বিহি জান্নাতান–'

' যে ব্যক্তি প্রভুর সামনে দাঁড়ানোর ভয়ে ভীত হয়েছে সে পাবে দু'টি উদ্যান–'

আল্লাহ্‌কে যে মেনেছে তাকে খালিহাত ফেরাবেন না দয়াল প্রভু। প্রতিদান স্বরূপ সে পাবে চিরসুখময়, চির বসন্তের আবাস দু'টো বাগান! তিনি না দিলে কার কি বলার ছিল? জেলখানার কয়েদী জেলজীবনে কর্তৃপক্ষের দেয়া প্রতিটি নিয়ম কানুন মেনে চলেছে। শাস্তির মেয়াদ শেষ হয়েছে। ঘরে ফিরে চলেছে

অপরাধী। তার জন্যে সরকার কোনও পুরস্কারের ব্যবস্থা করেনি তাতে কি বলার আর করার আছে? রাহমানুর রাহীম মানুষের মতো নির্মম নন। তিনি তাঁর আদরের বান্দাকে দুনিয়ার কারাগারে রেখেছেন আর দিয়েছেন কিছু বিধি-বিধান। সে সব মেনেছে। কারণ তার মনে ভয় একদিন আল্লাহ্‌র দরবারে তাকে দাঁড়াতে হবে। বান্দা যে তার প্রভুকে ভয় করেছে এতে আল্লাহ্ নির্বিকার থাকেন নি। বিরাট প্রতিদান আর পুরস্কার নিয়ে তিনি অপেক্ষমান। যার কর্ম যত ভাল তার জন্যে ততো উন্নতমানের প্রতিদান।

'যাওয়াতা আফনান-'

'দুটো উদ্যানই ঘন শাখা-পল্লব বিশিষ্ট-'

'ফিহিমা আয়নানি তাজরিয়ান-'

'বয়ে যাচ্ছে দুই ঝর্ণাধারা দুই উদ্যানে-'

একটি ঝর্ণার পানি সাধারণ স্বাদযুক্ত আর অন্যটি অসাধারণ।

'ফিহিমা মিন্‌কুল্লি ফাকিহাতিন জাওয়ান-'

'দুটো বাগানের প্রতিটি ফল বিভিন্ন রকমের হবে-'

অর্থাৎ অনেক ধরনের স্বাদ, রঙ ও বৈশিষ্টের হবে দু'টো উদ্যানের ফল।

'মুত্তাকিঈনা আলা ফুরুশিন; বাতাইনুহা মিন ইশ্‌তাবরাক০ অযানাল জান্নাতাঈনি দান-'

'তারা, ওখানে রেশমের মোড়কে ঢাকা বিছানায় হেলান দিয়ে বসবে, উভয় ফল তাদের সামনে ঝুলবে-'

'ফিহিন্না কাসিরাতুত্ তারফি; লাম ইয়াত্ মিস্‌হুন্না ইন্‌সুন ক্বাব্‌লাহুম অলা যান'-

'সেখানে থাকবে নত চোখের রমণীরা; কোন জ্বিন ও মানুষ এর আগে তাদের ছোঁয়নি-'

'কাআন্নাহুন্নাল ইয়াকুতু অল মারজান-'

'প্রবাল ও পদ্মরাগ সদৃশ রমণীগণ-

'অমিন দু'নিহিমা জান্নাতান-

'রয়েছে এ ছাড়া আরো দু'টো উদ্যান-'

যাঁরা বেশি নৈকট্য প্রাপ্ত হয়েছে তাদের জন্যে আগের দু'টো স্বর্ণের উদ্যান। আর কম নৈকট্যপ্রাপ্তদের জন্যে রয়েছে রুপোর তৈরি উদ্যান। এ দু'টি বাগান রূপোর তৈরি।

'মুদ্‌হাম্মাতান-'

'ঘন সবুজ রঙের'

'ফিহিমা আয়নানি নাদ্দাখাতান-'

'সেখানে আছে উজ্জ্বল দুই ঝর্ণাধারা-'

'ফিহিমা ফাকিহাতুঁউ অন্‌নাখলু অর রুম্মান-'

'সেখানে আছে ফলমূল-খেজুর আর আনার-'

'ফিহিন্না খায়রাতুন হিসান-'

'সেখানে থাকবে সুশীলা, সচ্চরিত্রা রমনীগণ-'

'হুরুম্ মাক্‌সুরাতুম ফিল খিয়াম-'

'তাঁবুতে অপেক্ষায় হুরগণ-'

'মুত্তাকিঈনা আলা রাফ্‌রাফিন খুদরিঁউ অ-আব্‌কারিন হিসান-'

'তারা সবুজ সিংহাসনে আর উৎকৃষ্ট মূল্যবান বিছানায় হেলান দিয়ে বসবে'

'রাফ্‌রাফিন' মানে সবুজ রঙের রেশমী পোশাক। তার উপর গাছ, লতা পাতা ও ফুলের কারুকার্য হবে।

এসব না দিলেই বা কি করার ছিল? তিনি দুনিয়াতেই কত কিছু আমাদের দিয়েছেন। সেগুলোর কৃতজ্ঞতা হিসেবে যদি আমরা তাঁর হুকুম মতো, তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তরীকা মতো চলি তাহলে তিনি অনন্ত জীবন নানা বৈচিত্রময় নেয়ামতে আমাদের ভরিয়ে দেবেন। এসব তো মূর্খ মানুষকে বোঝানোর জন্যে। আসলে তিনি যা কিছু পুরস্কার স্বরূপ আমাদের জন্যে তৈরি করে রেখেছেন তা কোনও চোখ এখনও দেখেনি, কোনও কান শোনেনি, কোনও মস্তিষ্ক চিন্তা করেনি।

এমন রাহমান, এমন রাহীম খোদা! তাঁর হুকুম যা অক্লেশে পালন করা যায় তা আমরা মানি না। আল্লাহ্তালা বলেন, 'ইয়া ইবনে আদাম, লি আলাইকা ফারিদা, অলাকা আলাইকা রিজকুক্'– 'হে আদমের সন্তান, হে আমার বান্দা, এক কাজ আমার আর এক কাজ তোমার। তোমাকে রুজি পাঠানো আমার কাজ আর আমার হয়ে থাকা তোমার কাজ। আমি রুজি দেব এটা আমার কাজ আর তুই আমাকে মানবি এটা তোর কাজ।

'ফাইন খালাকতানি ফি ফারিদাতি লাম্ উখ্লিকা ফি রিজ্কিক–'

'বান্দা তুই যদি আমার হুকুম নাও মানিস তবুও আমি তোকে রুজি পৌঁছে দেব। যদি তুই আমার ইবাদত ছেড়ে দিস, আমার আনুগত্য যদি তোর ভালো নাও লাগে, তবু আমি তোর রুজি দিতে থাকবো, রুটি আমি তোকে খাওয়াতে থাকবো।'

'ফাইন রাদিতাবিমা কাসামতাহু লাক–'

'এই যে আমি তোকে রুটি দিলাম তুই আমার উপর রাজী আর খুশি হয়ে যা–'

'আরাকতু কালবাক অ–বাদানাক–'

'তোকে আপন প্রেমিক বানাবো আর তোর দেহ ও মনকে শান্তিতে ভরিয়ে দেব–'

'অ–ইল্লাম তারদা বিমা কাসামতুহু লাক–'

'আর যদি আমার দেয়া রুজির ওপর তুই সন্তুষ্ট না হোস; রুজির পেছনে দুনিয়া কামানোর পেছনে যদি অশান্ত হয়ে ছুটতে থাকিস, হারাম হালাল বাছ বিচার না করিস–'

'ফালা ইজ্জাতি অ–সুলতানি–'

'তাহলে মনে রেখো, আমার ইজ্জত মর্যাদা আর বাদশাহীর কসম–'

'লা উসাল্লিতানা আলাইকাল দুনিয়া–'

'আমি তোর ওপর দুনিয়াকে চড়াও করে দেব।

'ফারাক্বাদ ফিহা রাফ্ছাল উহুসি ফিল বারিয়া–'

তখন তুই দুনিয়ার পেছনে এমন উম্মাদের মতো ছুটতে থাকবি যেমন শিকারীর ভয়ে পালাতে থাকে জানোয়ার।

তারপরও তুই ঐটুকুই পাবি যতটা তোর কপালে আমি লিখেছিলাম।

'অতাকুন্ ইন্দি মাগলুমা–'

'তখন তুই আমার (রাহমানুর রাহীম) সুনজর থেকে সরে যাবি।'

তো সেই রাহমান আর রাহীম আল্লাহ্ আমাদের কতটুকু ভালবাসেন?

আল্লাহ্ আকবার!

'ইয়া ইবনে আদাম, ইন্নি লাকা মুহিব্বুন ফাবি হাক্কি আলাইকা কুল্লি মুহিব্বা–'

হাদীসে কুদসীতে এসেছে, 'হে বনী আদম, আমি তোকে ভালবাসি, তোর ওপর আমার সেই ভালবাসার দাবী তুই–ও আমাকে ভালবাস্! হে আমার বান্দা আমি তোকে ভালবাসি, তোর ওপর আমার ভালবাসার কসম, তুই–ও আমাকে একটু ভালবাসা দে!'

'হে আদমের সন্তান, তুই আমাকে স্মরণ কর্ আমিও তোকে স্মরণ করবো-'

'অইন নাসাতানি জাকারতুক্-'

'হায়রে মানুষ! তুই আমাকে যদি ভুলে যাস তবুও আমি তোকে মনে রাখি আমি কখনও তোকে ভুলি না।'

'তু শাফিনি অ-শাফিক-'

'আমার সাথে বন্ধুত্ব কর্, আমি হবো তোর বন্ধু-'

'তু ওয়ালিনি অ-ওয়ালিক-'

'আমার সাথে যখন খারাপ ব্যবহার করবি আমি কিন্তু তখনও তোর ভালো করবো।'

'তু-ওয়া রিদওয়ান্নি অ-আনা মু'মিনুন আলাইক-'

'আমি দেখতে থাকি কখন তুই ফিরে আসিস আমার দিকে-'

আর যখন তুই আমার প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়ে, আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে শয়তানের পথ ধরিস। আমার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করে দিস, আমার দিকে পিঠ ফিরে চলে যাস; তবুও আমি অপেক্ষা করি। যদি তুই এখনি ফিরে আসিস আমার কাছে। তুই যতই আমার থেকে দূরে সরে যাবি আমি কিন্তু তোর দিক থেকে মুখ ফেরাবো না। আমি শুধু তোকে দেখতে থাকবো। দেখতেই থাকবো। মনে করবো, এই বুঝি ফিরে এলো আমার বান্দা।

'তু ওয়া রিদওয়ান্নি অ-আনা মুমিনুন আলাইক্-'

তুই আমার ওপর রাগ করবি আমি তোকে দেখতে থাকবো। যেমন, মা তার সেই মাসুম বাচ্চার জন্য অপেক্ষা করে থাকে, যে তার ওপর রাগ করে চলে গেছে চোখের সামনে থেকে দূরে। মা কিন্তু তার পথের পানে চেয়েই থাকে। ভাবে, এই বুঝি ফিরে এলো আমার বাচ্চা! এই বুঝি ফিরে এলো আমার কাছে।

আল্লাহ্ তো তার বান্দাকে মায়ের চেয়ে সত্তর গুণ বেশি ভালবাসেন।

এক হাদীসে এসেছে, সবচেয়ে বেশি খুশি হন আল্লাহ্ যখন বান্দা তাওবা করে। আমাদের গোনাহের কোনও মূল্য বা প্রভাবই নেই আল্লাহ্র ক্ষমা আর দয়ার সামনে।

সবচেয়ে বেশি খুশি হন আল্লাহ্তায়ালা বান্দার 'তাওবা'র উপর। কেমন খুশি হন?

'ইজা তা'বালা আব্দু লাহুল কানাদিনু ফিস সামায়ি-'

'যখন কোনও বান্দা তাওবা করে তখন আসমানে সাজ সাজ রব পড়ে যায়।' জ্বালানো হয় প্রদীপমালা। যেমন ধনী লোকেরা বিয়ের অনুষ্ঠানে জ্বালায়। আর এক ফিরিশতাকে বলা হয়-

'ইসতা লাহলা আবদু আলা মাওলা-'

'শোনো শোনো হে আসমানের বাসিন্দারা! আজ এক বান্দা আল্লাহ্র সাথে সন্ধি করে নিয়েছে।'

এমন প্রতিপালক, এমন দয়াল আল্লাহ্তায়ালা!

তার সাথে সম্পর্ক তৈরি না করা কতবড় অন্যায়! তিনি আমাদের ফিরে আসার (তাওবা) ওপর সমস্ত গোনাহকে কেটে দেন।

'ইয়া ইবনে আদাম, লাও বালাগাত জুনুবুকা আনা নাস্সামাআ সুম্মাস্ তাগ্ফারতানি গাফার তুলাকা অলা উরালি-'

'হে আদমের সন্তান, যদি তোমার গোনাহ্ জমিন ভরে আসমানেও পৌঁছে যায়, যদি চাঁদ সুরুজ ছুঁয়ে যায় তবুও তুমি যদি বলো, 'হে আল্লাহ্, তুমি আমাকে মাফ করে দাও-' সাথে সাথে তোমার গোনাহ আমি এমনভাবে মাফ করে দিই যেন তুমি কোনও গোনাহ্ই করোনি।'

এমনই হচ্ছে রাহমান আর রাহীম আমাদের প্রভু।

তিনি দয়ালু তাই মানুষকে শিশু বয়সে দুধ দান করেন। তিনি দয়ালু তাই মা'য়ের হেরেমে তাঁর কুদরত দিয়ে সুরক্ষা করেন। তিনি দয়ালু তাই মা'কে এতবড় যন্ত্রণা দেয়ার পরও সন্তানের জন্যে অপরিসীম মমতা ঢেলে দেন মায়ের মনে। তিনি দয়ালু তাই শিশুকে অন্ধ করেন না। চোখ দান করেন। দৃষ্টি শক্তি দিয়ে দেন।

'অলাও নাশাউ লা'তামাশ্না আলা আইয়ুনিহিম ফাস্তাবাকুস্ সিরাতা ফাআন্না ইয়ব্সিরুন-'

'যদি আমি ইচ্ছে করতাম তো তোমাদের দৃষ্টি কেড়ে নিতাম; বান্দা তাহলে তখন তুমি কিভাবে দেখতে?' কত মায়া! কিভাবে তুই দেখতে পেতিস। সেজন্যে আমি তোকে দেখার শক্তি দিয়ে দিলাম। কিন্তু বান্দা তুই তো অকৃতজ্ঞ! কিছুই মনে রাখিস না। তিনি দয়ালু তাই অকৃতজ্ঞ বান্দার চোখ উপড়ে নেন না।

'অলাও নাশাউ লা'মাশাখ্নাহুম আলা মাকানাতিহিম ফামাশ তাতাউ মুদিয়াঁও অলা ইয়ারজিউন-'

'যদি আমি ইচ্ছে করতাম তো তোমার কায়া বদলে দিতাম বা পা খোঁড়া করে দিতাম। কিন্তু বান্দা তখন তুমি কিভাবে ঘর থেকে বের হতে; কিভাবে চলাফেরা করতে?'

আল্লাহ্তালা রাহমান, রাহীম। তাই তিনি আমাদের খোঁড়া করেন না।

তিনি দয়ালু তাই আমাদের বিপদ মুক্ত করেন।

তিনি দয়ালু তাই তিনি আমাদের সুস্থতা দান করেন। অসুখ থেকে মুক্তি দেন। তিনি দয়ালু তাই আমাদের সমস্যার সমাধান করেন। ক্ষুধা মেটান। পিপাসার্ত হলে দেন পানি। দম বন্ধ হয়ে মারা যাবো তাই বাতাস প্রবাহিত করেন। তিনি শ্বাস নিতে, প্রশ্বাস ফেলতে দেন। তিনি দয়ালু তাই আমাদের অন্তরে কী চাওয়া তা বুঝতে পারেন; তা পূর্ণ করেন। দুনিয়াতে না করলে আখেরাতে পূর্ণ করবেন। তিনি দয়ালু তাই আমাদের আর্তি শুনতে পান, আমাদের ফরিয়াদ শোনেন, আমাদের মুখে তাঁর জিকির মনোযোগ দিয়ে শোনেন।

'অসিয়া সামিউল আখলাক-'

তিনি এতবড় দয়ালু শ্রোতা যে বান্দার ফরিয়াদ কান পেতে শোনেন।

তাঁর শোনার ক্ষমতা এতদূর পর্যন্ত রয়েছে যে গোটা দুনিয়ার মানুষ কথা বলতে শুরু করে, আর সেটা যদি সৃষ্টির শুরু দিন থেকে শেষ দিন পর্যন্ত যত মানুষ এসেছে, আর আসবে-সবাই মিলে বলে, তবুও তিনি তা এক পলকে শুনে নেন। প্রত্যেকের আলাদা কথা, ভাব-ভঙ্গি, দাবী-দাওয়া, চাওয়া-পাওয়া-সব তিনি শুনে নেন। হুবহু। তা যদি জীবিত হোক বা মৃত, যুবক হোক বা বৃদ্ধ, দানব হোক বা মানব, কীট হোক বা পতঙ্গ, জীব হোক বা জানোয়ার, হিংস্র জীব হোক বা নিরীহ প্রাণী, কালো মানুষ হোক বা সাদা, আরবী হোক বা আজমী, পশতুতে হোক বা হিন্দী, আরবীতে বলে বা বাঙলায়, উর্দুতে বলে বা হিব্রু, ইংরেজীতে বলে বা ফ্রেঞ্চ, ডাচ ভাষায় বলে বা ল্যাটিন। সারা দুনিয়ার সব ভাষাভাষীর মানুষ বলুক বা বিচিত্র নির্জন ভাষায় জীব জানোয়ার, কীট-পতঙ্গ, পোকা মাকড়-সবাই যদি একসাথে আল্লাহ্র কাছে চাইতে থাকে আল্লাহ্ তা শুনে নেন। পলকে। এক মুহূর্তে।

'লা ইয়ুসমিলুহু শামআন্ আন্ শাম, অলা কাওলাম আন কাওল, অলা মাসআলাম আলা মাসআলা-'

আল্লাহ্তায়ালা এমন প্রতিপালক ও শ্রোতা যে, যে কোনও ভাবে, যে কোনও ভাষায় যা কিছু বলে,তা পলকে শুনে ফেলেন। কোনও শোনাতে ভুল হয়না। আর প্রত্যেকের কথা শোনেন। কমা, দাঁড়িসহ।

'অলা ইয়াতাবাররাম বি আল্হাহি অবিল হাজাত-'

'আর তোমাদের চাওয়া, পাওয়া করে দেখাতে আমার কোনও অভাব পড়ে না।'

কোনও মানুষের কাছ থেকে জান বাঁচাতে চাও তো তার কাছে ধার চাও; সে তোমার বাড়ির রাস্তা ছেড়ে দিবে। কিন্তু মহান রাব্বুল আলামিনের সাথে সম্পর্ক গভীর করতে চাওতো তার কাছে তোমার যাবতীয় প্রয়োজন চাইতে থাকো। তিনি আপনার বন্ধু হয়ে যাবেন। তাঁর রহমত টুকরো টুকরো হয়ে চলে আসবে তোমার কাছে! তাঁর কাছে চাইলে খুশি হন, না চাইলে নারাজ হন। তিনি এমন দাতা যে জান্নাতে সবাইকে একত্রিত করবেন। সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ দিন পর্যন্ত যত লোক বেহেশতী হয়েছে তাদের সবাইকে ডাকবেন। বলবেন,

'আমার বান্দা আজ তুমি চাইবে আমি দেবো! আজ চাও।'

'লালম কুমাতিমাল ইয়াওমা বিক্বাদরি আমালিকুম-'

'আজ তোমাদের পূণ্য কর্মের প্রতিদান হিসেবে দেব না। দেবো আমার রহমত থেকে। কাজেই চাও।'

বান্দা বলবে, 'হে আল্লাহ্, আমি আর কী চাইবো, তুমি তো সবকিছু দিয়েছে!'

'না বান্দা, তবুও চাও।'

'আচ্ছা, হে পরম প্রভু, তুমি আমাদের উপর রাজী হয়ে যাও,' তখন বান্দা বলে।

আল্লাহ্পাক বলেন, 'বিরাদাই ইয়ান্‌কুম আহ্লাল্‌তুকুম বি দুয়ারী-'

'আরে! রাজী হয়ে গেছি বলেই তো এখানে বসিয়েছি। আজ এখন চাও, কী চাইবার আছে?'

চাইতে চাইতে ক্লান্ত হয়ে যাবে বান্দা। তখন আল্লাহতায়ালা বলবেন, 'সামান্য চেয়েছ, আরো চাও।' আবার চাইতে শুরু করবে। ক্লান্ত হয়ে পড়বে তারা।

তখন আল্লাহতায়ালা বলবেন, 'সামান্য চেয়েছ। আরও চাও।'

'আর কি চাওয়ার আছে?'

'এখন পর্যন্ত তো তোমরা তোমাদের শান মতো চেয়েছ। এবার আমার শান মতো চাও।'

এবার বান্দারা চিন্তান্বিত হয়ে পড়বে। কী চাওয়া যায়? চাওয়ার তো আর কিছু দেখছি না। আজ তাদের বুদ্ধি কিন্তু পার্থিব বুদ্ধি নয়, বেহেশতী বুদ্ধি। বেহেশতী মস্তিস্ক, বেহেশতী মেধা, বেহেশতী চিন্তাক্ষমতা। তবু তারা আর খুঁজে পাচ্ছে না তাদের আর চাওয়ার কী বাকী থাকতে পারে?

আবার আল্লাহতায়ালা বলেন, 'বান্দা, আরো চাইতে থাকো।'

বান্দা আবার প্রার্থনা করতে থাকবে। ক্লান্ত, দিশেহারা। তারা বলবে, 'ও আল্লাহ্, আর তো চাওয়ার কিছুই দেখছি না! কি চাইবো!'

আল্লাহ্তায়ালা বলেন-

'ইয়া ইবাদি ক্বাদ রাদিতুম বিদুনি মা ইয়াশাক্বু লাকুম-'

'আরে আমার বান্দা, তুই তো নিজের শান মতো চেয়েছিস। আমার শান মতো কিভাবে তুই চাইবি? যা তোর শান মতো যা চেয়েছিস তা-ও দিলাম। আর আমার শান অনুযায়ী যা তুমি চাইতে পারো নাই তা-ও দিলাম!'

দাতা তো এমনই হওয়া চাই।

এখন বলেন ভাই, এমন দাতা প্রতিপালকের প্রতি মন প্রাণ না সঁপে দেয়া কতবড় অন্যায়! এই অন্তরে আল্লাহ্ ছাড়া আর কারও প্রভাব না থাকা। স্রেফ আল্লাহ। একমাত্র আল্লাহরই স্থান এই অন্তরে থাকবে। আর আল্লাহ্তায়ালা তার বান্দার কাছে চান ভালোবাসা। যেমন স্ত্রী চায় স্বামীর অন্তরে একমাত্র তার ভালবাসা বিরাজ করুক। তারপর সে তাকে শুকনো রুটি দিক খেতে আর পরতে

দিক মোটা কাপড় কোনও আপত্তি নেই। তেমনি আল্লাহতালাও চান বান্দার অন্তর জুড়ে সব সময় আমার ভালবাসা, আমার স্মরণ বিরাজমান থাকুক।

আর যদি স্বামী অন্যের হয়ে যায় তারপর যতই সোনা দানা আর ধন সম্পদ স্ত্রীর পায়ের তলায় ফেলে দেয় তাতে স্ত্রী সুখী হয় না। তেমনি আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ও বান্দার অন্তরে দৃষ্টি রাখেন। দেখেন সেখানে তিনি আছেন না অন্য কোনও সৃষ্ট বস্তুর ভালবাসা রয়েছে আমরা কি জানি কেন ইয়াকুব আলাইহিস সালাম এর কাছ থেকে তার নয়নের মনি, আদরের দুলাল নবী সন্তান ইউসুফ আলাইহিস সালাম কে কেড়ে নিয়েছিলেন? বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিলেন? চল্লিশ বছর ধরে পিতা পুত্র আলাদা ছিলেন।

কেন?

মিশর থেকে শ্যামদেশ (বর্তমান সিরিয়া) মাত্র এক মাসের পথ অথচ কেউ কারো দেখা পাচ্ছে না। জানতে পারছে না কে কোথায়, কতদূর, কেমন আছে? ইউসুফ আলাইহিস সালাম এর অনুমতি নেই যে পিতাকে জানায়; আমি কাছেই আছি। পাশেই আছি ভাল আছি। কেঁদো না।

ওদিকে চোখের পানি ফেলতে ফেলতে ইয়াকুব আলাইহিস সালাম এর চোখ অন্ধ হয়ে গিয়েছে।

'আব্ ইয়াদ্দাতা আয়না মিনাল্ হুজ্নি ফাহুয়া কাবিম–'

তারপর যখন দেখা হলো ইয়াকুব আলাইহিস সালাম আবার চক্ষুষ্মান হলেন। বাপ বেটার মিলন হলো।

তখন আল্লাহতায়ালা ইয়াকুব আলাইহিস সালাম কে বললেন, 'তুমি কি জানো, কেন তোমাকে তোমার সন্তান থেকে আলাদা করে দিয়েছিলাম ? কারণ, একদিন তুমি নামাজ পড়ছিলে। পড়তে পড়তে আচমকাই তোমার কানে ভেসে এলো ইউসুফের কান্নার শব্দ।

তোমার দৃষ্টি পিছলে চলে গেল ইউসুফ আলাইহিস সালামের দিকে। আমি তীব্র অভিমানে সিদ্ধান্ত নিলাম বিচ্ছিন্ন করবো তোমাকে। ইউসুফের কাছ থেকে। আমার সামনে দাঁড়িয়ে আমারই সৃষ্ট ইউসুফের দিকে আমার নবীর দৃষ্টি! নবী হয়ে স্রষ্টাকে অবহেলা করে সৃষ্টির দিকে নজর। আল্লাহ তার সাথে কারও অংশীদারী পছন্দ করেন না। আল্লাহ তায়ালা মহান বিশ্বপ্রভু তার ভালবাসার কারও অংশী পছন্দ করেন না। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম এর মতো খলিল যখন তার নবী পুত্র ঈসমাইল এর দিকে বার বার মমতার দৃষ্টি ফেলছেন জবাই এর পূর্ব মুহূর্তে (আর এটা স্বাভাবিক পিতা তার পুত্রকে এমন সঙ্গীণ মুহূর্তে দেখবেই। তা জেনে হোক বা অজান্তেই ।)

তো ঠিক তখনি অদৃশ্য থেকে রাব্বুল আলামীন ঘোষণা করলেন, 'ইব্রাহিম ----ছুরি চালাও----ছুরি চালাও --!!'

সত্তুর বার ছুরি চালালেন ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম।

প্রথম বারেই দুম্বা রাখতে পারতেন আল্লাহ তালা। কিন্তু বার বার তাকে দিয়ে ছুরি চালালেন। ছুরি চালাতে চালাতে অন্তর থেকে তার সব অপত্য স্নেহের উদ্দীপনা নিঙড়ে বের করে নিলেন। প্রতিবার ছুরি চালাচ্ছেন! ছেলের গলায়! আপন ছেলে! নবী! বুক ভরা ভালবাসা তিল তিল করে বলি দিচ্ছেন। উজাড় করা পুত্র প্রেম মুখ থুবড়ে পড়ছে। আসমান জমিন নিথর। রুদ্ধশ্বাস। আসমানের বাসিন্দাদের মাঝে কান্নার রোল!

সত্তুর বার! পুত্রের জন্য আর কিছুই রইলো না! নবী ইব্রাহিম এর মনের কোণে! বাকী থাকলো আল্লাহকে রাজী খুশি করার নিশ্ছিদ্র আর নির্ভেজাল উদ্দীপনা! উদ্যম! হুজুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের কাছে এটাই আল্লাহর চাওয়া। সব কিছু ছেড়ে আমার সাথে সম্পর্ক করো। প্রেমের,

ভালবাসার আর আনুগত্যের মহান সম্পর্ক। আমার জন্যে আত্ম বলিদান দাও। আমি ছাড়া সবকিছুকে বের করে দাও অন্তর থেকে। আমি আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে সবচেয়ে উত্তম।

এজন্যে বান্দা যখন নামাজে দাঁড়ায় তখন মগ্ন হয় আল্লাহর প্রতি। পূর্ণ মনোযোগ দেয় সর্বশক্তিমানের দিকে। তারপর কখন জানি আচমকাই কীসের চিন্তা কীসের ভাবনা তাকে উদাসীন করে দেয়। অন্যমণস্ক হয় আল্লাহর থেকে। তখন আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আসমান থেকে আওয়াজ দেন, 'ইয়া ইবনি আদাম! ইলা মান্ তাল্তাফিৎ। ইলা মান হুয়া খায়রুম্ মিন্নী?'

হে বনী আদম তুমি আমার দিক থেকে মুখ ফেরালে কেন? তুমি কি আমার চেয়ে উত্তম কিছু পেয়েছ? আমার চেয়ে বেশি কী সৌন্দর্য তুমি পেলে? তুমি কাকে দেখছো? কার ভাবনা পেয়ে বসলো তোমাকে? যে তুমি আমার মতো দয়ালু কে ভুলে গেলে? বান্দা বিশ্বাস করো, আমার চেয়ে বেশি সুন্দর, বেশি উত্তম আর কিছু নেই। তুমি কার দিকে মুখ ফেরালে? বান্দা, তুমি আমাকে ছেড়ে কাকে দেখছো? আল্লাহু আকবার! আল্লাহু আকবার!

বলুন, স্বয়ং আল্লাহ্, স্রষ্ট নিজে তার বান্দার সাথে এমন অনুরোধ উপরোধ! আমাদের কাছে তার কী ঠেকা? কী প্রয়োজন আমাদের তার কাছে। কী মূল্য আছে তার কাছে আমাদের?

তবু আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বান্দাকে ডাকতে থাকেন। আল্লাহু আকবার! আশ্চর্য! তিনি মালিক হয়ে বান্দাকে ডাকতে থাকেন। সেই আল্লাহ! যাঁর এতো বড় মাহাত্ম ও পরাক্রম যে তিনি যখন জিব্রাইল আমিনের মতো এতো বড় ফিরিস্তা (যার মাথা সিদরাতূল মুনতাহা আর পা তাহতাস সারা আর দেহ গোটা দুনিয়া জুড়ে বিস্তৃত) কে ডাকেন, 'হে জিব্রাইল!' সাথে সাথে আসমানের উপর থেকে সাত জমিনের নিচ পর্যন্ত দীর্ঘ ও ছয়শত পাখা বিশিষ্ট সুবিশাল জিব্রাইল আলাইহিস সালাম; যার পায়ের আঙুল থেকে মাথার চুল পর্যন্ত পৌঁছাতে সাড়ে চোদ্দ হাজার বছরের পথ পেরুতে হয় তিনি ভয়ে প্রকম্পিত হয়ে একটা পাখির মতো কাঁপতে থাকেন। যার সামনে আসমান ঝুকে আছে, তারা মন্ডলী ঝুকে আছে। পাথর রয়েছে সিজদায়। পাহাড়গুলো তার সামনে ঝুকে রয়েছে সিজদায় রত আছে সমুদ্র সাগর, নদ নদী, খাল বিল, মহাসমুদ্র, গাছ পালা। এক একটা পাতা সিজদা করছে। যিনি রাহীম, ওয়াহহাব, রাজ্জাক, মালিকাল মুল্ক, রাহিমাল মাসাকীন, জুল জালালি অল ইকরাম,আর হামার রাহিমীন, মাতিন, আওয়ালুল আওয়ালিন, আখিরাল আখিরিন, আত তাওয়াব, জুল কুয়াতিল মাতিন, আল বার, ওয়াকিল, ওয়ালি-এত বড় গুণাবলীর আল্লাহ তায়ালা। যিনি কোন কিছুর সাহায্য ছাড়া গোটা বিশ্বজগৎকে একা একাই সৃষ্টি করেছেন। এমন পবিত্র মহামহিমান্বিত আল্লাহ তায়ালা পায়খানা পেশাব আর নাপাকি ভরা মানুষকে ডাকতে থাকেন।

'আরে বান্দা আমি তোর দিকে চেয়ে আছি আর তুই কার দিকে?'

'মানজা তুহা মাশহুম তুবা , আমারি গারিব!

'আরে! আমি তোর দিকে চেয়ে রয়েছি, তুই কাকে দেখছিস?'

তারপরও যদি বান্দা তার দিকে ফিরে না তাকায় তখন আল্লাহতায়ালা ডেকে বলেন আমার বান্দা তুই কাকে দেখছিস? আমার সৃষ্টিকে? না-না তুই আমার দিকে দেখ!

এবারও যদি বান্দা তার দিকে রুজু না হয় তখন আল্লাহ তায়ালা আবার বলেন, 'ও আমার বান্দা তুই কাকে দেখছিস? আমার সৃষ্টি। না-না তুই আমার দিকে ফিরে দেখ।

এখনও যদি বান্দা আল্লাহ রাব্বুল আলআমীনের দিকে মনোনিবেশ না করে তখন আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন, 'কী আশ্চর্য! আমার এই বান্দার দেখছি আমাকে কোন প্রয়োজন নেই!!

তো ভাই, এমন আল্লাহকে নিজেকে নিঃশেষ করে পেতে হবে। এমন আল্লাহ্র জন্যে বরণ করে নিতে হবে মৃত্যু কে।

এমন কারিম, রাহিম, শফিক, হান্নান, মান্নান, রাহ্মান, দাইয়ান আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক না করা; আর টাকা, পয়সা, ধন দৌলতের সাথে সম্পর্ক করা বা মন লাগানো কতবড় অন্যায়, কত বড় জুলুম! নবী ও পয়গম্বরগণ বান্দাদের এমন অন্যায় থেকে বের করে আনতেন। নবীরা কী করতেন?

এমন জুলুম বা অবিচার থেকে আল্লাহ্র বান্দাদের উদ্ধার করতেন। তারা বলতেন, ভাই, তুমি মালিককে চিনে নাও। তোমার স্রষ্টাকে চিনে নাও। ভাই, তাঁর সাথে সম্পর্ক করো যিনি তোমাকে পয়দা করেছেন। আল্লাহ্পাক নিজে বলেন–

'ইয়া আইয়্যুহাল ইনসানু মা গাররাকা বিরাব্বিকাল কারীম!'

'হে পথভোলা মানুষ! কী জিনিস তোমাকে দয়ালু প্রভুর ব্যাপারে ধোঁকা দিয়ে দিল! কেন ভুলে গেলি দয়ালু প্রভুকে।'

আল্লাহ্পাকের তো অনেক বড় বড় গুণবাচক নাম আছে; কিন্তু আল্লাহ্তায়ালা যখন কুরআনকে শুরু করলেন তো সবার পয়লা নিজের রবুবিয়াতের সাথে বান্দার পরিচয় করিয়েছেন।

'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন–

'সব প্রশংসা আল্লাহ্তায়ালার–'

আল্লাহ্ কে ? তিনি, যিনি সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক, রব! রাব্বিল আলামীন!

আল্লাহু আকবার! তিনি কিভাবে প্রতিপালন করেন? আল্লাহ্তায়ালা বলেন–

'শাররুহুম ইলাইয়া শায়িজ অ খায়রি ইলাইহিম নাজিল আক্লাওহুম ফি মাদাজিইল কাআন্নাহুম ইয়াম্ইয়াম আকুনি–'

'আমি তোমাদেরকে এমনভাবে প্রতিপালন করি যে, প্রতিদিন তোমার গোনাহ্ আমার কাছে আসে তবু আমার রহমতের দরোজা আমি খুলে দিই। আর আমি রাতের বেলা তোমাকে এমনভাবে ঘুম পাড়িয়ে দিই যে, যেন তুমি আমার কোন অবাধ্যতাই করোনি!'

নবী কী করেন? নবী আমাদের বলেন, আল্লাহ্র থেকে সবকিছু হয়। আল্লাহ্ই বাঁচান ও মারেন। তিনি ইজ্জত দেন, তিনিই অপমান করেন। কাজেই আল্লাহ্র দিকে এগিয়ে যাও। দৌড়ে চলো। তাঁর জন্যে মৃত্যুকে বরণ ও আপন করে নাও।

আল্লাহ্ কি রকম রাহ্মান, রাহীম, কারিম বা দয়ালু?

'ইন্ তাকার্রাব ইলাইয়া শিবরা–'

'তুমি এক বিঘত আমার দিকে এসো–'

'তাকার্রাবতু ইলাইহি জিরাআ–'

'আমি এক হাত এগিয়ে যাবো তোমার দিকে–'

'ইন তাকার্রাব্ ইলাইআ জিরাআ–'

'তুমি এক হাত এগিয়ে এসো–'

'তাকার্রাব্তা মিনহু বায়া–'

'আমি দু'হাত এগিয়ে যাবো–'

'ইন্ আতানি ইয়াম্শি–'

'তুমি চলতে থাকবে–'

'আতায়তুহু হারওয়ানা–'

'আমি তোমার দিকে দৌড়ে আসবো।'

তার মানে আল্লাহ্‌র রহমত বা দয়া দৌড়ে আসবে।

কত বড় কারিম, রাহমান, রাহিম, দয়ালু আল্লাহ্‌তায়ালা। বান্দা সামান্য উদ্যোগ নিবে তিনি দৌড়ে এসে তাকে বুকে জড়িয়ে নেবেন। সুবহানাল্লাহ।

তো ওই আল্লাহ্‌তায়ালাকে মন দেয়া এবং সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর প্রভাব দিল থেকে বের করা হচ্ছে সফলতার প্রথম সিঁড়ি।

আমি ওই আল্লাহ্‌তায়ালাকে মানবো। যিনি ছাড়া কেউ কিছু করতে পারে না, তিনি সবকিছু ছাড়া যাবতীয় কাজ সম্পাদন করেন। আমি বিশ্বাস আনবো আল্লার প্রতি তাঁর সমস্ত ক্ষমতা ও গুণাবলী সহকারে। তাঁর গুণবাচক নাম কি? রাহমান, রাহিম, কারীম, জাব্বার, হান্নান, মান্নান। তিনি দয়ালু, পরম করুণাময়। তিনি আমাকে ভালবাসেন মা'র চেয়ে। মা'য়ের ভালবাসার চেয়ে সত্তুরগুণ বেশি ভালবাসেন।

যে মায়ের একটা মাত্র ছেলে। চোখের তারা সে মায়ের। অন্তরের একমাত্র শান্তির কারণ সে। কলিজার টুকরা। কিন্তু ওই মাকেই ছেলে যখন একবার ডাকে 'মা-'। মা জবাব দেন 'জ্বি'। আবার ছেলে ডাকে 'মা'। 'জ্বি' – জবাব দেন মা।

ছেলে আবার ডাকে। মা জবাব দেন। আবার ডাকে ছেলে। মা জবাব দেন। ছেলে বার বার ডাকে। হঠাৎ বিরক্ত হয়ে যান মা। বলেন, 'মা' 'মা' ডেকে মাথা খাবি নাকি? চুপ কর্!

অথচ বান্দা যখন তার প্রভুকে ডাকে 'আল্লাহ্!'

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন সত্তর বার তার জবাব দেন। সুবহানাল্লাহ!

আবার ডাকে 'ইয়া আল্লাহ্!'

'লাব্বাইক ইয়া আবদি!'

'আমি হাজির আছি হে আমার বান্দা!' জবাব দেন আল্লাহ্। সত্তুর বার! আল্লাহু আকবার।

এই ভাবে বান্দা হাজার বার ডাকে। 'ইয়া আল্লাহ্।' সত্তুর হাজার বার জবাব দেন আল্লাহ্।

'লাব্বাইক' 'লাব্বাইক'---!

একটা ঘটনা আছে।

এক মূর্তিপূজক ছিল। সে আল্লাহ্‌তায়ালা সম্পর্কে কিছুই জানতো না। আমরা তো মুসলমান হিসাবে আল্লাহ্‌তালার জাত ও সীফাতকে জানি। তো সেই পূজারী পূজার ঘরে ঢুকে মূর্তিকে ডাকতো 'সানাম' 'সানাম'---।

সত্তর বছর ধরে সে ডাকলো। একদিন হঠাৎ। ফসকে ভুল একটা শব্দ বেরুলো তার মুখ থেকে। 'সামাদ'।

আসমান থেকে সাথে সাথে প্রতি উত্তর ভেসে এলো 'লাব্বাইক ইয়া আবদি!'

ফিরিশতারা আরজ করলো, 'হে আল্লাহ্! এই পূজারী তো আপনার সম্পর্কে জানেই না।'

'কিন্তু সে আমাকে ডেকেছে।' বজ্রনির্ঘোষে আল্লাহ্ বললেন।

'ভুল করে ডেকেছে, হে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন! তবু আপনি জবাব দিলেন?!'

'আরে ফিরিশতারা! আমি সত্তর বছর ধরে অপেক্ষা করছি কখন আমার এই বান্দা আমার নাম উচ্চারণ করবে। একবার মাত্র। আর সাথে সাথেই 'আমি হাজির বান্দা' বলবো। যদিও সে ভুল করে আমাকে ডাকে।'

হায় দুর্ভাগা মানুষ!

তুই চিনলি না তোর দয়াল মালিককে!

মালিক রাহমান, মালিক রাহীম, মালিক কারীম।

তিনি চান তাঁর বান্দার অন্তর আর কারো দিকে না পড়ুক। আর কারও দিকে না ঝুঁকে যায়। আমার এতো আদরের বান্দা সে যেন আমারই সৃষ্ট অন্য কোনও জিনিসকে মন না দিয়ে বসে।

আর আমরা।

আমরা আজ কোথায়?!

চার

এভাবে আল্লাহ্তালার প্রতিটি সীফাত বা গুণের সাথে পরিচিত হওয়া।

'আমান্তু বিল্লাহি কামা হুয়া বিআস্মাইহি অ-সীফাতিহি'।

'আমি ঈমান আনলাম আল্লাহ্তালার প্রতি ও তাঁর গুণাবলীর ওপর'।

আমাদের চিন্তা করতে হবে তাঁর নাম ও গুণাবলীর ওপর। রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,'তাফাক্কুরু শাআতিন খায়রুম মিন ইবাদাতি শানাতিন' 'এক ঘন্টার ধ্যান (আল্লাহর মহিমা সম্পর্কিত) ও চিন্তা এক বছরের ইবাদাতের চেয়ে উত্তম।'

কালামে পাকেও আল্লাহ্তালা অনেক জায়গায় তাফাক্কুর (ধ্যান-চিন্তা), তাদাব্বুর (অনুধাবন-উপলব্ধি), নাজার (পর্যবেক্ষণ) ও ই'তেবার (অনুধাবন) এর মাঝ দিয়ে উপদেশ নিতে হুকুম করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, একবার ক'জন সাহাবা (রাঃ) কোনও জায়গায় বসে আল্লাহ্তালার সত্তা ও অস্তিত্ব সম্পর্কে চিন্তা করছিলেন। এমন সময় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে এলেন। তিনি সাহাবা (রাঃ)দের চিন্তা-ভাবনার বিষয় বস্তু সম্পর্কে জানতে পারলেন। বললেন, 'তোমরা আল্লাহ্ তালার সৃষ্টি-নৈপুণ্য নিয়ে চিন্তা আর গবেষণা করো, তাঁর অস্তিত্ব নিয়ে ভেবো না। কারণ,তাঁর বিষয়ে চিন্তা করলে কোনও সার উদ্ধার করার ক্ষমতা তোমাদের নেই। তাছাড়া তাঁর মর্যাদা সম্পর্কে উপলব্ধি করতে তোমরা সক্ষম হবে না। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা বলেছেন, 'একবার রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গভীর রাতে নিরিবিলি নামাযে মগ্ন থেকে কান্নাকাটি করছিলেন। আমি আরজ করলাম,"ইয়া রাসুলাল্লাহ্! আল্লাহ্তালা তো আপনার সব রকম গোনাহই মাফ করে দিয়েছেন; তারপরও আপনি কেন এমন কাতর হয়ে কান্নাকাটি করছেন?" হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "দেখ আয়েশা, না কেঁদে আমি কেমন করে থাকতে পারি? যখন তিনি আমার ওপর এই আয়াত অবতীর্ণ করেছেন-

'ইন্না ফি খালকিস্ সামাওয়াতি অল্ আরদি অখতিলাফিল লাইলি অন্ নাহার লি আয়াতিল লি উলিল আল্বাব্।' 'নিশ্চয়ই, আসমানগুলো আর জমিনের সৃষ্টির মাঝে আর দিন-রাত্রির পরিবর্তনের মধ্যে বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীল লোকের জন্যে অনেক নিদর্শন জড়িয়ে রয়েছে।'

তারপর তিনি (সাঃ) আরও বললেন , 'যে মানুষ এই আয়াত পড়ে বর্ণিত জিনিস গুলোর ওপর চিন্তা ভাবনা না করে তার জন্যে দুঃখ।'

হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে লোক জিজ্ঞেস করেছিল,' হে রুহুল্লাহ! এই ভূপৃষ্ঠে [illegible] আর কেউ আছে কি?'

'আছে,' উত্তরে তিনি বললেন,'সে, যার মুখের কথা শুধু আল্লাহতালার স্মরণের জন্যে উচ্চারিত হয়। আর তার চুপ থাকা কেবল আল্লাহ তালার মহিমা ভাবার জন্যে হয়। আর তার দেখা শুধু দৃষ্ট জিনিস থেকে উপদেশ নেয়ার জন্যে হয়ে থাকে। সে জন আমার বরাবর।'

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তোমরা ইবাদাতে নিজেদের চোখকে শরীক করাও।'

সাহাবা (রাঃ) গণ জিজ্ঞেস করলেন,'হে আল্লাহ্র রাসুল! চোখকে আবার কেমন করে ইবাদাতে শরীক করবো?' তিনি (সাঃ) বললেন,'কোরআন শরীফ চোখের সামনে রেখে দেখে দেখে তিলাওয়াত করো। আল্লাহ তা'লার বাণীগুলোর অর্থ ও মর্ম সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করো আর যে সব বিচিত্র ভাষা ও ঘটনার কথা রয়েছে তা থেকে উপদেশ নাও।'

হযরত দাউদ তাঈ (কুদ্দিসা সিররুহু) একদিন রাতে নিজ ঘরের ছাদে উঠে আকাশলোকের বিচিত্র কারুকার্য ও সৃষ্টি-নৈপুণ্য সম্পর্কে ধ্যান মগ্ন হয়ে ব্যাকুল চিত্তে কান্নাকাটি করছিলেন। কাঁদতে কাঁদতে এক সময় জ্ঞান হারিয়ে প্রতিবেশীর বাড়ির মধ্যে পড়ে গেলেন। পতনের শব্দে প্রতিবেশীর ঘুম ভেঙে গেল। তারা ভাবলো চোর পড়েছে। গৃহস্বামী তাড়াতাড়ি তলোয়ার হাতে সেখানে এসে পড়লেন। দাউদ তাঈ (রঃ) কে দেখে তিনি অবাক। সসম্ভ্রমে জিজ্ঞেস করলেন, 'কে আপনাকে এখানে ফেলে দিল?'

তিনি শুধু বললেন,'জানি না।'

জগতের প্রভু আল্লাহতা'লা মানুষকে অজ্ঞানতা ও মূর্খতার অন্ধকারে ঢেকে সৃষ্টি করেছেন। হাদীস শরীফে আছে,' খুলিকাল খাল্কু ফি জুলমাতিন সুম্মা রুস্সা আলাইহিম মিন্ নুরীহি।'অর্থাৎ মানুষ অজ্ঞানতা ও মূর্খতার আঁধারের মধ্যে সৃষ্ট হয়েছে। তারপর তাদের ওপর আল্লাহতালা আলো বর্ষণ করেছেন। পথিক যেমন অন্ধকারে পড়ে গেলে আলো জ্বেলে পথ দেখে নেয় তেমনি অন্ধ মানুষের মাঝে আলো জ্বলে ওঠে যখন সে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের সত্ত্বা ও গুণাবলী সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা, আলোচনা করে ও শোনে।

আল্লাহর জাত ও সীফাত সম্পর্কে আলোচনা বলা ও শোনার দ্বারা তিন ধরনের ফল পাওয়া যায়।

(১) মারেফাৎ বা তত্ত্বজ্ঞান, (২) হালাত বা মনের পরিবর্তন, (৩) আমল বা কর্ম ।

তত্ত্বজ্ঞানের আলোতে মনের পরিবর্তন হয়। তখন সে উদ্দীপ্ত হয় নেক কর্মপ্রচেষ্টায়।

আল্লাহ্তালা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে মানুষের বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি তত উঁচু পর্যায়ে পৌছুতে পারে না। মানুষ আল্লাহ্তালার অস্তিত্ব ও সত্ত্বা সম্পর্কে চিন্তা করার কোনও পথই খুঁজে পায় না। এই জন্যেই আল্লাহ্তালা বলেন–

'ফাইন্নাকুম লান তাক্বদীরু ক্বাদরাহু।'

'নিশ্চয় তোমরা কখনও আল্লাহ্তালার অপার মহিমা উপলব্ধি করতে পারবে না।'

আল্লাহ্তালার প্রতাপ ও মহত্বের জ্যোতি সীমাহীনভাবে উজ্জ্বল ও প্রখর। এদিকে মানুষের জ্ঞান-চক্ষুর ধ্যান-চিন্তার ক্ষমতা খুবই দুর্বল। কাজেই সেই তীব্র উজ্জ্বলতা ও প্রখর দীপ্ত মহিমা ও প্রতাপ সম্পর্কে চিন্তার ক্ষমতা মানুষের নাই। বরং তাতে জ্ঞান-চক্ষু ঝলসে যায়। অন্ধ হয়ে যায়।

সেজন্য আমাদের আলোচনা আল্লাহ্তালার বিচিত্র সৃষ্টি নৈপূণ্য ও বিস্ময়কর শিল্প চাতুর্য নিয়ে। এর থেকে আমরা তাঁর বড়ত্ব, মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করতে পারবো। বিশ্বজগতে যত বিস্ময়কর ও বিচিত্র সৃষ্ট পদার্থ রয়েছে সবই তাঁর সীমাহীন ক্ষমতা ও অপার শ্রেষ্ঠত্বের আলোকমালা থেকে ছিটকে পড়া একটা কণার মতো। সেজন্যেই আল্লাহ্তায়ালা বলেন, 'কোল্ লাও কানাল বাহ্‌রো মিদাদাল্ লিকালিমাতু রাব্বি লানা ফিদাল্ বাহ্‌রু কাব্‌লা আন্ তান্‌ফাদা কালিমাতু রাব্বি; অলাও জিনা বিমিস্‌লিহি মাদাদা।'

'হে মুহাম্মদ! (সাঃ) আপনি মানুষকে বলে দিন, যদি সব সমুদ্রের পানি লেখার কালি হয় আমার প্রভুর বিচিত্র সৃষ্টি-নৈপূণ্য ও অপার মহিমা লিখে শেষ করার জন্যে, তাহলে সমস্ত

সমুদ্রের পানিই নিঃশেষ হয়ে যাবে, আমার প্রভুর মহিমা-কীর্তন শেষ হবার আগেই। যদিও আমি আবার সব সমুদ্রের পানি কালি করে দিই তবু সব কালি ফুরিয়ে যাবে কিন্তু আমার প্রভুর মহিমা বর্ণনা শেষ হবে না।'

এই বিশ্বজগতে যত ধরনের সৃষ্ট পদার্থ রয়েছে সবই আল্লাহ্তালার সৃষ্টি শিল্প। জগতের সব সৃষ্ট পদার্থই অতি বিস্ময়কর ও আশ্চর্যজনক। গোটা বিশ্বের যাবতীয় পদার্থ, আসমান ও জমিনের প্রতিটি বালুকণা নিজ নিজ ভাষায় সৃষ্টিকর্তার প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করছে। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের অসীম ক্ষমতা ও অনন্ত জ্ঞানের অবিরাম গুণ-কীর্তন করে চলেছে। আল্লাহ্তালা বলেন-'অইম্ মিন্ শাইয়্যিন ইল্লা ইয়ুসাব্ বিহু বিহামদিহি অলা কিল্লা তাফকাহুনা তাসবিহাহুম০' 'সৃষ্ট বস্তুর সব্বাই প্রশংসা করে চলেছে তাদের সৃষ্টিকর্তার। কিন্তু তোমরা তাদের প্রশংসার ভাষা বোঝনা।'

সৃষ্টিজগতের যেদিকে তাকাও সব কিছু অপার বিস্ময়ে ভরা। অবাক আর আশ্চর্যময়! জগতের বিস্ময়কর পদার্থ এতো অপরিসীম যে, কোনও বর্ণনাকারীই তা আলোচনা করে শেষ করতে পারবে না। এমন কি জগতের সব সমুদ্র, নদী ও জলাশয়ের পানি যদি লেখার কালি হয় এবং ভূ-পৃষ্ঠে জন্মানো সব বৃক্ষ-রাজি যদি কলম হয় আর জগতের সব প্রাণী যদি লেখক হয় আর অনন্তকাল ধরে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের গুণ-কীর্তন লিখতে থাকে তো সমস্ত পানি শেষ হবে, কলম নিঃশেষ হবে, প্রাণীরা মরে যাবে তবুও তাঁর প্রশংসা ও মহিমা, বিচিত্র সৃষ্টি কৌশল ও বিস্ময়কর শিল্প নৈপূণ্যের যথার্থ অবস্থা খুব সামান্যই লিখতে পারবে।

আল্লাহ্তালার বিচিত্র সৃষ্টি ও মহিমার কোনও পার না থাকলেও; সৃষ্ট বস্তুকে মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করা যায়। তার মাঝে এক দল সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না। এ ব্যাপারে আল্লাহ্তালা বলেন-

'সুব্হানাল্লাজি খালাকাল আজওয়াজা কুল্লাহা মিম্মা তুম্‌বিতুল আরদু অমিন আনফুসিহিম অমিম্মা লাইয়ালামুন০' 'আল্লাহ্তালা পবিত্র, যিনি সমস্ত বস্তুকে বিপরীত জাতীয় জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন-জমিন থেকে উদ্ভূত উদ্ভিদ এবং মানব জাতিকেও। আর সেই সব বস্তুকে যার সম্পর্কে মানুষ জানে না।'

আর এক ধরন সম্পর্কে আমরা জানতে পারি। যে ভাগটির ব্যাপারে আমরা জানতে পারি তার আবার দু'টো রকম। এক রকম আমরা চোখে দেখতে পাই না। যেমন-আর্‌শ, কুরসী, ফিরিশতা, দৈত্য-দানব, জ্বিন-পরী। এই শ্রেণী সম্পর্কে চিন্তা করার ধারা খুব কঠিন। আর যে ধরনের সৃষ্টি আমরা চোখ দিয়ে দেখতে পাচ্ছি, সে সম্পর্কে আমাদের আলোচনা।

যে সব বিচিত্র সৃষ্টি বাইরের চোখ দিয়ে দেখা যায় তা এই-আসমান, সূর্য, চাঁদ, তারা, ও অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহ। ভূমন্ডল ও এর ভেতরের যাবতীয় পদার্থ। যেমন-পাহাড়, পর্বত, অরণ্য, সমুদ্র শহর, বন্দর। পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত মণিমাণিক্য, ভূগর্ভস্থ খনিজদ্রব্য। নানা জাতের উদ্ভিদ।

আর মানুষ ছাড়া নানাধরনের স্থলচর, জলচর, খেচর ছোট বড় সব প্রাণী রয়েছে। এসব প্রাণীও পদার্থ সম্পর্কে চিন্তা করতে করতে শেষ পর্যন্ত নিজ সত্ত্বা ও অস্তিত্ব সম্পর্কে চিন্তা করতে পারে। মানুষই হচ্ছে সবচেয়ে বেশি বিচিত্র ও বিস্ময়কর সৃষ্টি। আল্লাহ্তালা বলেন, 'অ তুখ্‌রিজুল হাইয়্যা মিনাল মাইয়্যিতি, অ-তুখ্‌রিজুল মাইয়্যিতা মিনাল হাইয়্যি।' অর্থাৎ আমি জীবনের ভিতর মরণকে প্রবেশ করাই; মরণের ভিতর থেকে বের করে আনি জীবনকে।'

প্রতিদিন, প্রতিক্ষণ গোটা মানবসমুদ্র ও জীব জগতে মৃত্যু হানা দিচ্ছে। স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে জীবন। এটাতো স্থূল দৃষ্টিতেই আমরা দেখি। কিন্তু 'অতুখ্‌রিজুল মাইয়্যিতা মিনাল হাইয়্যি-' অর্থাৎ মরণের ভিতর জীবনকে কিভাবে প্রতিষ্ঠিত করছেন? এটা সূক্ষ্ম দৃষ্টি দেখছে। সূর্য, তার আলো। আপাতঃদৃষ্টিতে মৃত বা মরা। চাঁদের কিরণ! সেও মরা। মরা মাটি, মরা বীজ। সেখান থেকে মরা ফসল। মরা সীম, শাক, আলু, কফি, শালগম, গাজর, পিয়াজ, রসুন, আদা, মরিচ, লেবু, শসা, টমেটো ও অন্যান্য। মরা মাছ। মরা গোশ্‌ত। এগুলো রান্না করা হচ্ছে আগুনে। মরা জড় পদার্থে (কড়াই, হাঁড়ি)। এগুলো মানুষ খাচ্ছে, পান করছে।

হজম হচ্ছে; বর্জ্য পদার্থ পেসাব পায়খানার রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। তৈরি হচ্ছে রক্ত। হৃদপিন্ডের সঙ্কোচন ও প্রসারণের কারণে রক্ত সারা শরীরে ছুটো ছুটি করছে। তৈরি হচ্ছে সৃষ্টির অপার বিস্ময় বীর্য। বীর্যও মরা। কিন্তু এক আনন্দঘন রাত্রিতে পিতা-মাতার মিলনে মরা বীর্য প্রবেশ করছে মা'র জরায়ু থলিতে। আল্লাহ্তায়ালা বলেন, 'আওলাম ইয়ারাল ইনসানা আন্না খালাক্নাহু মিন্ নুত্ফাতিন্ ফাইজা হুয়া খাসিমুম্ মুবিন।' অর্থ্যাৎ 'মানুষ কি জানে না। যে তাকে এক ফোঁটা নাপাক পানি দিয়ে তৈরি করা হয়েছে তবুও তারা তর্কবিতর্ক করে!' অন্য জায়গায় আল্লাহ্তালা বলেন, 'আফরাআইতুম মা তুম্নুন; আ আনতুম তাখ্লুকুনাহু, আম নাহনুল খালিকুন।' 'তোমাদের ভেতর থেকে যে ছিটকে আসা পানি বেরিয়ে আসে, দেখেছো? ওগুলো কি তোমরাই তৈরি করো, না আমি তৈরি করে দিই?'

তো মরা বীর্য ঠাঁই পায় পিতার পিঠে।, মা'র বুকে। তারপর সেই পানি বিন্দুকে জন্মলাভের বীজ স্বরূপ করে দিয়েছেন। পিতা ও মাতার কামভাবকে প্রবল করে দিয়েছেন। রমণীর গর্ভাধারকে খেতস্বরূপ আর পিতার পিঠের পানিকে বীজ সদৃশ করেছেন। পিতা ও মাতার শুক্র যখন গর্ভে এসে মিলিত হলো, তখন তার নাম করা হলো 'নুতফাহ্'। গর্ভ সঞ্চার হওয়ার সাথে সাথেই গর্ভবতীর ঋতু রক্ত নিয়ে নুত্ফাহ্ ধীরে ধীরে বড় হয়ে রক্ত পিন্ডের আকার নেয়। এই অবস্থার নাম হলো 'আলাকাহ'। কিছুদিন পর সেই রক্তপিন্ড 'মুয্গাহ্' অর্থাৎ মাংস পিন্ডাকারে রূপ নেয়। সেটা ধীরে ধীরে মানুষের আকার নেয়। হাড়, মাংসপেশী আসে। তারপর আচমকাই একদিন তাতে জীবন দান করেন মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন। আল্লাহ্ বলেন, 'ইয়াশ আলুনাকা আনির রুহ্'- 'তারা জিজ্ঞেস করছে, রুহ কী?' আপনি বলে দিন,'কুলির রুহ্ মিন আম্রি রাব্বি'-'রুহ হচ্ছে আল্লাহ্ তালার একটা আদেশ মাত্র।'

এই তিনটি চল্লিশ দিনে তিনটি পর্যায় অতিক্রম করার পর প্রাণ আসে। তো সূর্যের আলো, চাঁদের কিরণ, মাটি, বীজ, ফসল, শাকসব্জি, মাছ, মাংস, রক্ত, বীর্য, শুক্র-এতসব মৃত জিনিস থেকে জীবনের সাড়া দেন?

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন।

মানুষের সৃষ্টিই হচ্ছে সবচেয়ে বিস্ময়কর। এছাড়া ভূমন্ডল ও আসমানের মধ্যবর্তী মহাশূন্যে অবস্থিত মেঘ, বৃষ্টি, শিলা, বজ্রপাত, মেঘগর্জন, বিদ্যুৎ, রঙধনু আর বায়ু প্রবাহের পরিবর্তন দেখার বিষয়। এসবই আল্লাহ্ তা'লার অমিত ক্ষমতা ও অপার মহিমার নির্দশন। তাঁর গৌরব ও প্রতাপের পরিচয়।

আল্লাহ্তায়ালা মানুষকে নির্দেশ দিচ্ছেন-'অকাআইয়্যিম মিন আয়াতিন ফিস সামাওয়াতি অল আরদি ইয়ামুদ্দুনা আলাইহা অহুম আনহা মু'রিদুন।'

'আসমান ও জমিনের মাঝে অনেক নির্দশন তাদের চোখের সামনে দিয়ে চলে যায় কিন্তু ওরা তা খেয়ালই করেনা; তারা বড়ই উদাসীন।'

আল্লাহ্ তাবারাকওয়া তায়ালা আরো বলেন, 'আওলাম ইয়ানজুরু ফি মালাকুতিস সামাওয়াতি অল আরদি অমা খালাকাল্লাহু মিন শাইয়্যিন।'

'তারা কি আসমান আর ভূপৃষ্ঠের রাজ্যগুলো সম্পর্কে এবং আল্লাহ্তায়ালা যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার মাঝে যা কিছু আছে তা নিয়ে চিন্তা করছে না?'

তিনি আরো বলেন, 'তুসাব্বিহু লাহুস সামাওয়াতিস সাবউ অল্ আর্দু অমান্ ফিহিন্না।'

'সাত আসমান ও সাত জমিনের মাঝে যা কিছু আছে সবই তার প্রশংসা ও গুণকীর্তনে মগ্ন রয়েছে।'

আল্লাহ্তালার অপার মহিমার প্রথম নির্দশন হচ্ছে মানুষ নিজেই।

এক ফোঁটা শুভ্ররং পানির সাথে রক্ত মিশিয়ে আর তাদের মিলনে দেহে কত ধরনের বিচিত্র পদার্থ যেমন-মাংস, চামড়া, শিরা, স্নায়ু ও হাড় ইত্যাদি সৃষ্টি হয়েছে। এই সব পদার্থের সহযোগিতায় কেমন সুঠাম, সুশ্রী অবয়ব তৈরি করেছেন। গোলাকার করেছেন মাথা, হাত-পা গুলো লম্বা লম্বা। ওগুলোর সামনের দিকে পাঁচটা করে আঙুল। দেহের বাইরের দিকে

চোখ, নাক, কান, মুখ, ঠোঁট, জিহ্বা। এছাড়া অন্য সব অঙ্গ-প্রত্যাঙ্গগুলো ঠিক ঠিক মতো সাজিয়ে দিয়েছেন।

দেহের ভেতরের দিকে প্রতিটি অঙ্গের আকার, প্রকার ও পরিমাণ আলাদা। প্রতিটির আকার, আয়তন আলাদা আর কাজও ভিন্ন। এসব প্রধান অঙ্গগুলোকে ভাগ করেছেন ক'টি ছোট ছোট অংশে।

প্রতিটি আঙুলে তিনটি করে 'পোর' (দুই গিরার মাঝের অংশ)। কিন্তু বুড়ো আঙুলের ক্ষেত্রে আবার অন্যরকম। সেখানে 'পোর' রয়েছে দু'টো। হাত ও পা উভয়েই।

প্রতিটি অঙ্গকে সৃষ্টি করেছেন মাংস, চামড়া, শিরা, স্নায়ু ও অস্থি দিয়ে।

চক্ষু-গোলকটি সুপারী আকারের। তাতে রয়েছে সাতটা আলাদা স্তর। প্রতিটি স্তরের কার্যকারিতা ও উপযোগিতা আলাদা। এর যে কোনও একটা স্তরের ক্ষমতা বা কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে গেলেই গোটা দুনিয়া আঁধার হয়ে যায়। কোন কিছুই আর দেখতে পাওয়া যায় না।

এরপর দেহের মাঝের হাড়গুলোর ব্যাপারে গভীরভাবে দেখুন-সূক্ষ্ম ও তরল পানি থেকে কেমন কঠিন ও মজবুত পদার্থ তৈরি করেছেন। প্রতিটি খন্ড ও গিরার আকার ও আয়তন আলাদা। কোনটা গোলাকার, কোনটা লম্বা। কোনও অংশ চওড়া, কোনও খন্ডের ভেতরে ফাঁকা। কোনটা আবার নিরেট, দৃঢ়। কিন্তু অস্থিগুলো আলাদা আকার, অবস্থা ও আয়তনের হলেও তাদের সবগুলোকে পরস্পর সংযুক্ত করে রাখা হয়েছে। অস্থিগুলোর প্রতিটির আয়তন, গঠন ও আকারের মধ্যে এক একটা আলাদা উদ্দেশ্য ও কৌশল রয়েছে। কখনও একটির মাঝে অনেক উদ্দশ্যে নিহিত আছে। দেহ-ঘরের খুঁটি হিসেবে অস্থিগুলোকে তৈরি করা হয়েছে। এগুলোর ওপর যাবতীয় অঙ্গের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে।

অস্থিগুলো যদি গিরা ও জোড়া বিশিষ্ট না হয়ে একটানা বিশাল হাড়ের আকারে সৃষ্টি করা হতো তাহলে পিঠ বাঁকানো বা নত করা সম্ভব হতো না। আবার যদি দেহের হাড়গুলো পরস্পর সংযুক্ত না হতো তাহলে পিঠ সোজা করা, পায়ের পাতার ওপর ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ানো যেতো না। কাজেই এই দু'ধরনের অসুবিধে দূর করতে অস্থিগুলোকে টুকরো টুকরো করে সৃষ্টি করেছেন। যাতে দেহের প্রতিটি অংশকে আমরা ইচ্ছে মতো বাঁকাতে বা নোয়াতে পারি।

আবার অস্থিগুলোকে পরস্পর ধমনী ও শিরার সাহায্যে সংযুক্ত করে পাতলা পর্দার আবরণে জড়িয়ে মজবুত করে দিয়েছেন, যেন তাদের ওপর ভর করে দাঁড়াতে পারে। প্রতিটি অস্থি টুকরোর এক দিকে চারটি করে গোল বর্তুলাকার দাঁত এবং অন্য দিকে ওই চারটা দাঁত ঢুকে বসতে ও নড়তে পারে এমন চারটা গর্তাকৃতি খাঁজ রয়েছে। এক প্রান্তের বর্তুলগুলো অন্য প্রান্তের গর্তাকারের খাঁজগুলোর মধ্যে ঢুকে সমানে সমান বসানো রয়েছে। যেন বাঁকা ও সোজা করার সময় প্রয়োজন মতো ঘুরতে পারে। অস্থিখন্ডের প্রান্তভাগের গোলাকার হাড়গুলো বের করে রাখা হয়েছে কনুইএর হাড়ের মতো। তাতে পেশী, শিরা, উপশিরা যেগুলো হাড়ের ওপর জড়িয়ে আছে সেগুলো আড়াআড়ি ভাবে থেকে হাড়ের সংযোগকে দৃঢ় রাখতে পারে।

এভাবে মাথার খুলি পঞ্চান্নটি হাড়ের টুকরোর সমন্বয়ে সৃষ্টি হয়েছে। ওগুলোকে পরস্পর জুড়ে দেয়া হয়েছে সূক্ষ্ম সেলাইয়ের সাহায্যে। এসব সংযোগের মাঝে অতি সূক্ষ্ম ফাটল রয়েছে। তাতে খুলির কোনও এক অংশে ব্যথা বা ক্ষত সৃষ্টি হলে তা অন্য ভাগে পৌছুতে পারে। তাই অন্য অংশগুলো নিরাপদে থাকে। এক অংশের উপর কোনও আঘাত লাগলে সেই অংশেই কষ্ট হয়। অন্য অংশগুলো নিরাপদ থাকে।

দাঁতের সৃষ্টি কৌশল সম্পর্কে চিন্তা করলে আরও অবাক হতে হয়।

কতগুলো দাঁতের আগা গোল ও চওড়া। এতে খাদ্যবস্তু চিবিয়ে খাওয়ার সুবিধে হয়। আর কতগুলো দাঁতের আগা পাতলা ও ধারালো। এগুলোর সাহায্যে খাদ্যবস্তুকে কেটে ছোট ছোট টুকরো করে পাশের চওড়া মাথা দাঁত গুলোর দিকে ঠেলে দেয়া হয়। চওড়া দাঁত কাটা টুকরো গুলোকে চিবিয়ে জিহ্বার সাহায্যে পাকস্থলীতে চালান দেয়। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন

হজমের জন্যে এই সুব্যবস্থা করেছেন। কী নিখুঁত তার সৃষ্টি। ছোট খাটো কোনও দিক তাঁর কুদরতি দৃষ্টি থেকে এড়ায় নাই।

এবার আসা যাক গ্রীবা দেশের বিচিত্রতার দিকে।

সাত টুকরো হাড়ের সংযোগে সৃষ্টি করা হয়েছে। সেগুলোকে মজবুত ও শক্ত করে দিয়েছেন শিরা, ধমনী ও স্নায়ু দিয়ে জড়িয়ে। গলার ওপর দিকের সাথে সংযুক্ত করেছেন মাথাকে। পিঠের মেরুদন্ডটিকে চব্বিশ টুকরো হাড়ের সংযোগে সৃষ্টি করে তার ওপর দিকে গ্রীবা বা গলদেশ স্থাপিত করেছেন। মেরুদন্ডের হাড়গুলোর সাথে পাশের দিকে পাঁজর বা বুকের হাড়গুলো এনে মিলিয়ে দিয়েছেন সুকৌশলে। এভাবে দেহের নানা জায়গায় আরও অনেক অস্থিখন্ড সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদের সব কটার ব্যাপার আলোচনা করা দীর্ঘ সময়ের দরকার।

মোটামুটি, দেহ-পিঞ্জরের মাঝে দু'শো সাতচল্লিশটা অস্থিখন্ড বিভিন্ন উদ্দেশ্যে নানান জায়গায় নানা কৌশলে সংযুক্ত করা হয়েছে। যাতে মানুষ তার ইচ্ছেমতো কাজ করতে পারে। যাই হোক, লক্ষ্য করুন, এতো সব বিচিত্র পদার্থ এক ফোঁটা অপবিত্র ও নিকৃষ্ট পানি থেকে তৈরি হয়েছে। এগুলোর এক একটা খন্ড এতো দরকারী যে, এক টুকরো বিকল বা নষ্ট হয়ে গেলে সমগ্র দেহ বিকল হয়ে যায়। আবার যদি সুচারু সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে সাজানো শরীরের কোথাও একটা অস্থিখন্ড বেড়ে গেলে দেহের শান্তি ও আরাম হারাম হয়ে যায়।

যেহেতু বিভিন্ন কাজ করার উদ্দেশে অস্থিখন্ড ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো নড়া-চড়া ও সঞ্চালন করার প্রয়োজন হয়; সেজন্যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোর মধ্যে সর্বমোট পাঁচশো সাতাশটি 'আ'যালাহ' বা মাংসপেশী সৃষ্টি করেছেন। মাংস পেশীগুলো মাছ আকারের। মাঝখান চওড়া ও পুরু। আগার দিকে ক্রমশঃ পাতলা ও সরু। এদের গঠন ও আয়তন আলাদা। কয়েকটি বড় ও ক'টি ছোট। প্রতিটি পেশী গোশ্‌ত, ধমনী ও পাতলা পর্দা দিয়ে তৈরি। পর্দাগুলো চাদরের মতো ওদের জড়িয়ে আছে। পাঁচশো সাতাশ টা পেশীর চব্বিশ টা চোখের চারদিকে রয়েছে। এদের সাহায্যে সব দিক থেকে চক্ষুগোলক, ভ্রু ও পাতাকে ইচ্ছে মতো ঘোরানো যেতে পারে। দেহের সব জায়গার পেশীর উপকারিতা, কার্য ও উপযোগিতা আলোচনা করতে গেলে রাত ফুরিয়ে যাবে।

দেহের মাঝে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তিনটি কেন্দ্রস্থল তৈরি করেছেন। সেখান থেকে অনেক নালী, প্রণালী বা শাখা প্রশাখা বের করে দেহের নানা জায়গায় ছড়িয়ে দিয়েছেন।

পয়লা কেন্দ্র মস্তিষ্ক।

এখান থেকে অনেক স্নায়ুসূতো নালী প্রণালীর মতো বের হয়ে দেহের নানা স্থানে জড়িয়ে রয়েছে। এদেরই সাহায্যে অনুভব শক্তি বা নাড়াচড়ার ইচ্ছা মস্তিষ্ক দেশে উৎপন্ন হয়ে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দিকে ছড়িয়ে পড়ে। মস্তিষ্কের কেন্দ্র থেকে এক গোছা মোটা সাদা রঙের রগ নদীর মতো বের হয়ে মেরুদন্ডের অস্থিগুলোর ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে তার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছেছে। মস্তিষ্ক থেকে বের হওয়া সেই নালী-প্রণালীর মতো স্নায়ুমন্ডলী যা গোটা শরীরে ছড়িয়ে রয়েছে তাদের সাথে ওই মেরু শিরাটির যোগাযোগ করে দেয়া হয়েছে। উদ্দেশ্যে এই যে, এর ফলে কোনও অঙ্গের স্নায়ু গুলো মস্তিষ্ক থেকে দূরে পড়বে না। বরং গোটা দেহের স্নায়ুমন্ডলীর সম্পর্কই মস্তিষ্ক কেন্দ্রের সাথে সমানভাবে জড়িয়ে থাকে। কোনও অঙ্গের স্নায়ু মস্তিষ্ক থেকে দূরে পড়লে সরবরাহের অভাবে ধীরে শুকিয়ে নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

দ্বিতীয় কেন্দ্র রক্তাধার বা কলিজা।

এখান থেকে অনেকগুলো রক্তবাহী শিরা ও উপশিরা বের হয়েছে। সেগুলো দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রতঙ্গে ছড়িয়ে ও জড়িয়ে রয়েছে। এসব শিরা-উপশিরার সাহায্যে রক্তাধারে পরিশোধিত খাদ্য-রস, গোটা দেহের পরিপুষ্টির জন্যে, প্রতিটি অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গে পৌঁছে যায়।

তৃতীয় কেন্দ্র অন্তকরণ বা হৃদপিন্ড।

এতেও অনেক ধমনী ও স্নায়ু রয়েছে। এগুলো কেন্দ্র থেকে বের হয়ে গোটা দেহের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এদের সাহায্যে জীবনী শক্তি হৃদপিন্ড থেকে বের হয়ে শরীরের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দিকে প্রবাহিত হয়।

দেহের এক একটি অঙ্গ সম্পর্কে গভীর ভাবে চিন্তা করি যে এই অঙ্গটি আল্লাহতায়ালা কিভাবে আর কী উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন; তো অবাক বিস্ময়ে নিথর হয়ে মহান রাব্বুল আলামীনের সীমাহীন ক্ষমতা ও দয়া উপলব্ধি করতে পারি।

সাতটি স্তরে তৈরি করেছেন তিনি চোখকে। কেমন সুন্দর গঠন ও বিচিত্র আকৃতিতে! এর আর অন্য কোনও বিকল্প ছিল কি? চোখের স্থান যদি কপালের মাঝখানে হতো! এই চোখের সৌন্দর্য নিয়ে কতো কবি কতো আবেগময় কবিতা রচনা করেছেন। একেক মানুষের একেক ধরনের চোখ। কারো ছোট, কারো বড়। কারো ভ্রু বাঁকা তরবারির মতো। কারো মাঝখানে দ্বিখন্ডিত। একজন নারীর চোখের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে কত পুরুষ পাগল হয়ে গেছে। চোখ যে আকর্ষণের অন্যতম অংশ তা আল্লাহতালা কালামে পাকেই বলেছেন। জান্নাতের হুরদের সৌন্দর্য কোটিগুণ বেড়ে যাবে তাদের আয়ত চক্ষুর কারণে। 'হুরুন্ ই'নুন কাআম্‌সালিল্ লুলু ইল্ মাক্‌নুন'- 'তারা বড় বড় চক্ষু বিশিষ্ট ও মণি-মুক্তা সদৃশ হবে।' কাজল কালো চোখ, হরিণী চোখ। চোখের তারার আলোয় কতো নারী কতো দুর্ধর্ষ পুরুষ, দিগ্বিজয়ী যোদ্ধাকে ঘায়েল করে দিয়েছে। কতো রাজা তার রাজত্ব ছেড়েছে চোখের ইশারায়।

আল্লাহতালা চোখকে ধুলো-বালি ও খড়কুটো থেকে সুরক্ষা করার জন্যে চোখের পাতাকে ঢাকনি হিসেবে তৈরি করেছেন। সেই পাতার কিনারে কতগুলো সোজা কালো রঙের লোম সাজিয়েছেন। এগুলোকে পাঁপড়ি বলে। এগুলো একদিকে যেমন চোখের শোভা ও সৌন্দর্য বাড়ায় তেমনি দৃষ্টি শক্তি অনেক প্রখর করে। এছাড়া পাঁপড়িগুলো সোজা হবার কারণে ধুলো-বালি উড়লে সহজে চোখকে বন্ধ করে নেয়া যায়। তাতে তোমার চোখে ধুলো-কুটো পড়েনা। পাঁপড়ি সোজা ও কালো হওয়ায় ওগুলোর ফাঁক দিয়ে তুমি অনায়াসে সামনের দিকের সবকিছুই পরিষ্কার দেখতে পাও। কালো না হয়ে অন্য কোনও রঙের বা নিচের দিকে বাঁকা হলে তোমার দৃষ্টি বাধা পেতো। পাঁপড়ি গুলি সামনের দিকে সোজাভাবে ছাউনির মতো ঢাকা; এজন্যে ওপর থেকে খড়কুটা বা তেমন কিছু পড়লে বাধাপ্রাপ্ত হয়।

চক্ষুগোলক আর তার সাথের জিনিসগুলো আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের বিচিত্র সৃষ্টি কৌশল ও আশ্চর্য শিল্প-নৈপুণ্য। কিন্তু এর চেয়ে আরও আশ্চর্য কারিগরী এবং অসীম ক্ষমতার নিদর্শন এই যে, চোখের মণি। এগুলো দু'তিনটে মসুর বীচের পরিমাণ। কিন্তু এর দেখার ক্ষমতা দিগন্ত বিস্তৃত গগনমন্ডল আর সুবিশাল ভূমন্ডল। আকাশ এতো ওপরে, এতো দূরে কিন্তু পলকে তা পরিষ্কার দেখে ফেলছে নয়ন মণি। একটুও দেরি হয় না। সামনের দৃষ্টিতে চোখের দেখার বিচিত্র ব্যবস্থা, আয়নায় ফুটে ওঠা ছবি দেখার অবস্থা, এছাড়া বাস্তব অবাস্তব আকার দেখার তথ্য বলতে গেলে সারা রাত ফুরিয়ে যাবে।

এবার কান সম্পর্কে ভাবুন।

আল্লাহ্‌তালা কানকে সৃষ্টি করে তার প্রবেশ মুখে এক ধরনের কটু-স্বাদের ময়লা সঞ্চিত থাকার ব্যবস্থা করেছেন। সেই কটু গন্ধ ও বিস্বাদ ময়লার জন্যে কোনও ধরনের কীট কানে ঢুকতে পারে না। আবার দেখুন কানের রন্ধ্র পথটা শামুকের উদর পথের মতো ঘোরালো করে তৈরি করেছেন। তাতে বাইরের শব্দ ওই প্যাঁচের মাঝে বাধা পেয়ে ধীরে প্রগাঢ় ও গম্ভীর হয়। শেষে উঁচু আওয়াজ কর্ণ-কুহরে ঢোকে। আকৃতিটি ফানেলের মতো হওয়ার কারণে শব্দ একসাথে প্রবেশ করে কানের পর্দার ক্ষতি করতে পারে না। রন্ধ্র পথটা প্যাঁচালো হওয়াতে ঘুমন্ত অবস্থায় পিঁপড়া বা পোকা একবারে শেষ মাথায় পৌছুতে পারে না। ঘোরানো পথ পেরুতেই তার পায়ের আওয়াজ পেয়ে আমরা জেগে উঠি। তারপর প্রতিরোধে সমর্থ হই।

এভাবে মুখ, নাক ও অন্যান্য বাইরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আলোচনা করলে কয়েক রাত কেটে যাবে। এসব সম্পর্কে নির্জনে চিন্তা ভাবনা করলে মহা বিজ্ঞানময় আল্লাহ্‌তালার শিল্পচাতুর্য,

মহত্ব, দয়া, করুণা, জ্ঞান ও ক্ষমতার ব্যাপারে আমরা বুঝতে পারবো। আমাদের মাথা শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে তার প্রতি ঝুঁকে যাবে।

মাথা থেকে পা পর্যন্ত তাঁর সৃষ্টি বৈচিত্রের আশ্চর্যজনক ও বিস্ময়কর বিষয় তার অসীম ক্ষমতা, বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা মনে করে দেয়।

আল্লাহ্তায়ালা বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে বলেন 'অফি আনফুসিহিম আফালা ইয়ুবসিরুন।'

'তাদের নিজের অস্তিত্বের মাঝেও আল্লাহ্ তায়ালার অপার মহিমা ও মহান ক্ষমতার বহু নির্দশন রয়েছে; তারা কি চিন্তা করে না?'

শরীরের মাঝে অন্যতম অঙ্গ চোখ। সারা দুনিয়ার বর্তমান মানব সংখ্যা ছ'শো পঁচিশ কোটি। ছ'শো পঁচিশ কোটি জোড়া চোখ। কোনও জোড়া চোখের সাথে অপর জোড়া চোখের রঙ, আকার, আয়তন ও সৌন্দর্যে মিল হবে না। কাকতলীয় ভাবে যদি কোনটির মিল হয়েও যায় তা এক আধটা। তারপরও খুব সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখলে তাতে কোন না কোন অমিল পাওয়া যাবেই।

আরেকটি অঙ্গ হচ্ছে নাক। কারও নাক খাড়া, কারো বোঁচা, কারো টিকলো। ছ'শো পঁচিশ কোটি নাক আলাদা ভাবে চিহ্নিত করা যাবে।

তেমনি কান। কারো নিখুঁত, কারো জোড়া, কারো লতি বিচ্ছিন্ন, কারো লতি কানের সাথে সেঁটে গেছে। এমন মানুষও রয়েছেন যাঁর কানে শুধু দু'টো ফুটো!

তেমনি হাত, পা, আঙুল। সব আলাদা। স্রষ্টা এতোই দক্ষ, এতো বড় কারিগর, এমন নিপুণ আর নিখুঁত শিল্পী যে এতোগুলো মানুষের মাঝে মিল করে ফেলেননি। নিজের অক্ষমতার পরিচয় দেননি। এমন কোন ভাস্কর আছেন যাঁর সৃষ্টি এতো বিশাল। এতো বিভিন্নতা আর বৈচিত্রময় সৃষ্টি!

আঙুলে যে রেখা রয়েছে এতো সূক্ষ্ম। অথচ ছ'শো কোটি মানুষের বৃদ্ধাঙ্গুলির ছাপ হস্তরেখাবিদ বা ছাপ বিশেষজ্ঞ আলাদা করতে পারবেন। কারো সাথে অন্যের মিল হবে না। কেয়ামত পর্যন্ত যতো মানব সন্তান আসবে সবার ছাপ আলাদা হবে।

পাঁচ

এবার আসুন দেহের ভিতরের ব্যাপারগুলোতে।

এটা আরও বেশি বৈচিত্র্যময় ও বিস্ময়কর। বিশেষ করে মস্তিষ্ক। তার ভেতরে তৈরি হয়েছে বোধশক্তি ও অনুভব শক্তি। এর চেয়ে আশ্চর্যজনক সৃষ্টি আর কিছুই হতে পারে না। বুকের রক্তাধার, ও শ্বাস-প্রশ্বাসের কারখানা ও পেটের মাঝের কাজগুলো আরো বৈচিত্রময়। মহামহিমান্বিত স্রষ্টা উদরের ভেতর পাকস্থলীকে ডেগচির মতো করেছেন। পেটের ভেতরের উত্তাপে পাকস্থলী সবসময় চুলোর ওপর রাখা পাত্রের মতো টগ্‌বগ করে ফুটছে। খাদ্যদ্রব্য পাকস্থলীতে পৌছা মাত্র সেই উত্তাপে পরিপাক হয়ে যায়। সেখান থেকে খাদ্যরস দেহের অন্যান্য অংশের দিকে যাবার জন্যে বের হয়ে পড়ে। পথে কলিজা বা রক্তাধারে পৌছুলে ওই খাদ্যরস রক্তে পরিণত হয়। তারপর প্রবাহিত হয়। পথে রক্ত পিত্তকোষের মাঝ দিয়ে যাবার সময় পিত্তকোষ তাকে সংশোধিত করে তার ফেনিল অংশ, যাকে পিত্ত বলা হয়, ছেঁকে রেখে

দেয়। সেখান থেকে এই সংশোধিত রক্ত 'তিল্লী' বা প্লীহায় পৌছুলে আবার সংশোধিত হয় এবং রক্তের তলানি বা গাদ প্লীহা নামের পাত্রে থেকে যায়। সংশোধিত রক্ত ফের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অভিমুখে ছুটতে থাকে। পথে যকৃৎ নামের যন্ত্রটি রক্তের মাঝের জলীয় অংশকে আলাদা করে মূত্রকোষের দিকে পাঠিয়ে দেয়। বিশুদ্ধ রক্ত গোটা দেহের সর্বত্র পৌছে তাকে সবল করে তোলে।

এভাবে স্ত্রীলোকের পেটের বাচ্চাদানী এবং সন্তান উৎপাদনের যন্ত্রগুলিও বিশেষ বৈচিত্র্যময় ও আশ্চর্যজনক। আবার দেহের বাইরের ইন্দ্রিয়গুলোর কর্মশক্তি আর ভেতরের যন্ত্রগুলোর শক্তি, যেমন-দর্শন, শ্রবণ, বোধশক্তি, জ্ঞান ইত্যাদি যা আল্লাহতায়ালা মানুষকে দান করেছেন। তার প্রতিটি বিশেষ আশ্চর্যময় ও বিস্ময়কর। সুব্হানাল্লাহ! মানব দেহকে মহা-মহিমান্বিত স্রষ্টা কেমন অপার মহিমা ও বিচিত্র শিল্প নৈপুণ্যে তৈরি করেছেন।

কোনও চিত্রকর আচমকা কোন প্রাচীরের গায়ে কিংবা বিশাল ক্যানভাসে একটা সুন্দর চিত্র আঁকলে তার দক্ষতায় বিস্মিত হয়ে আমরা পঞ্চমুখে তার প্রশংসা শুরু করি। কিন্তু বিশ্বস্রষ্টা এমন সুনিপুণ শিল্পী যে একবিন্দু পানি থেকে মানব দেহ সৃষ্টি করে তার বাহির ও ভেতর কেমন বিচিত্র কারুকার্য বিস্ময়কর ভাবে সাজিয়েছেন-তা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করার অবকাশও আজ আমাদের নাই। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, চিত্রকরের হাত, কলম, তুলি ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি সবই দেখা যায়। কিন্তু সেই মহান, অলৌকিক বিশ্বশিল্পীর তুলি, কলম বা হাত কিছুই আমরা দেখতে পাই না। এমন মহামহিমান্বিত চিত্রকরের বৈচিত্র্যপূর্ণ ছবি দেখে তাঁর অসীম ক্ষমতা ও অপার মহিমার কথা ভেবে আমরা অবাক হইনা। এমন সুদক্ষ সুনিপুণ শিল্পীর অসীম ক্ষমতা ও অনন্ত জ্ঞানের কথা ভেবে আমরা কখনও স্তব্ধ, নিথর, দিশাহারা বা আত্মহারা হই না। তাঁর অসীম দয়া ও অপার করুণার কথা ভেবে আমরা বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হই না।

যিনি মাতৃগর্ভে আমার প্রতি এমন করুণা বর্ষণ করেছেন যে, তখন আমি খাবারের মুখাপেক্ষী ছিলাম আর যদি ক্ষুধা নিবারণের জন্যে মুখ খুলতাম তাহলে তখনি অতিরিক্ত ঋতু-রক্ত মুখ দিয়ে পেটে ঢুকে আমাকে ধ্বংস করে দিত। কিন্তু তখন আমার ক্ষুধা নিবারণের জন্যে কতো সুন্দর ব্যবস্থা করেছিলেন দয়ালু প্রতিপালক মহান রাব্বুল আলামীন। মুখ বন্ধ করে দিয়ে নাভিপথে নিতান্ত প্রয়োজন পরিমাণ খাদ্যরস পেটে পৌছে দিয়েছেন তিনি। যখন ভূমিষ্ঠ হলাম তখন আবার নাভিপথ বন্ধ করে মুখ খুলে দিয়েছিলেন। কারণ তখন মুখ দিয়ে খাবার গ্রহণ করলে আর কোনও ভয় ছিল না। মা তার নিজের বিবেচনা মতো সন্তানের প্রয়োজনীয় খাবার খাইয়েছেন।

আরও দেখার বিষয়, শিশু অবস্থায় শরীর ও পরিপাক শক্তি দুর্বল ছিল বলে কঠিন খাদ্য খাওয়ার বা হজম করার শক্তি ছিল না। তখন দয়ালু আল্লাহতায়ালা মায়ের দুধের মতো তরল ও সহজে হজম হয় এমন খাদ্যের ব্যবস্থা করেছিলেন। সেজন্যে ভূমিষ্ঠ হবার অনেক আগেই মা'র বুকে দুটো স্তন সৃষ্টি করেছেন। আর ঠিক জন্মলগ্নে ওই স্তনদুটোর মাঝে দুধ দিয়ে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। যেন সদ্যপ্রসূত শিশুটির কষ্ট না হয়। সেই স্তন দু'য়ের বোঁটার আয়তন শিশুর মুখের হাঁ অনুযায়ী সৃষ্টি করে দিয়েছেন। সেটা থেকে অতি সূক্ষ্ম অনেক নালী দিয়ে দুধ বের হওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। এমন ব্যবস্থা না করলে অতিরিক্ত দুধ শিশুর মুখে ঢলে পড়ে নষ্ট হতো। আল্লাহতায়ালা শিশুর মা'র বুকে এক ধারণাতীত শক্তি দান করেছেন যা ধোপার মতো কাজ করছে। কারণ যে সাদা রঙের দুধ বের হয়ে আসছে তা মা'র রক্ত ছাড়া আর কিছু না। মাতৃস্তনে লোহিত বর্ণের যে রক্ত এসে জমা হয়, বুকের ধোপার শক্তি তাকে ধুয়ে সাদা রঙের দুধে পরিণত করে। এছাড়া রক্তের স্বাভাবিক অপবিত্রতা দূর করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে শিশুর মুখে পাঠিয়ে দেন।

আবার দেখুন,

যখন আমি জন্ম নিলাম তখন আমার মা যে কষ্ট পেয়েছে তা মৃত্যুকষ্টের কাছাকাছি। এমন মা'কে দেখা গেছে যে, প্রসব বেদনায় কাতর হয়ে বিছানা ছেড়ে ছুটে পালাতে চেয়েছে। অনেক মা তো মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছে। প্রসব বেদনায় মুহ্যমান মা, তার বিছানার পাশে

এক বালতি রক্ত! কাজেই স্বাভাবিকভাবে এই মায়ের কাছে তার শিশুটি বড়ই অনাহুত। যে কষ্ট সে দিয়েছে তাতে অন্য কেউ হলে সে হতো তার জীবনের সবচেয়ে বড় দুশমন। কিন্তু স্রষ্টার অপার মহিমা যেখানে ঘৃণা, হিংসা, আর প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে ওঠার কথা। সেখানে শিশুটিকে দেখার সাথে সাথে সব যাতনা, সব বেদনা, সব ব্যথা, যন্ত্রণা আর কষ্ট মুহূর্তে উড়ে যায়। সেখানে জন্ম নেয় ভিন্ন এক অনুভূতি। তা হচ্ছে তীব্র মায়া! মমতা! মা পরম স্নেহে নাড়ী ছেঁড়া ধনটিকে বুকের মাঝে আঁকড়ে ধরে। সতর্ক হয়ে ওঠে তার দুর্বল শরীরের প্রতিটা স্নায়ু, প্রতিটা তন্ত্রী। কারণ শিশুটির নিরাপত্তা। পরম মমতার আধার করুণাময় আল্লাহতায়ালা তখনই তাঁর অসীম অলৌকিক ক্ষমতা দিয়ে বুকের অসংখ্য নালীর ভিতর দিয়ে বইয়ে দেন ঝর্ণা ধারা। সাদা, শুভ্র, পবিত্র অমিয়ধারা! কেঁদে ওঠা শিশুর মুখে ঠেলে দেয় স্তনের বোঁটা। শিশু শিউরে উঠে পরমানন্দে স্থির, নিথর হয়ে যায়।

ধীরে ধীরে শিশু বড় হয়।

মা মমতা, ভালবাসায়, অপত্য স্নেহে হয়ে ওঠে অন্ধ। দয়ালু আল্লাহ তাঁর দয়ার খাজানা থেকে ঢেলে দেন এই মায়া আর মমতা। শিশুর নিরাপত্তার জন্যে অতন্দ্র প্রহরী হয়ে ওঠে মা। মুহূর্তের জন্যে শিশু ক্ষুধার্ত হয়ে কেঁদে উঠলেই পড়িমড়ি ছুটে আসে আসে মা। অস্থির। ব্যাকুল। ছুটে এসে সাথে সাথে শিশুটিকে দুধ পান করায়।

দুধ পান করতে দাঁতের প্রয়োজন হয় না। কাজেই যতদিন শিশু দুধ পান করবে ততদিন তাকে দাঁত দেয়া হয় না। তখন মুখে দাঁত দিলে তা দিয়ে হয়তো সে তার মার বুক ক্ষত বিক্ষত করে দিত। সে জন্যেই শৈশবে বাচ্চার মুখে দাঁত বের হয় না। আবার যখন কঠিন খাবার খাওয়ার সময় হলো তখন শক্তিমতো ধীরে ধীরে দুটো চারটে করে দাঁত দেয়া শুরু হলো। শিশু দাঁতের সাহায্যে কঠিন খাবার চিবিয়ে খেতে পারলো।

যে ব্যক্তি এইসব বিচিত্র শিল্প নৈপুণ্য ও আশ্চর্যজনক সৃষ্টি–কৌশল দেখে তার সুদক্ষ শিল্পী ও সুনিপুণ সৃষ্টিকর্তার অণুপম শ্রেষ্ঠত্ব, অসীম ক্ষমতা ও অপার মহিমা চিন্তায় আত্মহারা না হয় তার চেয়ে অকৃতজ্ঞ, অজ্ঞান আর মূর্খ কে আছে?

স্রষ্টার পূর্ণ দয়া ও অপার করুণা এই সৃষ্টি বৈচিত্রের দেখে বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে যদি সে সুব্‌হানাল্লাহ্, আলহামদুলিল্লাহ্, আল্লাহু আকবার বলে চিৎকার করে না ওঠে তাহলে তার চেয়ে উদাসীন ও হতভাগা আর কে আছে?

স্রষ্টার অপ্রতিহত প্রতাপ, অনুপম সৌন্দর্য, শিল্প নৈপুণ্য দেখে তাঁর প্রতি আসক্ত না হয়, অণুরক্ত না হয়, আত্মসমর্পিত না হয়, তার কাছে মাথা নত করে 'আস্‌লামতু লিরাব্বিল আলামীন' না বলে তবে তার চেয়ে অন্ধ, বিমুখ ও পথভ্রষ্ট আর কে আছে?

আর যে এসব সৃষ্টি রহস্য ও নৈপুণ্য নিয়ে চিন্তা করে না, নিজের দেহের মাঝের বিচিত্র কারিগরি সম্পর্কে জল্পনা কল্পনা করে না, যাবতীয় সৃষ্টির সেরা হিসেবে যে জ্ঞান, শক্তি আল্লাহ্ তায়ালা তাকে দান করেছেন তাকে কাজে না লাগিয়ে শুধু সময় নষ্ট করে তার চেয়ে দুর্ভাগা আর কে আছে?

যে মানুষ শুধু এটুকু জানে ক্ষুধা লাগলে আহার করতে হয়, রাগ হলে শত্রুর সাথে ঝগড়া ও মারামারি করতে হয়; কিন্তু আল্লাহতায়ালার মারেফাৎ বা পরিচয় জ্ঞান মনোহর উদ্যান ভ্রমণের নেয়ামত থেকে পশুর মতো বঞ্চিত থাকে–সে ব্যক্তি আকৃতিতে মানুষ হলেও স্বভাবে ও প্রকৃতিতে পশু। আল্লাহতালা থেকে সম্পূর্ণ অমনোযোগী ও সংসার মোহে মত্ত, উদাসীন। সম্ভবত তার সম্পর্কেই আল্লাহতায়ালা বলেন, 'অলাক্বাদ জারানা লি জাহান্নামা কাসিরাম্ মিনাল্ জিন্নি অল্ ইনসি; লাহুম কুলুবুল্ লাইয়াফ্‌কাহুনা বিহা; অলাহুম আইউনুল্ লা ইয়ুবসিরুনা বিহা; অলাহুম আজানুল্ লা ইয়াশ্‌মাউনা বিহা; উলাইকা কাল্ আন্‌আমি বাল হুম আদাল; উলাইকা হুমুল্ গাফিলুন।'

'আর আমি সৃষ্টি করেছি দোজখের জন্যে অনেক জ্বিন ও মানুষকে। ওদের বিবেক আছে কিন্তু বিবেচনা করেনা। তাদের চোখ রয়েছে কিন্তু দেখে না। তাদের কান রয়েছে কিন্তু শুনতে পায় না। তারা চারপেয়ে পশুর মতো, বরং তার চেয়েও নিকৃষ্ট। এরাই হচ্ছে উদাসীন, অলস।'

আজ এখানে মানব দেহ সম্পর্কে যে আলোচনা করলাম তা মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের অপার বিস্ময়কর সৃষ্টি দেহতত্ত্বের আশ্চর্য বর্ণনার লক্ষ ভাগের এক ভাগও নয়। তা আলোচনায় আসা সত্যিই সুকঠিন।

নিজের দেহের বিচিত্র ও আশ্চর্যজনক ব্যাপারগুলোর চিন্তা শেষ করে যদি আরও এগুতে চাই তাহলে ভূমন্ডল সম্পর্কে ভাবতে পারি।

করুণাময় সৃষ্টিকর্তা কেমন সুন্দর করে জমিনকে পরিপাটি বিছানা আকারে আমার জন্যে সাজিয়েছেন। আল্লাহ্তালা বলেন-

'আলাম নাজআ'লিল্ আরদা মিহাদাঁও-'

'আমি কি করিনি জমিনকে বিছানা'?

জমিনকে আল্লহ্তা'লা চওড়া করেছেন। এত বড় যে কেউ সারাজীবন চলতে থাকলেও তার শেষ সীমায় পৌছুতে পারবে না। তরল পদার্থ সমন্বিত ভূমন্ডলের উপরিভাগকে কঠিন পদার্থ করেছেন। তাতে পা ফেলে আমরা চলা ফেরা করতে পারছি।

'অল জিবালা আওতাদা-'

'এবং স্থাপন করেছি পর্বত মালা পেরেক স্বরূপ-'

অস্থির, চঞ্চল ও কম্পিত মাটির ওপর জায়গায় জায়গায় পাহাড়-পর্বত দিয়ে পেরেকের মতো পুঁতে তাকে স্থির করেছেন। ফলে তা নড়া চড়া করে না।

তিনি বলেন, 'অ আন্‌জালা মিনাল্ মু'সিরাতি মা'আন সাজ্ জাজা;'

'আমি জলভরা মেঘরাশি থেকে দিই প্রচুর বৃষ্টিপাত-'

তিনি আকাশ থেকে বৃষ্টি দিয়েছেন আর কঠিন পাথরগুলোর নিচ দিয়ে বের করেছেন মানুষের পিপাসা মেটানোর পানি। পাথরের চাপে বাধা পেয়ে পানি অল্পে অল্পে, ধীরে ধীরে বের হয়। কঠিন ও ভারি পাথরের চাপে যদি পানির বেগ বাধা না পেতো তাহলে একবারে বের হয়ে দুনিয়ার সমস্ত সমতল ক্ষেত্রকে ডুবিয়ে দিত। উদ্ভিদের জন্যে অল্প পানি শুষে নেয়া উপকারী। এতে ওগুলো ধীরে ধীরে পুষ্ট হতে থাকে। সেক্ষেত্রে পানি দিলে যদি একবারে বেরিয়ে এসে ফসলের ক্ষেত আর উদ্ভিদগুলোকে ডুবিয়ে দেয় তাহলে একবারেই সব বিনষ্ট হয়ে যেত।

এবার ঋতু সম্পর্কে আলোচনায় আসি।

প্রচন্ড শীতের প্রকোপে জমিন মরে ফেটে চৌচির হয়ে যায়। বর্ষার আগমণে বৃষ্টি বর্ষণ শুরু হলেই সেই মরা ও শক্ত মাটি কেমন সজীব ও সরস হয়ে ঘাস, ফসল আর ফলে ফুলে সুশোভিত হয়ে ওঠে। হরেক রঙের ফুলের শোভায় ভূপৃষ্ঠ সাতরঙা রেশমি পোশাকের মতো সুন্দর ও সুদৃশ্য হয়ে ওঠে। সাত রঙ বলবো কেন? হাজার রঙের নকশা পায়। তখন অনেক রকমের উদ্ভিদ বিচিত্র কারুকার্য নিয়ে উৎপন্ন হয়। তাদের কোনটায় ফুল ফুটে রয়েছে, কোনটির শাখায় ঝুলে রয়েছে কলি। ফোটা, আর অর্ধ প্রস্ফুটিত প্রতিটি ফুলের আকার ও রঙ আলাদা। একটার চেয়ে অপরটি বেশি সুন্দর। কোনটা রঙে, কোনটা সৌরভে। কোনটি আবার দেখতে বেশি মনোহর, বেশি মুগ্ধকর।

তারপর নানা ধরনের ফল ও তাদের গাছ রয়েছে। তাদের সুন্দর আকার, স্বাদ, সৌরভ ও উপকারিতা আলাদা। হাজার ধরনের উদ্ভিদ ভূপৃষ্ঠ ভেদ করে উঠে আসছে যাদের নাম চিহ্ন পর্যন্ত আমরা জানি না। আল্লাহতায়ালা বলেন, 'আফারাআয়তুম্ মা তাহ্‌রাসুন; আ আন্‌তুম তাজরিউনাহু আম্ নাহনুজ্ জারিউন্।' 'তোমরা যে বীজ বপন করো তা দেখেছ কি? তোমরা তা উৎপন্ন করো না আমি করি?'

বীজ থেকে উৎপাদিত ফসলের মাঝে আল্লাতায়ালা দুর্লভ গুণাবলী সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তার মধ্যে কিছু কটু, কিছু মিষ্টি, কিছু টক। কোনটার এমন ক্রিয়া যে মানুষের দেহে অসুখ সৃষ্টি করে। আবার কতগুলোর গুণ এমন যে, রোগ দূর করে মানব দেহকে সুস্থ ও সবল করে তোলে। কোনটার গুণ এমন মহৎ যে, মরণাপন্ন ব্যক্তিকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করে। আবার কিছু এমন জঘন্য যে প্রাণ কেড়ে নেয়। কোনটা পিত্ত বৃদ্ধি করে, কিছু পিত্তের প্রাবল্য দূর করে শরীরকে সুস্থ করে দেয়। কোনটা দুষিত কফকে স্নায়ুমন্ডলীর ভেতরের

রক্ত থেকে বের করে রক্তকে পরিষ্কার সুস্থ করে দেয়। কোন উদ্ভিদের প্রতিক্রিয়া গরম, কোনটি শীতল। কোন তরুলতা মস্তিষ্কের শুষ্কতা বৃদ্ধি করে দেয়, কোনটা আবার আর্দ্র করে তোলে। কোনও গাছড়ার ক্রিয়ায় ঘুম উড়ে যায়, কোনটা আবার নিদ্রায় অভিভূত করে ফেলে। কোনও উদ্ভিদের গুণে মনে আনন্দ বেড়ে যায়; কোনটি আবার মনের দুঃখ ও বিষন্নতার কারণ হয়। কোনও উদ্ভিদ মানুষের খাবার, কোনটি আবার পশু-পাখীর।

হাজার হাজার ধরনের উদ্ভিদ আছে। তার মধ্যে হাজার ধরনের সৃষ্টি-বৈচিত্র্য রয়েছে। এসব নিয়ে চিন্তা করলে আমরা এমন এক অসীম শক্তির সন্ধান পাবো যে, সেই শক্তির সীমা পরিসীমা মাপতে গিয়ে গোটা বিশ্বের সমস্ত মানুষ দিশাহারা ও আত্মহারা হয়ে যাবে। সেই মহান ক্ষমতাধর সূক্ষ্মদর্শী সুনিপুণ শিল্পীর সৃষ্টি কৌশল ও ক্ষমতা নির্ণয় করা অসম্ভব। আল্লাহু আকবার!

মহা মূল্যবান খনিজ পদার্থসমূহ যা আল্লাহ তা'আলা পার্বত্য এলাকা ও ভূগর্ভে আমানত রেখেছেন। যে সব জায়গায় এসব পদার্থ আল্লাহ তায়ালা লুকিয়ে রেখেছেন সেগুলোকে খনি বা আকর বলে। এই খনিজ পদার্থ গুলোর মাঝে কতগুলো মানব দেহের সৌন্দর্য ও সৌষ্ঠব বৃদ্ধির জন্য আর কিছু তাদের সুখ-শান্তি বিধানের জন্যে। যেমন-সোনা, রূপা, মণি, হীরা, ফিরোজা, ইয়াকুত ইত্যাদি। আর কতগুলো তৈজসপত্র তৈরি করায় লাগে। যেমন-লোহা, তামা, পিতল, কাঁসা, রাঙ ইত্যাদি। আর কতগুলো বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। যেমন-লবণ, গন্ধক, আলকাতরা ইত্যাদি। এর মাঝে লবণ সবচেয়ে সুলভ ও সাধারণ পদার্থ। এর সাহায্যে খাদ্য-দ্রব্য পরিপাক হয়। কোন বস্তি বা জনপদে লবণের অভাব ঘটলে সেখানের সব রকম খাবার বিস্বাদ ও দুষ্পাচ্য হয়ে যায়। লবণ ছাড়া খাবার খেয়ে মানুষ পীড়িত হয়ে পড়ে এবং মৃত্যুর মুখোমুখি হয়।

কাজেই দয়ালু আল্লাহ্‌তালার দয়া ও করুণার প্রতি দেখুন-তিনি শুধু খাবার দেন নি। সেই খাবারে রুচি ও স্বাদ আনার জন্যে লবণের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। বৃষ্টির পবিত্র ও নির্মল পানি থেকে আল্লাহতালা তোমাদের জন্যে লবণ সৃষ্টি করেছেন। বৃষ্টির পানি ভূ-গর্ভে সঞ্চিত হয়ে আল্লাহতালার নির্ধারিত নিয়মে লবণে পরিণত হয়। এর চেয়ে অভাবনীয় ও বিস্ময়কর ব্যাপার আর কি আছে? আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'ইন্না জা আলনা মা আলাল আরদি জিনাতাল্লাহা।,' 'আমি ভূ-পৃষ্ঠের যাবতীয় জিনিস তৈরি করেছি পৃথিবীর সৌন্দর্যের জন্যে।'

এরপর রয়েছে ভূ-মন্ডলের সবরকম জীব-জানোয়ার, পশু-পাখি ও ইতর প্রাণী। এদের কিছু মাটির ওপর চলে, কিছু উড়ে বেড়ায়, কিছু দু'পেয়ে আর কিছু চার পায়ে ভর দিয়ে চলে। উড়ন্ত পাখি, পোকা আর রয়েছে ভূগর্ভে বাসকারী বিভিন্ন ধরনের কীট। এদের আকার, চরিত্র ও জীবন যাপন পদ্ধতি আলাদা। এক ধরনের প্রাণীর চেয়ে অন্যদল উত্তম। এদের জীবন ধারণ ও আত্মরক্ষার জন্যে যা প্রয়োজন পরম করুণাময় স্রষ্টা আল্লাহতায়ালা সব কিছুই এদের দান করেছেন।

প্রাণীগুলোর প্রত্যেকের জীবনযাপন, সন্তান লালন-পালন ও বাসস্থান নির্মাণের কৌশল ও নিয়ম শিখিয়ে দিয়েছেন। তার সাহায্যে তারা জানতে পেরেছে, কি উপায়ে জীবিকা অর্জন, কি পদ্ধতিতে নিজের আবাস তৈরি আর কি পদ্ধতিতে সন্তান প্রতিপালন করতে হয়।

সৃষ্টজীবের মাঝে সবচেয়ে ছোট প্রাণী পিপীলিকার প্রতি লক্ষ্য করে দেখি-তারা কেমন দক্ষতা আর দূরদর্শিতার সাথে এক নির্দিষ্ট সময়ে অবিরাম মেহনত করে গোটা বছরের খাবার সংগ্রহ করে রাখে। গমের বা ধানের বীজ পেলে তার দূরদর্শিতা দিয়ে বুঝে নেয় এটা আস্ত রাখলে কীট উৎপন্ন হয়ে শস্য খেয়ে ফেলবে-কেবল খোসা পড়ে থাকবে। সেজন্যে ওটাকে তারা দু'টুকরো করে রাখে। তাতে কোনও বীজ নষ্ট হয় না। আবার ধনে-বীজ পেলে তারা জানে এটাকে গোটা না রাখলে বিনষ্ট হয়ে যাবে। কাজেই তাকে টুকরো না করে গোটা রেখে দেয়।

মাকড়সার দিকে একবার লক্ষ্য করেন, কেমন অভিনব কৌশলে সে নিজের ঘর তৈরি করে। নির্মাণ কাজে তার দৃষ্টি সুতীক্ষ্ণ। ঘর তৈরিতে সূক্ষ্ম কাজগুলোর ওপর রাখে খেয়াল। তার নিজ মুখ থেকে বের হওয়া লালা দিয়ে তৈরি করে নেয় সূতা। একটা কোণ ঠিক করে

নেয়। এক দিকের দেয়ালের গায়ে সেই লালা দিয়ে তৈরি সূতো জমায় ভিত হিসেবে। তারপর অপর দিকের দেয়ালে নিয়ে যায়। এই কৌশলে প্রথমে টানার সূতোগুলো গেঁথে নেয়। এগুলো গাঁথা হয়ে গেলে তার উপর দিয়ে 'বানা' বা বুনটের সূতো চালিয়ে দেয়। দু'দিকের সূতো পারস্পরিক দূরত্ব সমান রাখে। জালের কামরাগুলো কোন জাগায় ঘন, কোন জায়গায় পাতলা করে না। একসূতো থেকে অপর সূতোর ফাঁক সমান রাখে। তাতে জাল দেখতে খুব সুন্দর হয়। শেষমেশ মাকড়সা দুই দেয়ালের কোণে মশা মাছি ইত্যাদি শিকার ধরার অপেক্ষায় একটি সূতোর সাথে ঝুলে পড়ে ওৎ পেতে থাকে। এই শিকার ধরেই মাকড়সা নিজ জীবিকা সংগ্রহ করে থাকে। এর মাঝে কোনও মশা বা মাছি জালে পড়লে মাকড়সা খুব দ্রুতগতিতে এসে ওই শিকারকে আক্রমণ করে। যে সূতোটার সাথে সে ঝুলেছিল সেটা দিয়ে শিকারের হাত জড়িয়ে বেঁধে ফেলে। আষ্টেপৃষ্ঠে। তাতে শিকারটি আর পালিয়ে যাবার সুযোগ পায় না। তখন তাকে ভান্ডারে জমা রেখে আবার নতুন শিকারের খোঁজে বসে থাকে। সতর্ক, সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে।

মৌমাছিগুলোর কাজ দেখুন–

ওরা কেমন সুন্দর কৌশল ও দক্ষতার সাথে নিজেদের বাসগৃহটিকে সমান ছয় কোণ বিশিষ্ট করে তৈরি করে। ঘরখানি যদি সম–ছয় কোণ বিশিষ্ট না করে সম–চতুষ্কোণ হতো তাহলে তাদের গোলাকার দেহ ফাঁকগুলো দখল করতে পারতো না। অনেকটা জায়গা বেকার পড়ে থাকতো। আবার যদি ঘরটি গোল হতো তাহলে ঘরগুলোর মাঝে অনেক বেশি ফাঁক থাকতো। সেক্ষেত্রে মৌচাক বৃথা হয়ে যেত। গোলাকার প্রাণীর জন্যে সম–ছয়কোণ বিশিষ্ট কোঠার মতো সামঞ্জস্যপূর্ণ আর কোন কিছু হতে পারে না। অথচ সম–ছয়কোণ বিশিষ্ট কোঠার আয়তন গোলাকার কামরার চেয়ে কম। এটা জ্যামিতি শাস্ত্র প্রমাণ করেছে। কাজেই মৌমাছি নিজের বাসগৃহ এমনভাবে তৈরি করে যাতে একটু স্থানও নষ্ট না হয়। চিন্তা করে দেখুন, এই ছোট প্রাণীর ওপর বিশ্ব–প্রভু আল্লাহ্ তা'লার কেমন অপার করুণা! তিনি কেমন সুন্দরভাবে বাসগৃহ নির্মাণের কৌশল এদের হৃদয়ে সৃষ্টি করে দিয়েছেন।

মৌমাছি।

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের বিচিত্র সৃষ্টির মাঝে আশ্চর্য এক প্রাণী।

খুবই ছোট আকারে। কিন্তু বুদ্ধিমত্তায় সে যে কোনও শিক্ষিত মানুষকে হার মানায়। তার কাজ কি? কিভাবে সে জীবন যাপন করবে সবই দয়ালু আল্লাহ্ তায়ালা তাকে শিখিয়ে দিয়েছেন। মৌমাছিকে দেখে আমরা একজন প্রকৌশলীকে মনে করতে পারি। আর সেই প্রকৌশলী সাধারণ কেউ নয়; অত্যন্ত তীক্ষ্ণধার মেধাবী, অসাধারণ একজন প্রকৌশলীর বুদ্ধির দীপ্তি তার ভেতর দেখতে পারি।

আবার মৌমাছির কর্মপ্রণালী দেখে একজন তীক্ষ্ণধি চিকিৎসককে কল্পনা করতে পারি।

মৌমাছি মধু সংগ্রহ করে।

ফুলের রস থেকে।

মধুর ভেতর মহা কৌশলী বিজ্ঞানময় আল্লাহ্তায়ালা মানুষের জন্যে রেখেছেন সুস্থতা। মৌমাছির জীবন–যাপন প্রণালী দেখলে দিশাহারা হয়ে যেতে হয়। বাসস্থান তৈরির কৌশলে, সেখানে অবস্থানের নিয়ম শৃঙ্খলায়, বাসা তৈরির পরিকল্পনায়, নিজেদের নিরাপত্তা ব্যবস্থায়, ফুল থেকে রস সংগ্রহ করায়–সবখানে তাদের শৈল্পিক নৈপুণ্য ও বুদ্ধির ছটা দেখতে পাওয়া যায়।

তারা কোথাও শিখলো এই লেখা–পড়া? স্বয়ং আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের পাঠশালায়। ফুলের খোঁজে বের হয় মৌমাছি। রস সংগ্রহ করে ফুলের বুক থেকে। ফিরে আসে বাসায়। বাসা থেকে বের হওয়া আর মধু সংগ্রহ করে ফিরে আসা এই তার কাজ। আধ কেজি মধু যোগাড় করতে একটা মৌমাছির কম করে হলেও পঞ্চাশ হাজার মাইল পাড়ি দিতে হয়। দূর দূরান্তে ছুটে চলে মৌমাছিরা মধু জোগাড় করতে। অনেক দূরের পথ পাড়ি দেয় কিন্তু তারা পথ হারায় না। গতিপথ ও তারা ভুল করে না। এক আশ্চর্য ব্যবস্থাপনা কায়েম করেছেন আল্লাহ্ তায়ালা এদের ভেতর। ফুল খোঁজে মৌমাছি। পেয়েও যায় এক সময়। হয়তো তখন

সে বাসা থেকে অনেক দূরে। ওখানে থেকেই ইথারের মাধ্যমে, বাতাসের ঢেউয়ে ভেসে আসে তার খবর। চলে আসে বাসার মৌমাছিদের কাছে।

মৌমাছির মাথার ওপরে রয়েছে দু'টো সরু শুড়। ওটা কাজ করে অ্যান্টিনার মতো। ও দু'টোই খবর পাঠানোর কাজে সহায়তা করে। ফ্যাক্স, দূরালাপণ বা টেলেক্স। এসব বিজ্ঞানের নতুন আবিষ্কার হিসেবে ধরা হয়। আর তা নিয়ে কৃতিত্বও ফলানো হয়। আসলে এতে কৃতিত্বের কিছুই নেই। এসব তো অনেক আগে থেকেই প্রচলিত রয়েছে প্রকৃতির বিভিন্ন ব্যবস্থাপনার মাঝে। হাজার বছর আগে থেকে মৌমাছিরা এসব পদ্ধতি ব্যবহার করছে।

যাই হোক,

মৌমাছি তার শুঁড় দুটো (অ্যান্টেনা স্বরুপ) নাড়াতে থাকে। তারা একটু হয়তো গাইলো, একটু নাচলো। ওদিকে খবর পৌঁছে গেল বাসায়। সেখানে আবার আলাদা ব্যবস্থা রয়েছে সংবাদ সংগ্রহের। তাতে কোনও বাধার সৃষ্টি হচ্ছে না। ঠিক ঠিক মতোই বাতাসে ভেসে আসছে খবর। অর্থাৎ মধু পাওয়া গেছে,তোমরা এসো।

এই খবরের ওপর নির্ভর করে রাণী মৌমাছির নির্দেশে সহযোগী মশারা উড়াল দিল বন্ধুর ঠিকানা অনুযায়ী। মাইলের পর মাইল পাড়ি দিয়ে ঠিকানা মতো ঠিক পৌঁছে যায় তারা। ওখানে জোগাড় করে মধু। ফেরার পথেও যাতে তারা পথ না হারায় সেজন্যে রয়েছে অভিনব ব্যবস্থাপনা।

বাসা থেকে পাঠানো হচ্ছে সংকেত। সময় মতো। 'ঠিক কতো মাইল দূরে আছো তুমি,' 'এখন পূবে না পশ্চিমে' 'এবার যাচ্ছো উত্তরে বা দক্ষিণে' 'বাসা তোমার এদিকে'। এমন সব দিক নির্দেশনার মাঝ দিয়ে বাসায় পৌঁছে যায় তারা।

সামান্য একটা ঠিকানা খুঁজে পেতে আমাদের লেগে যায় ঘন্টার পর ঘন্টা। ঠিকানা হারিয়ে ফেলি তো বার বার অন্যকে জিজ্ঞেস করতে হয়। 'ভাই, ওই ঠিকানাটা কোথায় বলতে পারেন?'

আমি লণ্ডনে বার বার গিয়েছি। বার বারই হারিয়ে ফেলি রাস্তা। একবার এদিক, একবার ওদিক। এভাবে ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে যাই। শেষমেশ অবশ্য পৌঁছে যাই।

কিন্তু মৌমাছিরা কোনও দিন তাদের যাত্রাপথ ভোলে না। হারিয়ে ফেলে না। সংগ্রহ হলো ফুলের রস। শেষ হলো ঘরে ফেরার পালা।

এবার চলবে পরীক্ষা নিরীক্ষা।

যেন দুর্গন্ধ বা রুগ্ন ফুল থেকে রস সংগ্রহে না আসে। কিছু মৌমাছি ঘরের চারদিকে পাহারা দেয়। এরা হচ্ছে অধ্যাপক বা বিশেষজ্ঞ। রস সংগৃহীত হবার আগে তারা পরীক্ষা করবে।

চিকিৎসক মৌমাছিরা দুষিত বা বিষাক্ত মধু সংগ্রহকারী মৌমাছি দেখেই টের পেয়ে যায়। তারা চমকে ওঠে। সাথে সাথেই ঝাঁপিয়ে পড়ে দুষিত মধু সংগ্রহকারীর ওপর। ডানা ছিঁড়ে ফেলে। তাকে মেরে নিচে ফেলে দেয়।

আপনারা খেয়াল করলে দেখতে পাবেন মৌচাকের নিচে পড়ে থাকে ডানা ছেঁড়া মৌমাছি।

এ জ্ঞান কে শেখালো ওদের?

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন!

আবার দেখুন, মশার মনে জাগিয়ে দিয়েছেন রক্ত খাবার তৃষ্ণা। তাদের জানিয়ে দিয়েছেন রক্ত তাদের খাদ্য। সেই রক্ত চুষে নেয়ার জন্য তিনি তাদেরকে দয়া করে একটি শুন্যগর্ত, তীক্ষ্ণ ও সূক্ষ্ম শুঁড় দিয়েছেন। মশা তার সেই সুতীক্ষ্ণ শুঁড় মানব দেহের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে রক্ত শুষে নেয়। এই ক্ষুদ্র প্রাণীটির ওপর আল্লাহ্ তা'লার আরও একটি অনুগ্রহ এই যে; তিনি এদের দু'টো হালকা পাতলা পাখা দিয়েছেন। আত্মরক্ষার জন্যে। মানুষ তাকে ধরার বা মারার চেষ্টা করা মাত্র সে টের পেয়ে যায়। পলকে পাখায় ভর দিয়ে উড়ে পালায়। ফের ঘুরে আসে একটা চক্কর দিয়েই। মশার যদি বুদ্ধি ও ভাষাজ্ঞান থাকতো তো এমন দয়ালু সৃষ্টিকর্তার করুণার জন্যে এতো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতো যে তা দেখে মানুষ বিস্ময়ে

হতবাক হয়ে যেত। মশার ভাষা নেই তাই তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও প্রশংসার কথা আমরা বুঝতে পারি না।

এসম্পর্কে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন–

'অলাকিল্লা তাফ্কাহুনা তাসবিহাহুম।'

'কিন্তু তোমরা তাদের তাসবীহ্ পাঠের ভাষা বুঝো না।'

আমার বন্ধু ও বুজুর্গ,

জীব জন্তু অসংখ্য। তাদের বিচিত্র সৃষ্টি এবং আশ্চর্যময় জীবন যাপনের শেষ নেই। সব জীব জানোয়ার তো দূরের কথা একটি প্রাণীর বা একটা আশ্চর্যময় ঘটনার যথাযথ জ্ঞান লাভ করা ও বর্ণনা করা অসম্ভব।

আপনি কি বলতে পারেন, এই অসংখ্য জীব–জানোয়ার, ইতর প্রাণী এমন বিচিত্র আকৃতি, মনোহর মূর্তি, সুডৌল অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ ও সুদৃশ্য গঠন কেমন করে অস্তিত্ব পেল? এরা কি নিজেরা এমন আশ্চর্য গঠনে সৃষ্টি করেছে; না, আমরা ওদের এমন সুকৌশলে সৃষ্টি করেছি? এই দু'টো জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজলেই মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের অসীম ক্ষমতার পরিচয় লাভ করতে পারি। কিন্তু মানুষ নিতান্তই উদাসীন ও অলস।

সুব্হানাল্লাহ্! কী অপূর্ব তাঁর মহিমা!

কী অসীম তাঁর ক্ষমতা!

যেসব চোখ দৃষ্টি শক্তি থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তালার সৃষ্টি নৈপূণ্যের ওপর চোখ রাখেনা তিনি তো ইচ্ছে করলে তাদের অন্ধ করে দিতে পারেন। কিন্তু তিনি তা করেন না। তিনি শুধু এমন করেন যে তারা চোখ থেকেও দেখে না। সংসারে এমন অনেক লোক আছে যারা বাইরের চোখ দিয়ে দেখে বটে কিন্তু অন্তরের চোখের সাহায্যে গভীর দৃষ্টিপাতের মাধ্যমে উপদেশ নেয় না। তারা শোনে কিন্তু বধির। শোনা থেকে শিক্ষা নেয় না। বরং জীব–জানোয়ারের মতো কেবল একটি শব্দ শোনে; অর্থাৎ বাক্যটির আওয়াজ শোনে মাত্র। তা থেকে নীতি উদ্ধার করে না। মাথা খাটিয়ে ঘটনা থেকে কোনও উপদেশ গ্রহণ করে না। এমন লোক সম্পর্কেই আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, 'অলাক্বাদ জারা'না লি জাহান্নামা কাসিরাম্ মিনাল জিন্নি অল ইন্স; লাহুম কুলুবুল লা' ইয়াফ্কাহুনা বিহা; অলাহুম লা ইয়ুব্সিরুনা বিহা; অলাহুম আজানুল্ লা ইয়াশ্ মাউনা বিহা; উলাইকা কাল আন্আমি বাল্হুম আদাললু; উলাইকা হুমুল গাফিলুন।'

'আর আমি সৃষ্টি করেছি দোযখের জন্যে অনেক জ্বিন ও মানুষ। তাদের অন্তর রয়েছে তারা বোঝেনা; তাদের চোখ রয়েছে, তারা দেখে না; আর তাদের কান রয়েছে তবু তারা শোনেনা। তারা চারপেয়ে পশুর মতো; বরং তার চেয়ে নিকৃষ্ট। এরাই হলো উদাসীন।'

গোটা সৃষ্টজগতের প্রতিটি সৃষ্ট পদার্থে, তার প্রতিটি কণায় মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ক্ষমতার, দয়ার, মমতার আর মহিমার যে বিচ্ছুরণ ফুটে বেরুচ্ছে তা দেখার; যে নিদর্শন লেখা রয়েছে তা পড়ার আর যে গুণগান ও প্রশংসা কীর্তন চলছে তা শোনার সময়, অবকাশ ও অনুভব শক্তি আজ আর আমাদের নাই।

একটা পিপীলিকার ডিম অতি ক্ষুদ্র পদার্থ। ধূলিকণার মতো। একটু গভীর ভাবে তার দিকে চোখ ফেললে, একটু কান পেতে শুনলে আমরা শুনতে পাবো সে বলছে, ওহে উদাসীন মানব! কোনও চিত্রকর যদি দেয়ালে বা ক্যানভাসে একটা ছবি বা নকশা আঁকে তোমরা তার শিল্প নৈপুণ্য ও দক্ষতা দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাও। পত্র–পত্রিকা, রেডিও–টেলিভিশনে আলোচনা করতে থাকো, শত মুখে তার প্রশংসা করতে থাকো। কিন্তু কই, আমার মহান দয়াল প্রভু পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালা রাব্বুল আলামীনের কোনো সৃষ্টি দেখে তাঁর প্রশংসায় তো মত্ত হতে দেখি না।

এসো, আমার কাছে এসো। আমাকে দেখো।

আমার মাঝে তুমি সৃষ্টিকর্তার অপার মহিমা, চিত্র চাতুর্য আর শিল্প নৈপুণ্য দেখতে পাবে। দেখো, আমি একটা বালি কণার চেয়ে বড় নই। অনাদি, অনন্ত, মহা শক্তিমান শিল্পী তাঁর লীলা খেলা আমার মাঝ দিয়ে শুরু করবেন।

আমার থেকেই একটা পিপীলিকা সৃষ্টি করবেন। ভেবে দেখো, এতো ক্ষুদ্র আমাকে কত অংশে ভাগ করবেন। এক অংশ থেকে তৈরি করবেন হৃদপিন্ড।

অন্য অংশ থেকে সৃষ্টি হবে মাথা, হাত, পা ও অন্য অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ।

আবার দেখো, আমার ক্ষুদ্র মাথাটির মাঝে ও মস্তিষ্কের ভেতর বেশ ক'টা কামরা ও ভান্ডার ভাগ করবেন। মস্তিষ্কের একটা কামরায় স্বাদশক্তি, অন্যটাতে ঘ্রাণ। আরেকটিতে শোনার শক্তি। এভাবে এক একটা কামরায় আলাদা ক্ষমতা ও শক্তির সৃষ্টি করবেন।

আমার মস্তিষ্কের বাইরের দিকে কয়েকটা পেয়ালা সদৃশ গর্ত সৃষ্টি করে তাদের ওপর অভাবনীয়ভাবে নানা ধরনের নকশা এঁকে দেবেন। তার সাথে আবার এই মাথার মাঝেই নাক, মুখ গহ্বর তৈরি করে আহার গ্রহণের জন্যে গলনালী বা পথ তৈরি করবেন। আমার এই ক্ষুদ্র কলেবর থেকেই দেহের বাইরে হাত, পা, ইত্যাদি অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ বের করবেন। আবার পেটের ভেতর এমন সব কামরা তৈরি করবেন যাদের একটাতে খাবার জমা হবে। আরেক কামরায় হজম হবে। আবার অন্য একটা পথ দিয়ে খাবারের অসার অংশটুকু বের হয়ে যাবে। পেটের ভেতর এসব কর্মকান্ডের জন্যে আলাদা আলাদা ধরনের যন্ত্রপাতি তৈরি করবেন।

আমার দেহের ভেতরে ও বাইরে এতো ধরনের জিনিস সংযোজিত হবার পরও আমার গঠন খুব হালকা ও আমার গতি খুব দ্রুত। আরও ভালো করে দেখলে বোঝা যাবে যে, আমার দেহের অবয়বটিকে তিনভাগে তৈরি করে বিশেষ নিপুণতার সাথে এক খন্ডকে অন্য খন্ডের সাথে জুড়ে দেবেন। চৌকিদারের মতো আমার কোমরেও দাসত্বের পেট বেঁধে দেবেন। চৌকিদারের কালো পোষাকের মতো আমার গায়েও কালো উর্দি চড়িয়ে দেবেন।

তারপর হে মানুষ, আমার গঠন ও সৃষ্টি পূর্ণ হলে যে দুনিয়াকে তুমি শুধু তোমার নিজেরই সম্পত্তি মনে করছো সেখানে বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ্‌ পাক আমাকে প্রকাশ করবেন।

তুমি যে সব পদার্থকে কেবল মাত্র তোমারই ভোগের জন্যে বলে ধারণা করছো সে সব নেয়ামতের মাঝে তোমার মতো আমিও চলাফেরা ও ভোগ করতে থাকবো। তোমরা মনে করে থাকো, পৃথিবীর যাবতীয় জীবজন্তু ও সব ধরনের পদার্থ শুধু তোমাদেরই সেবার জন্যে সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু আমি দেখতে পাবো, আল্লাহ্‌ তায়ালা গোটা মানবজাতিকে আমার সেবক ও খাদেম নিযুক্ত করেছেন।

তোমরা দিন–রাত অক্লান্ত মেহনত করে ভূমি কর্ষণ, বীজ বপন, পানি সেঁচ করে জমিনকে উর্বর করো। গম, ধান ইত্যাদি শস্য, বিভিন্ন ধরনের তরি–তরকারি তৈরি করবে। শাক–সব্জি উৎপন্ন করবে। সেগুলোকে ঠিক সময় মতো কেটে, শুকিয়ে, ভেঙে তার শাঁস গ্রহণ করে যে কোন সুরক্ষিত জায়গায় লুকিয়ে রাখবে। এবার দয়াময় প্রতিপালক আমার মত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র দাসকে জানিয়ে দেবে কোথায় রেখেছো তুমি ওগুলো। আমি মাটির নিচে আমার গর্তের মূল ঠিকানায় পৌঁছে যাবো। তারপর তোমার দীর্ঘ দিনের মাথার ঘাম পায়ে ফেলা সঞ্চিত শস্য আমি সামান্য মেহনতে দখল করে নেবো। এক বছরেরও বেশি সময়ের খাবার নিয়ে কেটে পড়বো খুব কম সময়ে।

তুমি সঞ্চয় করলে তা নানাভাবে অনেক অপচয় হবার ভয় রয়েছে; কিন্তু আমি এমন সুরক্ষিত ও নিরাপদ জায়গায় সতর্কতার সাথে জমিয়ে রাখবো যে তার সামান্য শস্যও নষ্ট হবে না। আবার দেখো, আমাদের সংগৃহীত শস্য শুকোবার দরকার হলে খোলা মাঠে জমিনের ওপর ছড়িয়ে রেখে দেব। ওদিকে বৃষ্টি আসার আগেই তার আগমনী বার্তা দয়াময় প্রতিপালক আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামিন আমাদের জানিয়ে দেবেন। আমরা অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সাথে ওই শস্যকে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাবো। সেখানে বৃষ্টির পানি পৌঁছুতে পারবে না। আমাদের সংরক্ষিত ফসলও নষ্ট হবে না।

কিন্তু হে মানুষ!

তোমরা এতই অজ্ঞ যে, যদি খোলা মাঠে শস্য স্তূপীকৃত করে রেখে দাও; ঠিক তখনি বৃষ্টি বা ঢলের পানি এসে পড়ে তবে তোমরা তা থেকে ফসলকে রক্ষা করতে পারো না। কারণ,

বৃষ্টি বা ঢলের আগমণ সংবাদ তোমরা আগেই জানতে পারো না। আচমকাই আসে পানি। শস্য নিয়ে যায় ভাসিয়ে। কিছুই করার থাকে না তোমাদের।

কাজেই আমি সেই মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের কৃতজ্ঞতা কেমন করে প্রকাশ করবো- যিনি আমাদের এমন সুখ স্বাচ্ছন্দের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তিনি, যিনি একটি তুচ্ছ বালু কণার মতো ডিম থেকে এমন সুন্দর, ক্ষিপ্র ও চতুর পিপীলিকা তৈরি করেছেন আর তোমাদের মতো এমন শ্রেষ্ঠ জীবকে এত জ্ঞান-গরিমা দেয়ার পরও আমাদের মতো সামান্য প্রাণীর সেবক করে দিয়েছেন, কেমন করে তাঁর শুকরিয়া আদায় করবো? কী ধরণের গুণগান তাঁর জন্যে গাইবো? তাঁর মহিমা কোন্ ভাষায় প্রকাশ করবো?

বন্ধু ও বুজুর্গ!

ছোট বড়, লম্বা বেঁটে প্রাণীদের মাঝে এমন কেউ নেই যে এভাবে আপন ভাষায় মহান সৃষ্টিকর্তার অপার মহিমা ও অসীম প্রতাপের প্রশংসা কীর্তন না করে। শুধু প্রাণীরা কেন? প্রত্যেক লতা-পাতা এমনকি জড় পদার্থগুলো বিশালাকার পবর্তমালা থেকে শুরু করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকণা পর্যন্ত বিশ্বপ্রভুর তাসবীহ্ পাঠ করছে, প্রশংসা বর্ণনা করছে। কিন্তু অন্যমণস্ক ও মোহাচ্ছন্ন মানুষ তা শুনতে পায় না।

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,'ইন্নাহুম আ'নিস্ সাম্ঈ লা মা'জুলুন০'

'নিশ্চয়, তারা (সৃষ্ট পদার্থ সমূহের তাসবীহ্) শোনা থেকে আনমনা বা অচেতন রয়েছে।'

আল্লাহ্ তালা আরও বলেন, 'অইম্ মিন শাইয়িন ইল্লা ইয়ুসাব্বিহু বিহামদিহি অলাকিল্লা তাফ্কাহুনা তাস্বিহাহুম।'

'যাবতীয় সৃষ্ট বস্তু তাঁর (আল্লাহ্ তালার) প্রশংসা সহকারে তাস্বীহ পড়ছে। কিন্তু তোমরা (হে মানব!) তাদের তাস্বীহ বুঝতে পারছো না।'

ছয়

এবার দয়াময় আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের অপার মহিমার প্রকাশ মহাসমুদ্রের কল্লোল ধারা সম্পর্কে আলোচনা করবো। একটা মহাসাগর সমগ্র ভূমন্ডলকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে। সাগর, উপসাগর, খাড়ি, নদ-নদী এসব থেকে বের হওয়া শাখা প্রশাখা বা এদেরই আলাদা আলাদা অংশ। এই স্থলভাগ সেই মহাসাগরের মাঝে অবস্থিত ক'টি দ্বীপ ছাড়া আর কিছুই নয়। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে-'মহাসমুদ্রের মাঝখানে স্থলভাগের দৃষ্টান্ত ঠিক তেমন যেন জমিনের উপর মাঝে মধ্যে কতগুলো আস্তাবল।'

পৃথিবীর জল যেমন স্থলের চেয়ে আয়তনে বড় তেমনি জলভাগের সৃষ্টি-নৈপুণ্য, তার মাঝে বিচিত্র ব্যাপার আর বিস্ময়কর জিনিসগুলোও স্থলের চেয়ে বেশি। এর কারণ এই যে, যত ধরনের জীব-জানোয়ার ও অন্যান্য জিনিস মাটিতে আছে তাদের উপমা জলের ভেতর তো রয়েছেই, তাছাড়াও এমন কিছু বিশেষ ধরনের জীব-জানোয়ার সেখানে রয়েছে যে যার নযীর স্থলে নেই।

সেই জলজ জানোয়ার ও জিনিসগুলোর আকার ও প্রকৃতি আলাদা। কিছু জলজ প্রাণী এতো ক্ষুদ্র যে খালি চোখে দেখাই যায় না; আবার কিছু জানোয়ার এতো বিশাল যে, সামুদ্রিক জাহাজ তার পিঠে ঠেকলে আরোহীরা মনে করে চড়ায় ঠেকেছে। যাত্রীরা স্থল মনে করে তার ওপর নেমে পড়ে। চলা ফেরা করে, ছুটাছুটি করে। এমনকি রান্নার কাজ শুরু করে দেয়। ক'দিন চলে যায়। হঠাৎ একদিন নড়ে ওঠে দ্বীপ। বিস্ময়ের ঘোর কেটে যেতেই শুরু করে ছোটাছুটি। প্রাণ ভয়ে ভীত, আতঙ্কিত মানুষ। সাগরের জলে তোলপাড় তুলে অদৃশ্য হয় বিশাল জলজ প্রাণী। এসব নিয়ে রচনা হয়েছে অনেক বই-পত্র। তার বিবরণ এতো অল্প সময়ে দেয়া সম্ভব না।

ভেবে দেখুন তো, সুনিপুণ স্রষ্টা আল্লাহ্ তায়ালা সাগরের অতল তলে এক প্রকার জীবন সৃষ্টি করেছেন। তাদের ওপরের খোলসকে ঝিনুক বলে। আল্লাহ্ তায়ালা তার মনে বৃষ্টি বর্ষণের সময় বোঝার জ্ঞান দিয়েছেন। বৃষ্টি বিন্দু পেটে ধারণ করে নেবার জন্যে তার মনের মাঝে সংবাদ দিয়ে দেন। বৃষ্টি শুরু হবে অনুভব করতে পারলেই ওরা সমুদ্রের লোনা পানির গভীর তলা থেকে সাগরের কিনারে এসে হাজির হয়। বৃষ্টির মিষ্টি পানি-বিন্দু পেটের ভেতর নেবার জন্যে উপরের দিকে মুখ খুলে পড়ে থাকে। কয়েক বিন্দু বৃষ্টির মিষ্টি পানি তার পেটে পড়লেই মুখ বন্ধ করে ফেলে। সেই বৃষ্টি বিন্দুকে শুক্রের মতো গর্ভে ধারণ করে মায়ের মতো সযত্নে রক্ষা করে। ঝিনুকের ভেতরের সেই বৃষ্টি বিন্দুকেই আল্লাহ্ তায়ালা অবশেষে মহামূল্যবান মুক্তায় পরিণত করেন।

অবশ্য ঝিনুকের পেটে বৃষ্টি বিন্দু মুক্তায় পরিণত হতে দীর্ঘ সময় নেয়। এগুলোর কোনটা ছোট, কোনটি বড়। সমুদ্রের অতল তলায় ডুবুরী নামিয়ে সেই মুক্তো আহরণ করা হয়। তা দিয়ে তৈরি নানা ধরনের অলংকার শরীরের শোভা বাড়ায়। তৈরি হয় সুখ শান্তির নানা উপকরণ।

মহান রাব্বুল আলামীন লাল রঙের পাথর দিয়ে সাগরের তলায় তৈরি করেন বৃক্ষ। আসলে এই গাছটি কোনও উদ্ভিদ নয় তবে তার আকৃতি ও প্রকৃতি বৃক্ষের মতোই। এই পাথুরে গাছটি আসলে 'মারজান' বা প্রবাল। ওই প্রবাল বৃক্ষ থেকে ছুঁড়ে দেয়া এক ধরনের ফেনাকে বলে 'আম্বর'। ঢেউয়ের মাথায় বয়ে এসে এই ফেনা জমা হয় তীরে।

সাগরের বুকে চলে জাহাজ ও নৌকা।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন মানুষকে দিয়েছেন বুদ্ধি। তারই জোরে সে শিখেছে জাহাজ ও নৌকা তৈরির কৌশল। মাল-আসবাব ও যাত্রী নিয়ে সে ভেসে থাকে পানির ওপর। কত সুন্দর। ওদিকে মাঝি-মাল্লাকে বুদ্ধি দিয়েছেন তার সাহায্যে অনুকূল ও প্রতিকূল বায়ু চিনে বিভিন্ন দিকে নৌকা চালিয়ে নিতে পারে।

তিনি তৈরি করেছেন তারা। আকাশের বুকে। নক্ষত্রের পরিচয় শিখিয়ে দিয়েছেন মানুষকে। মহা সমুদ্রের কূল নাই, কিনার নাই। চারদিকে শুধু পানি আর পানি। এমন সময় নাবিক দিক চিনে নেয় নক্ষত্র দেখে। সঠিক পথে চালিয়ে নেয় নৌকা। এটা সবচেয়ে বেশি বিস্ময়কর ব্যাপার।

এবার আসি পানির আকৃতি ও অবস্থার দিকে।

বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়। পানি তরল ও স্বচ্ছ। অংশগুলি জোড়া, পরস্পর মিলিত পানির আরেক নাম জীবন। মানুষ যখন পিপাসার্ত হয়ে একটু পানির মুখাপেক্ষী হয়;ঠিক তখন যদি কোথাও পানি খুঁজে না পাওয়া যায় তো সে মুহূর্তে এক পাত্র পানির জন্যে যথা সর্বস্ব বিলিয়ে দিতেও আমরা দ্বিধা করি না।

আবার দেখুন যদি এক অঞ্জলি পরিমাণ পানি মূত্রাশয়ের ভেতর আটকে যায় তা বের করে ফেলার জন্যে হাতের সব ধন-দৌলত ব্যয় করে ফেলতে তৈরি হয়ে যাই। মোটকথা, পানি ও সমুদ্রের অবাক করা ও বিচিত্র ব্যাপারের সীমা নেই।

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, 'ক্বোল আরাআয়তুম ইন্ আস্‌বাহা মাউকুম গাওরান ফাম ইয়াতিকুমু বিমা ইম্ মা'য়ীন০'

'বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছো কি, যদি তোমাদের পানি ভূগর্ভের গভীরে চলে যায়, তখন কে তোমাদের সরবরাহ করবে পানির স্রোত ধারা?'

আল্লাহ্ তায়ালা আরও বলেন, 'অ–আয়াতুল্ লাহুম আন্না হামাল্না জুর্রিয়াতাহুম ফিল্ ফুল্কিল্ মাশহুন অ–খালাক্না লাহুম মিম্ মিসলিহি মায়ারকাবুন; অইন্ নাসা নুগ্রিকহুম ফালা শারিখা লাহুম অলাহুম ইয়ুনকাযুন; ইল্লা রাহমাতাম্ মিন্না অমাতা আন ইলা হীন০'

'তাদের জন্যে একটা নিদর্শন এই যে, আমি তাদের সন্তান–সন্ততি বোঝাই নৌকায় চড়িয়েছি। তাদের জন্যে নৌকার মতো বাহন সৃষ্টি করেছি, যাতে আরোহন করে। আমি ইচ্ছে করলে তাদেরকে নিমজ্জিত করতে পারি, তখন তাদের জন্যে কোনও সাহায্যকারী নেই এবং তারা পরিত্রাণ ও পাবে না।'

বুজুর্গ ও বন্ধু–

বায়ূমন্ডল ও একটি ঢেউয়ের সমুদ্র বিশেষ। বাতাসের ঢেউগুলো সাগরের কল্লোল ধারার মতো বয়ে যাচ্ছে অবিরাম। বাতাস এমন সূক্ষ্ম পদার্থ যে, তাকে দেখতে পাওয়া যায় না। আবার এমন স্বচ্ছ যে, তার ভেতর দিয়ে অপর দিকে [illegible] বস্তুকে দেখতে কোনও অসুবিধে নেই। সেই বায়ু সারাক্ষণ আমার প্রাণের উৎস। পানাহার আমাদের দেহের খোরাক। দেহ রক্ষার জন্যে দিনে একবার মাত্র পানাহার করলেও আমরা বেঁচে থাকতে পারি। কিন্তু যদি সামান্য সময়ের জন্যে আমরা বাতাস গ্রহণ করতে পারি বা প্রাণের খাদ্য বাতাস ভিতরে না ঢোকে তো আমরা বাঁচতে পারি না। মুহূর্তের জন্যেও আমরা তার চিন্তা করিনা।

বাতাসের আর একটা গুণ হচ্ছে এই যে, তার প্রভাবে সমুদ্রের জাহাজ ও নৌকাগুলো পানির ওপর ভেসে রয়েছে; ডুবতে পারে না।

আসমান তো অনেক বড় কথা বায়ূমন্ডলের কথা যদি আমরা চিন্তা করি। এই সূক্ষ্ম ও হালকা বায়ুস্তরের মাঝে বাতাসের সাহায্যে মহান শিল্পী আল্লাহ্ তায়ালা কত বিচিত্র পদার্থ সৃষ্টি করেছেন। মেঘ, বৃষ্টি, বজ্রনিনাদ, বিদ্যুৎ, শিলা, তুষার,–এসব এই বাতাসের মাঝ থেকে তৈরি হয়।

জলভরা মেঘমালাকে দেখুন–

হালকা, সূক্ষ্ম বাতাসের মধ্যেই তা হঠাৎ তৈরি হয়ে যায়। সাগর, নদ–নদী থেকে জলীয় বাষ্প শুষে নিয়ে বাতাস তাকে উপরের দিকে পাঠিয়ে দিলেই তা মেঘের আকারে পরিণত হয়।

তাছাড়া রোদের তেজের জন্যে পাহাড়–পর্বত থেকে বাষ্প উপরের দিকে উঠে যায়; ফের বাতাসের জলীয় উপাদান থেকেও বাষ্পের জন্ম হয়। এসব বাষ্প উপরে উঠে মেঘরাশি সৃষ্টি হয়। আর যে সব দেশ বা জমিন পাহাড় পর্বত বা সাগর থেকে অনেক দূরে, বাতাস মেঘরাশিকে সেদিকে নিয়ে যায়। মেঘ থেকে বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি ওই জমিনে পড়তে থাকে। বৃষ্টির ফোঁটাগুলো সোজাসুজি জমিনের ওপর পড়ে। বৃষ্টির যে ফোঁটা জমিনের যেখানে পড়া মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের বিধানে লিপিবদ্ধ রয়েছে; ঠিক সেই ফোঁটা সেখানেই পড়ে।

যে পোকা বা কীট পিপাসায় কাতর হয়েছে তার তৃষ্ণা মেটানোর জন্যে বৃষ্টি বিন্দু ঠিক তার উপরই পড়ে। সে নিবারণ করে পিপাসা। এভাবে যে উদ্ভিদ পানির অভাবে শুকিয়ে যাচ্ছিল সে নির্ধারিত বৃষ্টি–বিন্দুর ছোঁয়া পেয়ে সতেজ হয়ে ওঠে। যে শস্য–বীজ পানির মুখাপেক্ষী, তার জন্যে যে বৃষ্টি–বিন্দু নির্দিষ্ট ছিল ঠিক সেই বিন্দুটিই তার ওপর পড়ে। পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে সে। গাছের যে শাখায় রসের অভাবে ফলটি শুকিয়ে যাচ্ছে তার জন্যে নির্ধারিত হয়েছে ক'ফোটা। ঠিক সময়ে গাছের গোড়ায় তা পড়ে যায়। মাটি শুষে নেয় তা। গাছের নিচে শিকড়, তার থেকে শিরাগুলো যা চুলের চেয়ে চিকন, ওই বৃষ্টির পানি শুষে নিয়ে প্রায় শুকনো ফলটি পর্যন্ত পৌছে দেয়। সরস ও তাজা হয়ে ওঠে ফলটি।

হায় মানুষ!

আমরা শুধু বুভুক্ষের মতো সেই ফল খেয়ে নিই। সুস্বাদু ফলের রসে আমাদের মুখ ভরে ওঠে। আমরা আনন্দিত, তৃপ্ত হই। কিন্তু মহান রাব্বুল আলামীন কিভাবে তা আমাদের কাছে পৌঁছে দিলেন সে নিয়ে কখনও মাথা ঘামাই না।

প্রতিটি বৃষ্টি বিন্দুর ওপর লেখা আছে যে, এটা অমুক জায়গায় পড়ে অমুক ব্যক্তির বা বান্দার রিযিক তৈরি করবে। দুনিয়ার সমস্ত মানুষ ও সৃষ্ট জীব একসাথে মিলে যদি বৃষ্টি ফোঁটার সংখ্যা গুণতে চায়, পারবে না। অসম্ভব। বৃষ্টির পানি যদি ফোঁটায় ফোঁটায় না পড়ে একবারেই সব পানি পড়ে যেত সেক্ষেত্রে উদ্ভিদ গুলো নিজেদের দরকার মতো ধীরে সুস্থে, অল্প অল্প করে পানি পেতে পারতো না। এতে সেগুলোর বিশেষ ক্ষতি হয়ে যেত। কারণ, উদ্ভিদ তিলে তিলে বাড়ে। সেজন্যে তাদের পানিও আস্তে আস্তে প্রয়োজন হয়। এভাবে সারা বছর ধরে অবিরাম বৃষ্টি হলে উদ্ভিদ জাতির বিশেষ ক্ষতি হতো। সেজন্যেই মহাজ্ঞানী কৌশলময় সৃষ্টিকর্তা বর্ষার মাঝখানে তৈরি করেছেন শীত, গ্রীষ্ম, হেমন্ত, বসন্ত ঋতু।

শীতের প্রকোপে বায়ুমন্ডলের মাঝের জলীয় কণাগুলো ধূণো তুলোর মতো বরফ হয়ে গুঁড়ি গুঁড়ি পড়তে থাকে। ওদিকে পার্বত্য অঞ্চলকে বরফের ঘর তৈরি করেছেন। বাতাস সেই বরফ গুঁড়োকে নিয়ে পার্বত্য এলাকায় মিলিত হয়। পাহাড়ের গা আচ্ছন্ন হয়ে যায় বরফে। পাবর্ত্য এলাকার বাতাস যেহেতু শীতল। বরফ সেখানে জমে কঠিন আকার ধারণ করে। বসন্ত এলে শীতের প্রকোপ কমে বাতাসে উত্তাপ বাড়তে থাকে। তখন ধীরে ধীরে বরফ গলে যায়। সেখান থেকে দরকার মতো বরফ গলা পানি নদী-নালা বয়ে সমতল এলাকার দিকে নেমে আসে। গ্রীষ্মে সূর্যের তেজে বাতাস আরো গরম হয়; বরফ আরো বেশি গলে। নদী-নালার পানি বাড়তে থাকে। মানুষ দরকার মতো পানি ক্ষেত খামারে ব্যবহার করতে পারে।

সারাক্ষণ বৃষ্টি হলে জীব-জানোয়ার এবং উদ্ভিদ সবারই বিশেষ কষ্ট হতো। এমন কি অস্তিত্ব শেষ হয়ে যেতো। আবার বৃষ্টির সময় পানি একবারে বর্ষিত হয়ে বছরের বাকী অংশটুকু অনাবৃষ্টি থাকলে উদ্ভিদ শুকনো হয়ে যেত।

কাজেই দেখুন; বরফ সৃষ্টি করার মাঝে আল্লাহ্‌তায়ালা এই কৌশল ও দয়া লুকিয়ে রেখেছেন। আল্লাহ্‌তায়ালার দয়া ও করুণা শুধু বরফ সৃষ্টির মাঝেই সীমাবদ্ধ নেই। সৃষ্ট জগতের প্রতিটি জিনিসের মধ্যে তার দয়া বিরাজ করছে। বরং জমিন ও আসমানের সব অংশগুলোকে আল্লাহ্‌তায়ালা সত্য, ন্যায় ও বিচক্ষণতার সাথে সৃষ্টি করেছেন। এই ব্যাপারেই আল্লাহ্‌তায়াল বলেন-

'অমা খালাক্‌নাস্ সামাওয়াতি অল আরদা অমা বায়নাহুমা লা' ঈবিন০ মা খালাক্‌নাহুমা ইল্লা বিল্ হাক্কি অলা কিন্না আক্‌সারুহুম লা ইয়ালামুন০ 'আসমান ও জমিনকে আর তার মাঝের যাবতীয় জিনিসকে আমি খেল-তামাশা হিসেবে সৃষ্টি করি নাই। আমি এই দুই কে সত্য সহকারে ঠিক ঠিক মতো সৃষ্টি করেছি। কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই তা বোঝে না।'

বুজুর্গও বন্ধু-

আসমান রাজ্যে যেসব বিচিত্র ব্যাপার ঘটছে সে তুলনায় জমিনের বৈচিত্র খুবই সামান্য।

আল্লাহতালা বলেন,'অজাআল্‌নাস্ সামাআ শাক্‌ফাম্ মাহ্‌ফুজাঁও অহুম আন্ আয়াতিহা মু'রিদুন০'

'এবং আসমানকে আমি সুরক্ষিত ছাদ করেছি; অথচ তারা তাঁর নিদর্শন গুলো থেকে বিমুখ রয়েছে।'

আরেক জায়গায় তিনি বলেন,'লা খালকুমুস সামাওয়াতি অল আরদি আকবারু মিন খালকিন্ নাসি অলাকিন্না আক্‌সারান্নাসি লা ইয়ালামুন০'

'অবশ্যই আসমান ও জমিনের সৃষ্টি মানুষ জাতিকে পয়দা করার চেয়ে বেশি বিরাট কাজ কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা বোঝে না।'

আসমান রাজ্যে যেসব বিচিত্র ব্যাপার ঘটছে সে তুলনায় জমিনের বৈচিত্র্য খুবই সামান্য।

আল্লাহতালা বলেন, 'অজাআল্নাস্ সামাআ শাক্ফাম মাহ্ফুজাঁও অহুম আন্ আয়ানিতহা মু'রিজুন।'

'এবং আসমানকে আমি সুরক্ষিত ছাদ করেছি; অথচ তারা তাঁর নিদর্শনগুলো থেকে বিমুখ রয়েছে।'

আরেক জায়গায় তিনি বলেন, 'লা খাল্কুস সামাওয়াতি অল আরদি আকবারু মিন খালকিন্ নাসি অলাকিন্না আকসারান্নাসি লা ইয়ালামুন।'

'অবশ্যই আসমান ও জমিনের সৃষ্টি মানুষ জাতিকে সৃষ্টি করার চেয়ে বেশি বিরাট কাজ, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা বোঝে না।'

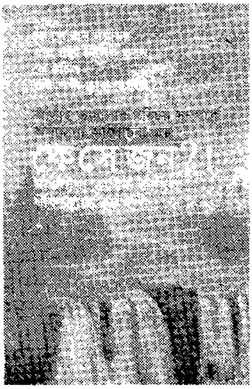

সাত

আল্লাহতায়ালা আকাশ রাজ্যকে সাজিয়েছেন তারার বীথি দিয়ে।

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতে হয়। অসংখ্য তারা দিয়ে তৈরি আকাশ। কোটি কোটি তারা। শুধু মিল্কিওয়েতেই রয়েছে দশ হাজার কোটি তারা। সংখ্যায় অনেক কিন্তু চেহারায়, আকারে তাদের কোনও মিল নেই। কোনটি লাল, কেউ সাদা। আবার কোনটা পারদের মতো, কেউ ছোট, কোনটা বড়।

রাত্রির আকাশের দিকে দেখুন, একদল তারা এক হয়ে আকার ধারণ করেছে মূর্তির। কোনও গুচ্ছের আকার বকরির মতো, কোনটার বলদের, কোনটার বৃশ্চিকের মতো। ভালো মতো দেখলে আরও অনেক ধরনের আকৃতি খুঁজে পাওয়া যায়।

জানা যায় যে দুনিয়াতে যত ধরনের পদার্থ রয়েছে তার হুবহু মূর্তি তারার গুচ্ছ দিয়ে আকাশে এঁকেছেন মহান রাব্বুল আলামিন।

এবার আসুন তারাদের নানা ধরনের গতিবিধি আর ঘোরা-ফেরার ব্যাপারটিতে। কোন তারা গোটা আকাশ রাজ্যে একমাসে একবার ঘুরে আসে। কিছু এক বছরে, কিছু বারো বছরে আবার কিছু ত্রিশ বছরে সারা আকাশ ভূবন প্রদক্ষিণ করে।

অন্যদিকে এমন কিছু তারা আছে যারা এতো ধীর আর আস্তে চলে যে মনে হয় চিরকাল একই জায়গায় স্থির অবস্থায় রয়েছে। যদি আকাশ চিরস্থায়ী হতো আর মহাপ্রলয় বা ক্বিয়ামত না ঘটতো তাহলে ছত্রিশ হাজার বছরে ওই তারাগুলো হয়তো আকাশ পথ পাড়ি দিত।

আবার দেখুন, পৃথিবীর আকার কতো বড়ো। কোনও লোকের তার শেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভব নয়। ওদিকে এই দুনিয়ার চেয়ে সূর্য প্রায় এক'শ ষাট গুণ বড়। এতে আমরা সহজেই আন্দাজ করতে পারি যে, সূর্য কতটুকু দূরে এই দুনিয়ার থেকে যে তাকে একটা থালার মতো ছোট দেখা যায়।

সূর্যের দেহ এতো বড় কিন্তু তার গতি কতো ক্ষিপ্র! তার দেহচক্রটি চক্রবাল ঘুরে আসতে আধঘন্টা সময় লাগে মাত্র। কিন্তু এতটুকু সময়ের মাঝে আসমানের পথে দুনিয়ার মোট দূরত্বের এক'শ ষাট ভাগ পথ পাড়ি দেয়।

সেজন্যেই একদিন জনাব রাসুল মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিব্রাইল আমিনকে জিজ্ঞেস করলেন,' সূর্য কি ডুবে গেল?'

'লা-নাআম' অর্থাৎ 'না-হাঁ'।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবাক হয়ে গেলেন। বললেন, 'এ আবার কেমন কথা? জিব্রাইল আমিন বললেন, 'না-হাঁ" বলতে যতক্ষণ সময় লেগেছে ততটুকু সময়ের মধ্যে সূর্য পাঁচ'শ বছরের পথ পাড়ি দিয়েছে।'

আকাশে এমন তারাও রয়েছে যা পৃথিবীর চেয়ে হাজার গুণ বড়। অথচ তাদের অনেককে চোখে দেখা যায় না। সুবিশাল আকাশ জুড়ে রয়েছে হাজার, লক্ষ, কোটি তারা। এক একটা তারা, গ্রহ-উপগ্রহের মাঝে আলাদা কৌশল, গঠনপ্রণালী ও রহস্য লুকিয়ে রয়েছে। প্রত্যেকের স্থিতি, গতি, প্রত্যাবর্তন, উদয়, অস্ত আর মধ্য আকাশে অবস্থান-সবকিছুর মাঝে রয়েছে গভীর কৌশল আর আলাদা জ্ঞান।

অন্যসব গ্রহ-উপগ্রহের অবস্থিতির রহস্য ঠিকমতো বোঝা না গেলেও সূর্যের গতিবিধি, তার রহস্য বেশ প্রকাশ্য ও স্পষ্ট। মহাকৌশলময় আল্লাহ তা'আলা তার গতিপথকে কক্ষপথ ঘেঁষা আকাশের সাথে আকৃষ্ট করে সৃষ্টি করেছেন। সেজন্যে কোনও ঋতুতে সূর্য আমাদের মাথার ওপর মধ্য আকাশ দিয়ে চলে যায়। অন্য ঋতুতে এদিকে ওদিকে কিছু হেলে যায়। আবার তাতে কোনও সময় অতিরিক্ত ঠান্ডা আবার কখনো ভীষণ গরম পড়ে। একসময় শীত গরমের ভারসাম্য থাকে।

সূর্যের গতিপথের পরিবর্তনের কারণেই শীত, গরম ঋতুর পরিবর্তন হয়। সেজন্যেই এক এক ঋতুতে দিন-রাত ছোট বড় হয়।

এই সূর্য সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'সূর্যকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন চতুর্থ আকাশে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন।

আল্লাহতায়ালা রাব্বুল আলামিন সৃষ্টির শুরুতে "জওহর" নামে একটা পদার্থকে চোখের সামনে আনলেন। "জওহর" মহামূল্যবান পাথর বা মূলপদার্থ। তিনি ওই পদার্থের ওপর তাঁর অনন্ত ক্ষমতা ও প্রতাপের দৃষ্টি ফেললেন।

'জওহর' কাঁপতে শুরু করলো। ফাটল ধরলো তার গায়ে।

'জওহর' ভাঙতে শুরু করলো।

ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যেতে লাগলো। তারপর হঠাৎ সে পানি ছিটালো। গলে যেতে লাগলো নিরেট পাথর। পানির ফোয়ারা উঠলো।

পানি কেঁপে উঠলো আল্লাহর ভয়ে।

সে পালাতে চায় দূরে কোথায়।

আল্লাহর দৃষ্টির প্রভা তার সহ্য হয় না। তার বিভায় সে দিশেহারা হয়ে পড়ে।

পালানোর ইচ্ছা জাগতেই তার শরীরে ঢেউ জাগে। ছোট ছোট। বুদবুদের মতো। তারপর একসময় বড় হয় ঢেউগুলো। মাঝারি। আরো বড় হয়। আরো বড়। বিশাল পাহাড়ের আকার নিয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে সে আল্লাহ তায়ালার প্রবল প্রতাপান্বিত দৃষ্টির সামনে থেকে পালানোর জন্যে ছুটতে থাকে দিগ্বিদিক।

দুনিয়ার এক দিক থেকে আরেক দিকে ছুটে যায় ঢেউমালা।

এবার আল্লাহতায়ালা তাঁর অনন্ত অনুগ্রহ ও দয়ার দৃষ্টি ফেললেন ছুটতে থাকা পানি রাশির ওপর। তাতে সমস্ত পানির অর্ধেক জমাট বেঁধে যায়। এই জমাট অংশ সাতটি স্তরে ভাগ হয়ে যায়। প্রথম স্তরটি আর্‌শ। তার দিকে দৃষ্টি ফেলতেই উপর দিকে উঠতে থাকে। সুপ্রতিষ্ঠিত হয় সপ্ত আকাশের ওপর। তখনও ভয়ে কাঁপছে আর্‌শ। দয়ালু আল্লাহতায়ালা তাতে লিখে দিলেন 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্।' স্থির হলো আরশ্ মহল্লা। এরপর সুপ্রতিষ্ঠিত হলো সাত আসমান। প্রতিষ্ঠিত হলো সপ্ত জমিন।

অবশিষ্ট পানির অংশটুকু এখনও কাঁপছে। কাঁপতে কাঁপতে ছুটছে। দিগ্বিদিক। দিশাহারা। আটলান্টিক মহাসাগরের উর্মিমালা ছুটে চলেছে। আল্লার ভয়ে ভীত হয়ে। প্রশান্ত মহাসমুদ্রের শান্ত ঢেউগুলো এখনও কাঁপছে। পরাক্রান্ত প্রভু আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ভয়ে। ভূমধ্য

সাগর, আরব সাগর, ভারত সাগর, মৃত সাগর, লোহিত সাগর, নীল নদ, দজলা, ফোরাত, নায়াগ্রা, আমাজান, গঙ্গা, কপোতাক্ষ, করতোয়া, মহানন্দা, পূণর্ভবা, পদ্মা ও মেঘনার পানি আজও ছুটে চলেছে একদিক থেকে আরেক দিক। আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে। ক্বিয়ামাত পর্যন্ত এমনই থাকবে।

আল্লাহতায়ালা বলেন..

'অ-কানা আরশুহা আলাল মাঈ-'

'আর আরশ ছিল পানির উপর ’

তারপর সেই পানিতে ওঠে প্রচন্ড উর্মি। স্রোতের ঘূর্ণি সংঘাতে আর উচ্ছাসে তৈরি হয় বাষ্প। তা ধীরে ধীরে ভাঁজ ভাঁজ হয়ে উঠে যায় ওপরের দিকে। আসলে তাতে ছিল ফেনার উপকরণ। তা দিয়েই আল্লাহতায়ালা উপরের দিকে তৈরি করেছেন আকাশগুলো। আর নিচের দিকে পৃথিবী।

পয়লা সাত আসমান ও সাত জমিন ছিল একসাথে। পরস্পর সংলগ্ন ও অবিচ্ছিন্ন। আল্লাহতায়ালা তার মধ্যে সৃষ্টি করলেন চোদ্দটি স্তর। প্রতিটি স্তরকে আবার আলাদা অবস্থান দিলেন।

আল্লাহতায়ালা বলেন....

'সুম্মাস তাওয়া ইলাস্ সামায়ি অহিয়া দুখান।'

'তারপর তিনি দৃষ্টি দিলেন আকাশের দিকে। যা ছিল জমাট ধোঁয়া বা ধূম্রকুঞ্জ।'

তত্ত্বজ্ঞানীরা বলছেন, 'আল্লাহতায়ালা আকাশগুলোকে তৈরি করেছেন ধোঁয়া দিয়ে। বাষ্প দিয়ে নয়। কারণ ধোঁয়া শান্ত। আর এর এক ভাগ অন্য অংশকে উঁচু করে রাখে। অন্য দিকে বাষ্প সারাক্ষণ বিশৃঙ্খল ও অগোছালো। আসলে এসব মহান আল্লাহতায়ালার অনন্ত মহিমা আর অসীম প্রজ্ঞার অকাট্য দলিল।

কথিত আছে সবচেয়ে নিচু আকাশ, পৃথিবীর কাছের আসমানের আসল রঙ হচ্ছে সাদা। কিন্তু "ক্বাফ" পর্বতের নীল রঙ ছায়া ফেলে আকাশে। তখন আকাশের রঙ হয় নীল।

আল্লাহতায়ালা বলেন, 'অহুয়াল আজীজুল গাফুরুল্লাজি খালাকা সাব'আ সামাওয়াতিন তিবাকা।'

'দয়ালু ও প্রবল পরাক্রমশালি আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন আকাশ রাজ্যকে সাতটি স্তরে।'

'মা তারা ফি খালকির্ রাহ্মানি মিন তাফাউতি।'

'আপনি কি দেখেছেন কোনও ভুল করুণাময়ের এই সৃষ্টিতে!?'

'ফারজিঈল বাসারা; হাল তারা মিন ফুতুর।'

'আবার দেখুন তো; কি? দেখতে পাচ্ছেন কি কোন বিশৃঙ্খলা?'

'সুম্মার জিঈল বাসারা; কার্রাতাইনি ইয়ান্ কালিব্ ইলাইকাল্ বাসারু খাশিয়াঁও অহুয়া হাশির।'

'এবার আবার দেখুন, বার বার দেখুন। আপনার দৃষ্টি এমন বিস্ময়কর সৃষ্টি দেখে ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসবে। ভয়ে আর সম্ভ্রমে। অবনত হয়ে।'

আল্লাহতায়ালা আকাশ রাজ্যকে তৈরি করেছেন সাতটি স্তরে।

'অ বানায়না ফাওকাকুম শাবআন্ শিদাদা।'

'তিনি সাত স্তরে সুসজ্জিত করেছেন আকাশকে।'

এতবড় আকাশ! কিন্তু কোনও খুঁটি নেই!

গোটা দুনিয়াকে ঘিরে রয়েছে প্রথম আকাশ। বাংলাদেশের মাথার উপর নীল আকাশ। সুদূর কেপটাউন-কালো মানুষের দেশ। তার মাথার উপর নীল আকাশ। দুরন্ত পশ্চিমাদের দেশ টেক্সাস। সারি সারি মাথা তুলে থাকা পাথুরে পাহাড়ের ওপর নীল আকাশ।

অন্ধকারের দেশ আফ্রিকা, গহীন বন, নিচে কাফ্রী জংলী রাসটারিয়ান, হারারি জাতির বসবাস। তাদের পর্ণ কুটিরের উপর, দূরে, নীলাকাশ। পবিত্র ভূমি মক্কা, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মভূমি। বায়তুল্লাহর মাথার উপর রৌদ্রকরোজ্জল নীলাকাশ। শেষ

নবী, শ্রেষ্ঠ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র দেহ মুবারাক যে মাটির নিচে, সোনার মদিনা, তার মাথার উপর ঝলমলে নীল আকাশ।

বিশালদেহী, হলুদ রঙের ককেশিয়ান রাশিয়াবাসীর দেশ, ইমাম বোখারী (রঃ) এর দেশ তাসখন্দ, মস্কো, কাজাখস্থান, উজবেকস্থান, খিরগিজস্থান–তার মাথার উপর ঘন নীল আকাশ।

বরফ ঢাকা সাইবেরিয়া, আইসল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড এর মাথার উপর বিবর্ণ নীলাকাশ। নিউইয়র্ক সিটি, শিকাগো সিটি, টেনেসি, ম্যানহাটান, ওয়াশিংটন, বোস্টন, লস অ্যাঞ্জেলস, লাস ভেগাস, বিভারলি হিলস, কানাডা, মন্ট্রিল, টরেন্টো, সিডনী, সিসিলী, রোম, ইটালী, গ্রীস, স্পেন, অসলো, নরওয়ের মাথার উপর ঘন নীল আকাশ।

আটলান্টিক মহাসাগরের উত্তুঙ্গ উর্মিমালা; তার মাথার ওপর নীলাকাশ। প্রশান্ত মহাসাগরের শান্ত ঢেউমালা; তার মাথার ওপর নীলাকাশ।

আলপস পর্বতমালার মাথার ওপর নীলাকাশ।

সিনাই পবর্তমালার মাথার ওপর নীলাকাশ।

আন্ডেজ পর্বতমালার মাথার ওপর নীলাকাশ।

হিমালয় পর্বতমালার মাথার ওপর নীলাকাশ।

উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু, সুমেরু থেকে কুমেরু পর্যন্ত বিস্তৃত, দিগন্ত জোড়া নীলাকাশ।

কোথাও কোনও বিশৃঙ্খলা নেই। নিখুঁত, নিশ্চিদ্র।

কোথাও কোনও খুঁটি লাগেনি। স্থির, অচঞ্চল।

রাত্রির আকাশ। তারা ঝলমল। সন্ধ্যাতারা। সপ্তর্ষি। বৃশ্চিক।

আল্লাহতায়ালা বলেন, 'তু লিজুল লাইলা ফিন্ নাহারি, অতুলিজুল নাহারা ফিল্ লাইল।'

'আমি প্রবেশ করাই রাত্রিকে দিনের ভিতর, দিনকে রাত্রির ভিতর।'

'অ–আয়াতুল লাহুমুল লাইলু নাশ্লাখু মিনহুন নাহারা ফাইজা হুম্ মুজ্লিমুন।'

'তাদের জন্যে এটা একটা উপমা যে আমি দিনের পেছনে রাত্রিকে চালাই রাত্রির পিছনে দিন।'

তো রাত্রির আকাশ দিনকে ঢেকে নেয়।

অসংখ্য তারা ঝিলমিল রাতের আকাশ। চন্দ্রালোকিত রাত। পূর্ণিমার। আবার অমাবস্যার রাত। চাঁদ যখন খেজুর গাছের শাখার আকার ধারণ করে। আবার বড় হতে হতে তা পায় পূর্ণ থালার আকার। গোটা দুনিয়া ভেসে যায় রূপালী চাঁদের আলোয়। জলাশয় গুলোর পানি যেন রূপালী তরল। মানুষের মনে লাগে রঙ।

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, 'অল্ কামারা ক্বাদ্দারনাহু মানাজিলা হাত্তা আদা কাল উরজুনিল ক্বাদিম।'

'আমি চাঁদকে সৃষ্টি করেছি। তা কখনও খেজুর গাছের শাখার মতো হয়ে যায়; কখনও পূর্ণতা পেয়ে থালার আকার ধারণ করে।'

রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিনের আকাশকে দেখি।

সূর্যোদয়ের সময়ের আকাশকে দেখি। কী মহান, অন্তর স্তব্ধ করা আকার নিয়ে পূর্ব দিগন্তে ওঠে। লাল। গাঢ় লাল রং ছড়িয়ে দেয়। ভয় ধরিয়ে দেয় অন্তরে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সম্পর্কে। তাঁর সৃষ্টির প্রতাপ দেখে মহাপ্রভুর ক্ষমতা আঁচ করা যায়। ধীরে ধীরে সে ওপর দিকে উঠে আসে। আলো ছড়ায়। দুনিয়ার মানুষ কর্মচঞ্চল হয়ে ওঠে। আলো ঝলমল করে ওঠে শহর, বন্দর, গ্রাম, বাজার, হাট।

এক সময় ক্লান্ত হয়ে পড়ে সে উত্তাপ ছড়াতে, আলো দিতে দিতে। ঢলে পড়ে, পশ্চিম দিকে। দিগন্তের শেষ সীমায়। মিশে যেতে থাকে নিসর্গ রেখায়। কমলা রঙের আবীর ছড়াতে ছড়াতে।

আল্লাহতায়ালা বলেন, 'অশ্ শামসু তাজ্রি লিমুশ্তাকার্রিল্লাহা জালিকা তাক্বাদিরুল আজিজুল আলীম।'

'আমি সূর্য উদয় করি পূর্ব দিকে, অস্ত দেয় পশ্চিম দিকে। এর মধ্যে রয়েছে মহাজ্ঞানী আল্লাহতালার বিরাট নিদর্শন।'

এভাবে দিন শেষে আসে রাত্রি। রাত্রি শেষে আসে দিন। আবহমান কাল ধরে প্রকৃতির এই বিচিত্র লীলা চলে।

আল্লাহতায়ালা বলেন, 'লাশ্ শামসু ইয়াম্ বাগি লাহা আন্ তুদরিকাল্ কামারা অলা লায়লু শাবিকুন্নাহার অকুল্লুন ফি ফালাকিই ইয়াশ্বাহুন।'

'সূর্য কখনও চন্দ্রকে করেনা অতিক্রম, চন্দ্র কখনও সূর্যকে। রাত্রি কখনও দিন ছাড়িয়ে যায় না; দিন কখনও রাত্রিকে। এরা প্রত্যেকে চলেছে নিয়মের বাঁধনে, পাড়ি দিয়ে চলেছে আপন আপন কক্ষপথ।'

মেঘাচ্ছন্ন আকাশকে দেখি। ঘনঘোর আঁধারে ঘেরা নীলাকাশ। যেন কালো শ্লেটের রঙ পেয়েছে। মাঝে সাঝে গর্জে উঠছে বজ্রবিদ্যুৎ। দিনের বেলায় নেমে এসেছে যেন রাত্রির কালো আঁধার। আকাশ চেরা বিদ্যুৎ স্তব্ধ করে দেয় হৃদয়। মেঘের সংঘাতে বেজে ওঠে কানফাটানো গর্জন। কড় কড় কড়াৎ!

কী বিচিত্র লীলা! মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কী অপূর্ব সৃষ্টি নৈপুর্ণ্য!

মহাবিশ্ব, মহাকাশ, গ্রহ-নক্ষত্র সম্পর্কে যুগে যুগে নানান ভুল, অদ্ভুত তত্ত্ব, তথ্য ও বিশ্বাস চালু ছিল। ওসব প্রচলিত ভুল তত্ত্ব ও তথ্য থেকে কোরআন আশ্চর্যজনকভাবে মুক্ত। অ্যারিস্টোটাল, পিথাগোরাস, প্লিনী, টলেমি এসব প্রাচীন লেখকদের বইয়ে লেখা, বেশিটুকুই আজকের বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু কুরআনের বলাটুকু অভ্রান্ত, অকাট্য,চূড়ান্তভাবে নির্ভুল। ফরাসী শল্যচিকিৎসক ডঃ মরিস বুকাইলি তাঁর 'বাইবেল, কুরআন ও বিজ্ঞান' বইয়ে বলেন–

Where as monumental erorrs are to be found in the Bible. I could not find a single error in the Quran. I had to stop and ask myself, 'If a man was the author of the Quran, how could he have written facts in the seventh century A.D. that today are shown to be in keeping with modern scientific knowledge. What human explanation can there before this observation? In my opinion, there is no explanation. There is no special reason why an inhaitant of the Arabian Peninsula should have had scientific knoledge on certain subjects that was ten centuries ahead of the period.

বিশ্বসৃষ্টির মৌলিক তত্ত্ব সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

'আওলাম ইয়ারাল্লাজিনা কাফারু আন্নাস্ সামাওয়াতি অল্ আরদা কানাতা রাতকান ফাফাতাক্নাহুমা অজাআল্না মিনাল্ মাঈ কুল্লা শাইয়্যিন হাইয়্যিন আফালা ইয়ুমিনুন।'

'অবিশ্বাসীরা কি দেখতে পায় না যে, আদিতে আকাশ মন্ডল ও পৃথিবী সবই এক সাথে জুড়ে ছিল। তারপর আমি তাদেরকে আলাদা করে ফেললাম। আর পানি থেকে জীবজগত সৃষ্টি করলাম।'

অন্য জায়গায় আল্লাহতায়ালা বলেন–

'সুম্মাস্ তাওয়া ইলাস সামায়ি অহিআ দুখান।'

'তারপর আমি আকাশের দিকে লক্ষ্য করলাম। ওটা তখন ধোঁয়া আর ধোঁয়া ছিল।'

এখানে দুটো ব্যাপার গুরুত্বপুর্ণ।

শুরুতে আকাশ ধোঁয়া রূপে ছিল। আর একসাথে ছিল।

মহাবিশ্বের সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে বিজ্ঞান বলছে সৌরজগতটির ব্যাস সাতশ কোটি মাইল। আমরা যে ছায়াপথের অধিবাসী, তার নাম হলো 'Local Galaxy.' এর এক দিক থেকে আরেক দিক কয়েক লাখ আলোকবর্ষ। এটা হলো সবচেয়ে ছোট ছায়াপথ। অন্যগুলো আঙুর গুচ্ছের মতো থোকায় থোকায় অবস্থান করছে। আদিতে মহাশূন্য জুড়ে একটা ধীর ঘুরন্ত সুবিশাল গ্যাসীয় মেঘ (primary Nebula) ছিল। অবিরত আর প্রচন্ড গতিতে তার ঘোরার কারণে আরো কতগুলো ঘুরন্ত টুকরোর সৃষ্টি হলো। সেগুলোতে মহাকর্ষ বল, বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় বল ইত্যাদির উপস্থিতির কারণে এদের তাপ, চাপ, ঘূর্ণন বেড়েই চললো। তাতে দেখা দিল তাপ-পারমানবিক (Thermonuclear) বিক্রিয়া। এই প্রচন্ড তাপ ও চাপ থেকে তৈরি হলো হাইড্রোজেন, হিলিয়াম। তার থেকে এলো কার্বণ অক্সিজেন। আরো পরে তৈরি হলো লোহা, তামা ইত্যাদির পরমাণু।

এই টুকরো 'নেবুলা' গুলো নিজের ভেতরেই নানান বেগে বিভিন্ন দিকে ঘোরার ফলে জন্ম নিল নক্ষত্র ও গ্রহ।

কাজেই দেখা যাচ্ছে পবিত্র কোরআন সঠিক কথা বলেছে। একসাথে ছিল, ধোঁয়ার আকারে ছিল। 'সামাওয়াত' বা Extraterrestrial world' একত্রিত ছিল। বর্তমান বিশ্বে 'মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব' একটা সর্বজন স্বীকৃত মতবাদ। আদি সৃষ্টির সময়, ক্ষণ, প্রক্রিয়া, পরিবেশ সম্পর্কে এই তত্ত্ব সফল ব্যাখ্যা দিতে পেরেছে। এই ব্যাখ্যার সাথে পবিত্র কালাম পাকের উচ্চারণের মিল দেখা যাচ্ছে।

আল্লাহ্‌তায়ালা সুরা আম্বিয়া'র তিরিশ আয়াতে বলছেন, 'মিথ্যাবাদীরা কি দেখছে না যে, আকাশজগত আর পৃথিবী পরস্পর এক হয়ে ছিলো। যা খুব ঘন আর মিশ্রিত গোলক।' এই আয়াতে 'কানাতা রাত্‌কান ফাফাতাক্‌নাহুমা' এই শব্দ তিনটির মানে বুঝলেই মহাবিস্ফোরণ ও আদি অগ্নিগোলক সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায়। বিজ্ঞানীরা সময়ের হিসেব করে বলছেন আজ থেকে পনের 'শ কোটি বছর আগের কথা। তখন সবদিকে শুধু অনন্ত-অসীম শূন্যতা। শূন্যতা আর শূন্যতা। কোথাও কিছুই নেই। এ সময়টাকে বিজ্ঞানীরা বলছেন 'শূন্য-সময়'। ঠিক তখনি খুবই সূক্ষ্ম একটা বিন্দুতে আচমকা আদি বস্তু ও শক্তির সীমাহীন সমাবেশ ঘটে। তাতে সৃষ্টি হয় অকল্পনীয় চাপ ও তাপের। ফলে ঘটে যায় মহা প্রলয়ঙ্করী বিস্ফোরণ। অস্তিত্ব পায় 'প্রিমর ডিয়াল ফায়ার বল' বা আদি অগ্নিগোলক।

কিন্তু এমন বিরাজমান অসীম শূন্যতার মাঝে বস্তু, শক্তি, সময় এলো কোথেকে?

বিজ্ঞানীরা সবিনয়ে জানাচ্ছেন, 'আমরা তা জানি না।'

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, 'আমি জানি। আমিই সৃষ্টি করেছি আকাশ মন্ডল। নিজ শক্তিতে। আর আমিই করেছি একে প্রসারিত।' (৫১ঃ৪৭)

'অস্‌সামাআ বানায়নাহা বিআইদিন অইন্না লা মু'শিউন।'

বিজ্ঞানীরা বলছেন সৃষ্টির শুরুতে চারদিকে শুধু আলো আর আলো দেখা যাচ্ছিল। আল্লাহ তায়ালাও তাই বলছেন,'আল্লাহু নুরুস্‌ সামাওয়াতি অল আরদি; মাসালু নুরিহি, কামিশকাতিন ফিহা মিসবাহুন; আল মিসবাহু ফি জুজাজাতিন। আজ্‌ জুজাজাতু কাআন্‌নাহা কাওকাবুন দুররিই ইয়ুন ইয়ুকাদু মিন শাজারাতিম্‌ মুবারাকাতিন জায়তুনাতিল লা শার কিয়াতিন অলা গারবিয়াতিন ইয়াকাদু জায়তুহা ইয়ুদিউ অলাও লাম তামশাশ্‌হু নারুন; নুরুন আ'লা নুরিহি। ইয়াহ্‌দি আল্লাহু লিনুরিহি মাই ইয়াশাউ।'

'আল্লাহ্‌ আকাশ ও পৃথিবী জ্যোতি। সেই জ্যোতির উপমা যেন একটি প্রদীপাধার। যাতে আছে একটা প্রদীপ। প্রদীপটি একটি কাঁচের পাত্রে শোভা পাচ্ছে। কাঁচপাত্রটি উজ্জ্বল তারা মতো। তাতে পবিত্র জয়তুনের তেল প্রজ্জ্বলিত। যা না পুবমুখী, না পশ্চিম। আগুন না ছুঁলেও তার তেল যেন জ্বলে উঠবে এখনি। জ্যোতির উপর জ্যোতি। আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছা পথ দেখান তাঁর সেই আলো দিকে।'

পজিট্রন-ইলেকট্রনের একজোড়া কণা সৃষ্টির জন্যে দশ দশমিক দুই লক্ষ বৈদ্যুতিক ভোল্ট শক্তির প্রয়োজন হয়। তাহলে এই মহাবিশ্ব সৃষ্টির জন্যে কত অকল্পনীয় শক্তির প্রয়োজন

হয়েছিল। অচিন্তনীয়। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন তাঁর অপরিসীম শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন কালামে পাকে। 'তিনিই অনস্তিত্বের মাঝে অস্তিত্ব দান করেছেন।'

সৃষ্টির সূচনা প্রক্রিয়া ঠিক কালামে পাকে যেভাবে বর্ণনা করেছেন বিজ্ঞানীরাও বলছেন একই কথা। এখানে প্রশ্ন আসে স্রষ্টার অস্তিত্ব সম্পর্কে কেন তারা বলতে পারলো না। কারণ পবিত্র কোরাণে বজ্র নির্ঘোষে সে কথারই ঘোষণা দিচ্ছেন। 'তিনি আদি, তিনিই অন্ত। তিনি প্রকাশিত, তিনিই গুপ্ত।' (৫৭ঃ৩)

অন্য জায়গায় বলেন, 'তিনি দৃষ্টির মাঝে নন। কিন্তু দৃষ্টিশক্তি তাঁরই দখলে। তিনি সূক্ষ্মদর্শী,সম্যক জ্ঞানী।'

আদি অগ্নিগোলক বা প্রিমরডিয়াল ফায়ার বলটি অস্তিত্ব লাভের সাথে সাথে ক্রমাগত ফুলতে থাকে। সম্প্রসারিত হতে থাকে। চারদিকে ছড়িয়ে যায়। এক সময় গোলকটিতে এক মাথা থেকে আরেক মাথা পর্যন্ত বিশাল ফাটলের সৃষ্টি হয়। বিজ্ঞানীরা যাকে 'মহাজাগতিক তার 'বা 'কসমিক স্ট্রিঙ' বলেন।

হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, 'সবচেয়ে আগে আল্লাহ পাক আমার নূর সৃষ্টি করেন। আমি আল্লাহর নূর থেকে আর বিশ্বজগত আমার নূর থেকে।'

বিজ্ঞানীদের মতে 'কসমিক স্ট্রিঙ' ই সৃষ্টি জাত বস্তুগুলোর মধ্যে প্রথম অস্তিত্ব লাভ করে। এ বিস্ময়কর বস্তুটি অস্তিত্ব প্রাপ্ত না হলে মহাবিশ্বের পক্ষে আজকের এই আকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সংগঠিত হওয়া সম্ভব ছিল না। 'কসমিক স্ট্রিঙ' অত্যন্ত গতিসম্পন্ন, আলোর গতিতে চলাচল করে। কসমিক স্ট্রিঙ আসলে অদৃশ্য আর তার ধর্ম হচ্ছে আলোর তরঙ্গ।

কাজেই নূরে মুহাম্মাদীর যথেষ্ট মিল দেখা যাচ্ছে 'কসমিক স্ট্রিঙের' বৈশিষ্টের সাথে।

বিশ্ববিখ্যাত মনীষী মরিস বুকাইলী তাঁর জগদ্বিখ্যাত 'বাইবেল, কোরআন ও বিজ্ঞান' গ্রন্থে লেখেন, 'যখন আমি প্রথম দিকে কুরআনের ওহী ও তার অবতীর্ণ বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করছি তখন পর্যন্ত আমি পুরোপুরি হালকা ভাবে নিয়েছিলাম। প্রায় উদ্দেশ্যহীন ছিলাম। আমি শুধু এটুকু জানতে চাচ্ছিলাম যে কোরানের সাথে আধুনিক বিজ্ঞানের কতটুকু মিল আছে। কোরানের বেশ কটা অনুবাদ পড়ে আমার মোটামুটি ধারণা হলো যে কোরান বিজ্ঞানের প্রতিটি অলৌকিক বিষয়ের দিকেই ইশারা করছে।

'তারপর অত্যন্ত গভীর দৃষ্টিতে সরাসরি আরবী ভাষায় কুরআনের ওপর গবেষণা চালালাম আর তার একটা সূচীপত্র তৈরি করে নিলাম। তখন সে সত্যের সাক্ষ্য দিতে হলো যা আমার সামনে ধরা পড়েছিল। পবিত্র কুরআনের একটা বর্ণনাও এমন নেই যার কোনও একটা অংশের ওপর সন্দেহ নজরে পড়ে। এর মৌলিকত্বকে যাচাই করেছি সারাক্ষণ ইঞ্জিলের সাথে। পুরোনো গ্রন্থ ও ইঞ্জিলে এমন অনেক বর্ণনা আমার সামনে পড়ে গেল যা আধুনিক বিজ্ঞানের সর্বস্বীকৃত অনেক সত্যের সাথে পুরোপুরি অমিল রয়েছে।

'এতে সন্দেহ নেই যে,বর্তমানে যদি বিভিন্ন রকমের ইঞ্জিল নিয়ে গবেষণা করা হয় তাহলে খৃষ্টবাদ চরমভাবে মার খাবে।'

কোরানের আয়াত গুলোর সত্যতা বিজ্ঞান আবার প্রমাণ করছে।

রাতের বেলা নীলাকাশে যে কোটি কোটি তারা, গ্রহ এসব দেখি ওগুলো আমাদের ছায়াপথের মধ্যে। এই ছায়াপথ (Local Galaxy) পৃথিবী থেকে প্রায় বাইশ লক্ষ মাইল দূরে। বিশাল বিপুল এক অসীম জগত। এগুলোকে Island universe বলেছেন বিজ্ঞানী ইউইন হাবেল। ধারণা করা হচ্ছে মহাবিশ্বে প্রায় একশো কোটি গ্যালাক্সি বা দ্বীপ জগত রয়েছে। গোটা মহাবিশ্বে এই দ্বীপ জগতগুলো আবার গুচ্ছ আকারে (clustered) আছে। আবার কয়েকটা গুচ্ছ থেকে কয়েক হাজার উপগ্রহ গ্যালাক্সি (Satelite Galaxies) নিয়ে স্থানীয় গ্যালাক্সি দল তৈরি করে। প্রতিটি ছায়াপথ একে অন্যের চেয়ে প্রায় এক মেগা (১০১২) পারসেক দূরত্ব অবস্থান করছে। তার মানে প্রায় তেত্রিশ লাখ আলোক বর্ষ। বিজ্ঞানীদের মতে গুচ্ছ গ্যালাক্সির মধ্যে সবচেয়ে বড় দলের গ্যালাক্সি গুচ্ছ হচ্ছে Hercules cluster. তার সংসারে রয়েছে দশ হাজার ছায়াপথ ও উপ–ছায়াপথ। এটা আমাদের দুনিয়া থেকে তিন'শ মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরে।

পবিত্র কালামে পাকে আল্লাহতালা বলেন, 'আকাশে আমি গ্রহ-নক্ষত্র তৈরি করেছি। তা তোমাদের দেখার জন্যে করেছি সুশোভিত।'

বুরুজকে গ্যালাক্সি বলেই ধারণা করছেন তত্ত্বজ্ঞানীরা।

বুরুজ হলো গড়ে কমপক্ষে দশ হাজার কোটি সূর্যের আবাস। যাদের কেন্দ্রের (Galatic Centre) উজ্জ্বলতা কোটি সূর্যের সমান। দুর্বোধ্য পিচ্চি ছায়াপথ কোয়াসা OQ-172-এর উজ্জ্বলতা সূর্যের দীপ্তির চেয়ে দশ ট্রিলিয়ন গুণ।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কালামে পাকে বলেন, 'তিনি মঙ্গলময় সত্ত্বা, যিনি আসমানে নক্ষত্রের জন্যে কক্ষসমূহ তৈরি করেছেন। এতে রয়েছে প্রদীপ সূর্য।

আরেক জায়গায় বলেন, 'আমরা আকাশে সৃষ্টি করেছি সুরক্ষিত দুর্গ সদৃশ বুরুজ সমূহ। এগুলো সজ্জিত করেছি তাদের জন্যে যারা প্রকৃত দর্শক। আল্লাহর প্রকৃত দর্শক হলো যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে স্মরণ করে আল্লাহকে। আর মহাবিশ্ব, পৃথিবী গুলোর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে। তারপর বলে, হে আমার মহান প্রতিপালক, তুমি শুধুই এসব কিছু সৃষ্টি করোনি। তুমিই পবিত্র। (৩ঃ১১৯)।

একটা গ্যালাক্সির আয়তন প্রায় সত্তর হাজার থেকে এক লক্ষ আলোকবর্ষ। ঘণত্ব বা পুরু প্রায় তিরিশ হাজার আলোক বর্ষ।

এক আলোকবর্ষ=ছয় লক্ষ কোটি মাইল।

এক পারসেক-৩.২৬ আলোকবর্ষ।

মহাবিশ্ব জগতের আয়তন জানা অসম্ভব। কারণ প্রতি মূহুর্তে এটা প্রসারিত হচ্ছে। ধারণা করা হয় এটা পঁয়ত্রিশ হাজার কোটি আলোক বর্ষের চেয়েও অনেক বেশি।

সৌরজগত এগারটি গ্রহ, বত্রিশটি উপগ্রহ, অগণিত উল্কাপিন্ড, গ্রহাণুপুঞ্জ নিয়ে তৈরি। সূর্য এর প্রধান। সৌরজগতের সব বস্তুর শতকরা ৯৯.৯ ভাগ নিয়ে এটা গঠিত। সূর্য প্রতি মুহূর্তে ৬.৩* ১০১২ আর্গ শক্তি বিকিরণ করে। সূর্যের ভেতর সব সময় সংযোজন (Fusion) ও বিয়োজন (Fission) প্রক্রিয়া ঘটছে। যেমন ঘটে থাকে পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের সময়। ছায়াপথকে কেন্দ্র করে সূর্যের প্রতি মুহূর্তে ২৫০ কিঃ মিঃ বেগে পরিক্রমণ করতে সময় লাগে প্রায় পঁচিশ বছর। সূর্যের কক্ষজাত সঞ্চালন তাকে ক্রমাগতই একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে অর্থাৎ সোলার অ্যাপেক্সের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

কুরআন ও বিজ্ঞানের এইসব অপূর্ব তথ্য ও তত্ত্ব আমাদেরকে মহান রাব্বুল আলামিনের শ্রেষ্ঠত্ব, বড়ত্ব ও প্রকৃত পরিচয় দান করে।

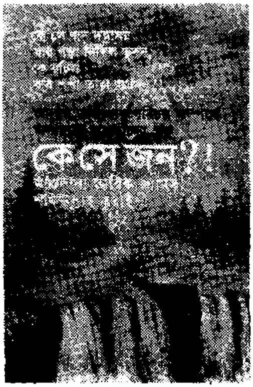

আট

এই অনন্ত রহস্যময় দিনরাত্রির আকাশ আল্লাহতায়ালা তৈরি করেছেন জমাট ধোঁয়া দিয়ে। প্রথম আকাশের নাম 'রক্বীয়া'। এই আকাশকে পুরু করা হয়েছে। পাঁচশত বছরের পুরু। পাঁচশত বছর বলতে বিজ্ঞানীদের ভাষায় ধরে নিতে পারি নয় কোটি তিরিশ লক্ষ মাইল। আর আমাদের নবী, সত্য রাসুল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাষায়

পাঁচশত বছরের অর্থ হচ্ছেঃ একটা আরবী দ্রুতগামী ঘোড়া। তার ওপর একজন দক্ষ ঘোড়সাওয়ার। অশ্বারোহী যদি ক্রমাগত একদিন সেই ঘোড়া ছোটাতে থাকে; কোথাও থামে না, বিশ্রাম নেয় না– যতদূর পর্যন্ত যাবে ততটুকু হচ্ছে একদিনের রাস্তা। এভাবে দু'দিন পর্যন্ত দৌড়ালে যতদূর যাবে সেটি হচ্ছে দু'দিনের রাস্তা। এক সপ্তাহ পর্যন্ত ক্রমাগত ছুটলে যতদূর যাবে তা হচ্ছে এক সপ্তাহের রাস্তা। একবছর পর্যন্ত দৌড়ালে হবে এক বছরের রাস্তা। একশত বছর পর্যন্ত দৌড়ালে হবে একশো বছরের রাস্তা। পাঁচশত বছর ধরে অবিরাম, অবিশ্রাম ছুটতে থাকলে যেখানে পৌঁছুবে তা হচ্ছে পাঁচশো বছরের পথ।

তো জমিন থেকে প্রথম আকাশের দূরত্ব পাঁচশো বছরের পথ।

আল্লাহতায়ালা প্রথম আকাশ 'রক্বীয়া'কে পুরু করেছেন পাঁচশো বছরের রাস্তা। তার পর পাঁচশো বছরের পথ জুড়ে মহাশুন্য। কোনও কিছুর অস্তিত্ব নেই। এবার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দ্বিতীয় আকাশকে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন। এই আকাশটি লোহা দিয়ে তৈরি। নাম ফায়দুম বা মাউন। বিজলির মতো সারাক্ষণ চমকাচ্ছে এই আকাশ। পাঁচশো বছর পথের সমান পুরু করা হয়েছে এ আকাশটিকে। তার বিস্তারকে বড় করা হয়েছে। এত বড় করা হয়েছে যে প্রথম আকাশটি তার সামনে ক্ষুদ্র হয়ে গেছে। এতো ছোট হয়েছে যে মনে হয় বিশাল এক মাঠে ছোট্ট একটা মটর দানা পড়ে রয়েছে। বিশাল মাঠে একটা মটর দানা যেমন খুঁজে পাওয়া যায় না তেমন কোটি কোটি তারা রাজির, চন্দ্র সূর্যের এই বিশাল আকাশকে দ্বিতীয় আকাশের সামনে খুঁজেও পাওয়া যাচ্ছে না।

দ্বিতীয় আকাশের ওপর পাঁচশো বছর পথের পরিমাণ ফাঁকা। মহাশূন্যতা। কোনও কিছু নেই। তারপর তৃতীয় আকাশ। এই আকাশ তামা দিয়ে তৈরি। জ্যোতির্ময়। আলোক উজ্জ্বল তামা। আকাশের নাম মালাকুত বা হারিয়ুন। পাঁচশো বছর পথের পরিমাণ পুরু। মোটা। তার বিস্তার বা সীমানা কে আল্লাহ তায়ালা বড় করেছেন। এতো বড় করেছেন যে দ্বিতীয় আকাশ, যার সামনে প্রথম আকাশ একটা মটর দানার মতো; সেই বিশাল আকাশ তৃতীয় আকাশের সামনে এতো ছোটো হয়ে গেছে যে মনে হয় বিশাল মাঠের মতো তৃতীয় আকাশের সামনে দ্বিতীয় আকাশটি যেন একটা ছোট্ট মুরগীর ডিমের ছিলার মতো পড়ে আছে।

আবার ফাঁকা। পাঁচশো বছরের পথ। মহাশূন্য।

তার ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে চতুর্থ আকাশ। রূপা দিয়ে তৈরি। চোখ ঝলসে যায় এমন সে রূপা। কোনও মানুষ তার দিকে দৃষ্টি ফেলতে পারে না। অন্ধ হয়ে যায়। রূপালী আকাশ পাঁচশো বছর পথের মতো পুরু। নাম 'জাহেরাহ' তার বিস্তার বা সীমানা আল্লাহতায়ালা বড় করে দিয়েছেন।

এতো বড় করেছেন যে প্রথম আকাশটির অস্তিত্ব বিলীন হয়ে গেছে। দ্বিতীয় আকাশ ও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। চতুর্থ আকাশের বিস্তারের সামনে যেন বিশাল এক মাঠের ভিতর একটা পিয়াজের খসানো ছিলার মতো পড়ে রয়েছে তৃতীয় আকাশ।

এখন আবার মহাশূন্যতা। ফাঁকা। পাঁচশো বছরের রাস্তা। ধূ ধূ ফাঁকা জায়গা।

তার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পঞ্চম আকাশ। এই আকাশও পাঁচশো বছরের মোটা বা পুরু। আকাশটি সোনা দিয়ে তৈরি। সোনালী রঙের সোনা নয়। রক্তলাল। সোনা। অসহ্য তার রূপ। নাম দেয়া হয়েছে মুযাইয়্যিনাহ বা মুসাইয়্যিরাহ্। পাঁচশো বছরের পুরু পঞ্চম আকাশের বিস্তার বা সীমানাকে আল্লাহতায়ালা বড় করেছেন।

এতো বড় করেছেন যে পঞ্চম আকাশের বিশালতার সামনে যেন বিশাল এক ময়দানে মেয়েলোকের মাথা থেকে খসে পড়া একটা চুলের মতো পড়ে রয়েছে। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ আকাশ।

আবার ফাঁকা। পাঁচশো বছরের পথ। কিচ্ছু নেই।

তার ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে ষষ্ঠ আকাশ। পাঁচশো বছরের পুরু।

তার চৌহদ্দীকে বড় করে দিয়েছেন। পাঁচশো বছরের পুরু ষষ্ঠ আকাশ এতো বড় হয়েছে যে পাঁচটি ক্রমশঃ বিশাল আকাশ তার সীমানার সামনে যেন বিশাল এক ময়দানে একটা মরা

মাছের চোখের মতো পড়ে রয়েছে। এই আকাশ মহামূল্যবান নীলা রত্ন দিয়ে তৈরি। তীব্র তার কিরণ। নাম 'খালেসাহ’।

আবার ফাঁকা। পাঁচশো বছরের রাস্তা। ধূ ধূ।

তার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সপ্তম আকাশ। মহামূল্যবান লাল রঙের ইয়াকুত পাথর দিয়ে তৈরি। নাম লামিয়াহ বা দামিয়াহ। নুরের জ্যোতিতে অতি উজ্জ্বল এ আসমান।

লামিয়াহ্ আকাশ পাঁচশো বছরের পুরু। এই আকাশের সীমানাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বড় করে দিয়েছেন। এতো বড় করেছেন যে ছয়টি আকাশ তার বিশালতার সামনে যেন বিশাল এক ময়দানে একটা হারিয়ে যাওয়া আঙটি!

সপ্তম আকাশে রয়েছে বায়তুল মামুর।

বায়তুল মামুর মহামূল্যবান আক্বীক পাথরের তৈরি। তার চারদিকে দেয়াল। একদিক ইয়াকুত রত্নের, অন্যদিক সবুজ পান্নার। তৃতীয় দিক দুধসাদা রূপোর। চতুর্থ দিক লাল সোনার।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, সপ্তম আকাশে রয়েছে শনি, ষষ্ঠ আকশে রয়েছে বৃহস্পতি, পঞ্চম আকাশে মঙ্গল, চতুর্থ আকাশে সূর্য, তৃতীয় আকাশে আছে শুক্র; দ্বিতীয় আকাশে বুধ, প্রথম আকাশে চন্দ্র।

মহান স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বিচিত্র সৃষ্টি লীলা। যার সৌন্দর্য, বৈচিত্র্যতা, গাম্ভীর্য আর বিশালতা রুদ্ধবাক করে দেয়। স্তব্ধ হয়ে যায় হৃদয়।

যিনি এতো বিচিত্র, সৌন্দর্যময়, বিশাল সৃষ্টির স্রষ্টা, তিনি কে?

কে সে জন?

কে সে জন যার গড়া নিখিল ভুবন;
কে রচিল রবি শশী তারা অগণন?!

তিনি আমাদের খালিক, মালিক। পরম প্রভু। সর্বশক্তিমান। আল্লাহ।

আল্লাহ্ আকবার। তিনি সবচেয়ে বড়। তাঁর চেয়ে বড় আর কেউ নাই।

আল্লাহতায়ালা যখন জমিনকে প্রতিষ্ঠিত করলেন তখন সে কাঁপছিলো থির থির করে। তাকে স্থির করার জন্যে আল্লাহ পাহাড়কে পুঁতে দিলেন। পেরেক হিসেবে।

'অল্ জিবালা আওতাদা।'

'আমি পাহাড়কে প্রোথিত করেছি পেরেক স্বরূপ।'

এই পাহাড় দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল ফিরিশতারা।

তারা বলল, 'হে আল্লাহ্, আপনি এর চেয়ে শক্তিমান, গরুগম্ভীর, মহান ও ক্ষমতাধর কিছু কি পয়দা করেছেন?'

'হ্যাঁ, করেছি।' উত্তর দিলেন আল্লাহতায়ালা।

'কি সেটা?'

'লোহা।'

'লোহা কি কারণে এই পাথুরে পাহাড়ের চেয়ে শক্তিশালী?'

'লোহা দিয়ে কেটে টুকরো টুকরো করা যায় পাথুরে পাহাড়কে।'

'সুবহানাল্লাহ। তো এই লোহার চেয়ে শক্তিমান, ক্ষমতাধর কোনও কিছু কি তুমি তৈরি করেছ, দয়ালু আল্লাহ?'

'হ্যাঁ, করেছি।'

'কি সেটা?'

'আগুন।'

'আগুন দিয়ে লোহার কি ক্ষতি করা যায়?'

'আগুন লোহাকে উত্তপ্ত করে পানির মতো তরল করে দেয়। রহিত হয়ে যায় তার ক্ষমতা?

'হে আল্লাহ্, আগুনের চেয়ে শক্তিশালী, ক্ষমতাময় কিছু কি আপনি সৃষ্টি করেছেন?

'হ্যাঁ, করেছি।'

'কি সেটা?'

'পানি।'

'পানি দিয়ে কী অসাধ্য সাধন করা যায়?'

'পানি দিযে আগুনকে নিভিয়ে ফেলা যায়।'

'হে আল্লাহ্, পানির চেয়ে শক্তিমান কিছু কি পয়দা করেছেন আপনি?'

'করেছি।'

'তা কি?'

'বাতাস।'

'বাতাস কি করতে পারে?'

'বাতাস পানিকে তার স্থান থেকে সরিয়ে দিতে পারে।'

'বাতাসের চেয়ে শক্তিশালী?'

'আকাশ।'

'আকাশের কী ক্ষমতা।'

'সে সবার উপরে। বাতাস তাকে ছুঁতে পারে না। আকাশে প্রবেশ করতে পারে না কোনও জ্বিন। আনতে পারে না কোনও গোপন আসমানী সংবাদ।'

'অলাক্বাদ যাইয়্যান্নাস্ সামাআদ্ দুনিয়া বিমাসাবিহা অজাআল্নাহা রুজুমাল লিশ্ শায়াতীন। অ-আতাদনা লাহুম আজাবাস্ শায়ীর।'

'হে আল্লাহ্, আকাশের চেয়ে শক্তিশালী, পরাক্রান্ত কেউ আছে কি?'

'আছে।'

'কে?'

'তোমরা।'

'আমরা?!'

'হ্যাঁ, তোমরা। ফিরিশতারা।'

'আমাদের কি গুণাগুন?'

'তোমরা আমার অনুগত। অনুগ্রহ প্রাপ্ত। সম্মানিত। শক্তিধর। মহাবিক্রমশালী। তোমাদের সর্দার ফিরিশতা জিব্রাইল আমিন যদি একটা চিৎকার দেয় জগতের সমস্ত প্রাণ হৃদয় ফেটে মারা যাবে। তার পাখার একটা কোণার আঘাতে পাহাড়গুলো চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে। তোমাদের পায়ের যদি চাপ পড়ে, বিশ্বব্রহ্মান্ড ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। তোমাদের নূর প্রকাশিত হলে জগতের সব অন্ধকার দূর হয়ে যায়। আমি তোমাদেরকে আদেশ করি, তোমরা সাথে সাথে মেনে নাও। কোনও অন্যথা করো না। তোমরা কোনও গুনাহ করো না। নিষ্পাপ। শুধু আমার হুকুম তামিল করো। তোমাদের মাঝে কিছুকে আমি আদেশ করেছি সিজদায় পড়ে থাকতে। তারা ক্বিয়ামাত পর্যন্ত সিজদায় পড়ে থাকবে। কিছুকে বলেছি রুকুতে থাকতে। তারা তাই থাকবে ক্বিয়ামাত পর্যন্ত। কিছুকে হুকুম করেছি ক্বিয়ামত পর্যন্ত কওমায় থাকো। তা তারা থাকবে। আবার কিছুকে আদেশ দিয়েছি জলসায় থাকো। তারা প্রলয় দিবস পর্যন্ত তাই থাকবে। সেজন্যে তোমরা সবচেয়ে শক্তিধর।

ফিরিশতারা কৃতজ্ঞ চিত্তে বললো, 'তবে কি আল্লাহতায়ালা আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ শক্তিমান ও সম্মানিত আর কেউ নেই?

বজ্রনির্ঘোষে আল্লাতায়ালা বলেন, 'হ্যাঁ, আছে।'

'কে সে?'

'মানুষ।'

'মানুষ?!'

'হ্যাঁ।'

'কি তাদের মাহাত্ম, কি তাদের গুরুত্ব? কেন তারা এতো বড়?'

'তারা আমার খলিফা। দুনিয়াতে আমার প্রতিনিধি।'

'হে আল্লাহ্, তারা গোনাহ করবে।'

'ক্ষমাও চাইবে। তখন তাদের গোনাহ মাফ হবে। তারা কাঁদবে। তখন তাদের পাপ পূণ্যে পরিণত হবে।'

'তাদের সাথে তোমার সম্পর্ক?'

'মনিব ও ক্রীতদাসের। প্রভু ও বান্দার।'

'কীসে তারা বড়?'

'তারা আমার সবচেয়ে আপন, আমার প্রেম!'

'কেন, আমরাই তো তোমার অনুগত। একজন ও বিদ্রোহী নই। কিন্তু তাদের অধিকাংশই দ্রোহী।'

'তবু তারা বড়।'

'কেন?'

'তাদের অন্তরে জ্বলছে এক হিরন্ময় বিশ্বাস।'

'কী সেই বিশ্বাস?'

'আমি কে? কি আমার ক্ষমতা। তারা বিশ্বাস করে–'লা'–নাই, 'ইলাহা'–কোনও উপাস্য 'ইল্লাল্লাহ্'–এক আল্লাহ ছাড়া। সেই আল্লাহ্ সবকিছু ছাড়া সব কিছু করতে পারেন। কিন্তু তাঁকে ছাড়া তাঁর সৃষ্ট জিনিস কিছুই করতে পারেনা।'

'শুধু বিশ্বাসের জন্যে তারা এতো বড়!'

'হ্যাঁ, শুধু এই বিশ্বাসের জন্যে। যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের বুকের ভেতর হৃদয়ের গভীরে এই বিশ্বাসের আগুন ধিকি ধিকি জ্বলবে ততক্ষণ তারা সবার চেয়ে সেরা।'

'আমাদের চেয়েও?'

'হ্যাঁ।'

'কেন?'

'তোমরা আমাকে দেখো। আমার অস্তিত্ব কাছে থেকে দেখে বিশ্বাস করো। কিন্তু মানুষ শুধু অনুভব করে আমাকে বিশ্বাস করে। আমার ভয়ে গোনাহ থেকে বাঁচে, আমাকে খুশি করতে পূণ্য করে।'

'হে আল্লাহ, কি তাদের সম্মান?'

'তারা যখন আমার সম্পর্কে জানার জন্যে কোনও রাস্তা ধরে তখন তোমাদের মতো নূরানী ফিরিশতাদের নূরের পর তাদের পায়ের নিচে বিছিয়ে দিই।'

'সুব্হানাল্লাহ! তারা এতো বড়!'

'হ্যাঁ, তারা পাহাড়ের চেয়ে, লোহার চেয়ে, আগুনের চেয়ে, পানির চেয়ে, বাতাসের চেয়ে, আকাশের চেয়ে এমনকি তোমাদের চেয়ে বড়!'

"তিনি কে?" শুধু এই প্রশ্নের উত্তর যিনি জানেন তিনি এতো বড় সম্মান ও ক্ষমতার অধিকারী।

'কে তিনি?'

তাঁর পরিচয় তিনি নিজেই কালামে পাকে দিয়েছেন।

তিনি–

'আল্লাহ লা–ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়্যুল কাইউম, লা–তা খুজুহু সিনাতুঁউ অলা নাউম।'

'তিনি আল্লাহ, তিনি ছাড়া অন্য কোনও উপাস্য নাই। তিনি চিরস্থায়ী, চিরজীবন্ত। তিনি কখনও ঘুমিয়ে পড়েন না।'

'হুয়াল লাহুলল্লাযি লাইলাহা ইল্লা হুয়া আলিমুল গাইবি অশ শাহাদাতি হুয়ার রাহমানুর রাহিম। হুয়াল্লাহুল্লাজি লাইলাহা ইল্লা হুয়া; আল্ মালিকুল কুদ্দুসুস্ সালামুল মু'মিনুল মুহাইমিনুল আজিজুল জাব্বারুল মুতাকাব্বির। সুব্হানাল্লাহি আম্মা ইয়ুশরিকুন। হুয়াল লাহুল খালিকুল বারিউল মুসাব্বিরু লাহুল আসমাউল হুসনা। ইউসাব্বিহু লাহু মা'ফিস্সামাওয়াতি অল আরদ্। অহুয়াল আজিজুল হাকিম।'

'তিনিই আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোনও উপাস্য নেই, তিনি দেখা অদেখা সব জানেন। তিনি পরম দয়ালু, অসীম দাতা। তিনি আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোনও উপাস্য নেই; তিনিই একমাত্র

প্রভু, পবিত্র, শান্তি ও নিরাপত্তাদাতা, আশ্রয়দাতা, পরাক্রান্ত, প্রতাপশালী, মহামহিমান্বিত, মাহত্ব ও গুরুত্বপূর্ণ। তাঁকে যারা অংশীদার করে আল্লাহ তায়ালা তা থেকে পবিত্র।

তিনিই আল্লাহতায়ালা। স্রষ্টা, উদ্ভাবক, আকৃতিদাতা, উত্তম নামগুলো তাঁরই। নভোমন্ডলে ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে সবই তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।'

তিনি নিজের পরিচয় নিজেই দিচ্ছেন–

'কুলিল্লাহুম্মা মালিকাল্ মুলকি, তুতিল্ মুলকা মান তাশাউ। অতান্জিউল মুলকা মিম্মান্ তাশাউ; অতুইজ্জুমান তাশাউ অতু জিল্লুমান তাশাউ বিয়াদিকাল খাইরি। ইন্নাকা আলা কুল্লি শাইয়্যিন ক্বাদির।'

'বলুন সমগ্র রাজত্বের মালিক আল্লাহ। তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে রাজত্ব দান করেন। যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজত্ব কেড়ে নেন। তিনি যাকে ইচ্ছা সম্মান দান করেন যাকে ইচ্ছা অপমান করে দেন। তিনি মহাপরাক্রম শালী প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী।'

আল্লাহতায়ালা আরও পরিচয় দিচ্ছেন–

'তু লিজুল লাইলা ফিন নাহারি অতুলিজুন নাহারা ফিল্ লাইলি।'

'তিনি রাত্রিকে প্রবেশ করান দিনের ভিতর, দিনকে রাত্রির ভিতর।'

'অতুখ্‌রিজুল হাইয়া মিনাল মাইয়্যিতি অতুখ্‌রিজুল মাইয়্যিতা মিনাল্ হাইয়্যি।'

'তিনি জীবনের ভেতর থেকে বের করে আনেন মৃত্যুকে, মৃত্যুর ভিতর থেকে বের করে আনেন জীবনকে।'

আল্লাহতায়ালা তাঁর রাজত্ব দান করেছিলেন ফিরআউন (রামেসিস–দুই) কে।

কিবতী সম্প্রদায়কে। তারপর সেটা তুলে দিলেন বনী ইসরাঈল ও মুসা আলাইহিসসালামের হাতে। ফিরআউন সমুদ্রে খাবি খেতে খেতে মারা গেল। অথচ সে বলতো লোহিত সাগর আমার। আমিই সবচেয়ে বড় খোদা। নিজের সাগরে ডুবে মরলো সে ইঁদুরের মতো।

নমরুদকে রাজত্ব দিয়েছিলেন সামান্য সময়ের জন্যে। নির্দিষ্ট সময়ে তা ছিনিয়ে নিলেন।

ফিরাউন বেইজ্জত হলো পানিতে ডুবে মরে।

নমরুদ অপমানিত হলো জুতোর বাড়ি খেতে খেতে মরে।

'আমি এভাবেই সম্মানকে অপমান দিয়ে, অপমান কে সম্মান দিয়ে বদলে দিই।'

তিনি যাকে অপমান করতে চান কেউ তাকে পারেনা সম্মান দিতে। যদি দেশের সব সৈন্যবল, লোকবল তার পক্ষে থাকে তবুও। যদি গোটা পৃথিবী তার পক্ষে থাকে তবুও। যদি সমস্ত বিজ্ঞানজগত, জগতের যাবতীয় সম্পদ, ধন–রত্ন তার পক্ষে যাকে তবু তাকে আল্লাহতালা অপমান করে দেন। তার সিংহাসনে বসেই সে লাঞ্ছিত হয়ে যায়, তার ধন সম্পদের মাঝেই। যেমন কারুণ।

আল্লাহতায়ালা যাকে সম্মান দিতে চান তাকে কেউ অপমান করতে পারে না। সারা দুনিয়া, দুনিয়ার যতো ক্ষমতা, শক্তি ও প্রাণী, মানুষ ও জ্বিন যদি একসাথে তার বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লাগে যে তাকে অপমান করে দেবে কিন্তু জগতের পরম প্রভু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাকে সম্মান দিবেন তো সে সম্মান পেয়ে যাবে। পৃথিবীর সবার কূট ষড়যন্ত্র, উদ্যোগ, পরিকল্পনা ও পদক্ষেপ বানচাল হয়ে যাবে। তাকে বনে রেখে, পর্ণ কুটিরে রেখে কোনও রকমের দুনিয়াবী বস্তু ও অবলম্বন ছাড়া বাদশাহর সম্মান দিবে আল্লাহ তায়ালা।

তিনি রাত্রিকে প্রবেশ করান দিনের ভিতর। দিনকে রাত্রির ভিতর।

তিনি জীবন থেকে বের করে আনেন মৃত্যুকে। মৃতের থেকে বের করে আনেন জীবনকে।

জীবনের থেকে কিভাবে বের করেন মৃত্যুকে?

জীবিত মানুষ, জীবিত প্রাণ–চলে ফিরে বেড়াচ্ছিল হঠাৎ মৃত্যু হানা দিল তার মাঝে। মানুষটা এই মাত্র ঘুমিয়েছে, জেগেছে, খেলেছে, কথা বলেছে, মুগ্ধ চোখে দেখেছে। খুশিতে হেসেছে, দুঃখে কেঁদেছে আর এখন ঘুমুচ্ছে কিন্তু শ্বাস–প্রশ্বাস নেই। আর জেগে উঠবে না।

হাত পা আছে, খেলতে পারবে না। মুখ আছে, কথা বলতে পারবে না। চোখ আছে, দেখতে পাবে না। কান আছে, শুনতে পাবেনা। খুশির ছোঁয়া লাগবে না, দুঃখে কাঁদবে না। হারিয়ে গেছে সব অনুভূতি। থেমে গেছে হৃদয়ের স্পন্দন।

নমরুদ ইব্রাহিম আলাইহিসসালামকে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার আল্লাহর পরিচয় কি?'

'তিনি জীবন মৃত্যুর বিধান কর্তা।'

অট্টহাসি হেসে উঠলো সে। বললো, 'সে তো আমিও করতে পারি। এই-' সে ডাকলো জল্লাদকে, 'আগামীকাল যার ফাঁসি হবে তাকে মুক্তি দিয়ে দাও।'

মুক্তিপ্রাপ্ত লোকটার মুখে হাসি ফুটে উঠলো। নমরুদ বললো,'ওই যে দেখো, কাল যে মারা যেত। আমি মৃত্যুর মাঝে জীবন দিয়ে দিলাম। এখন সে হাসবে, খেলবে, বাঁচবে। তারপর সে আবার একজন সৈনিককে ডাকলো, 'এই, যাও একজন নিরীহ, নিরপরাধ মানুষকে ধরে আনো।'

সৈনিক একজন বৃদ্ধকে ধরে আনলো। সে কাঁপছে।

'জল্লাদ-' ভীম দর্শন ভয়াল জল্লাদ কাছে এসে দাঁড়ালো, 'কতল করো।'

ইব্রাহিম আলাইহিসসালামের সামনেই বৃদ্ধের দেহ দু'টুকরো হয়ে গেল। রক্তে ভিজে গেল মেঝে।

'দেখো, কালও সে বেঁচে থাকতো। আমি তার জীবন কেড়ে নিলাম।' আঙুল তুলে মাথা ও দেহ আলাদা হয়ে যাওয়া রক্তাক্ত বৃদ্ধকে দেখাল নমরুদ। 'কাজেই জীবন ও মৃত্যুর বিধানকর্তা আমি।'

নাউজুবিল্লাহ্।

ক্ষমতা, সম্পদ ও মর্যাদা লোভী দুনিয়াদারের আত্মা যখন ঐশী আলো থেকে বঞ্চিত হয় তখন এমন চিন্তা ভাবনা তার মাথায় খেলে। এমনই নির্বোধ ও আহাম্মক হয়ে যায়।

তো আল্লাহ রাব্বুল আলামীনই জীবন মৃত্যুর প্রকৃত বিধান কর্তা।

তিনি যেমন জীবনের ভিতর থেকে মৃত্যুকে বের করে আনেন তেমনি মৃত্যুর ভিতর থেকে বের করে আনেন জীবনকে।

কিভাবে?

মরা আঙুল, জীবনের কোনও অস্তিত্বই নেই তাতে। কিন্তু জীবিত নখ বেরিয়ে আসছে প্রতিদিন। মরা মাথা তার থেকে প্রতিনিয়ত বেরিয়ে আসছে জীবিত চুল। মরা মাড়ি জীবন পেয়ে তার থেকে বেরিয়ে আসছে দাঁত। মরা চিবুক, তার থেকে বেরিয়ে আসছে জীবিত দাড়ি।

মরা ডিম। ভিতরে সাদা আঁশ, হলুদ কুসুম। জীবনের কোনও অস্তিত্বই নেই। কিন্তু যখন একটা নির্দ্দিষ্ট নিয়মে তার ওপর দিয়ে ওম্ দিচ্ছে মুরগী একুশ দিন পর্যন্ত। হঠাৎ ডিমের খোলস ফেটে বেরিয়ে আসছে জীবিত মুরগীর বাচ্চা। মৃত ডিমের ভিতর থেকে বের হচ্ছে জীবন পাওয়া মুরগীর বাচ্চা।

মরা চাঁদ, তার মরা কিরণ।

মরা সূর্য, তার মরা উত্তাপ। আলো। ছটা। রোদ্দুর।

মরা বৃষ্টি।

মরা ভূপৃষ্ঠ।

মরা মাটি।

মরা বীজ।

নির্দ্দিষ্ট দিন হঠাৎ জীবন পেয়ে মাটি চিরে বেরিয়ে আসে অঙ্কুর।

মরা অঙ্কুর থেকে ফুল। ফল। ফসল।

মরা ফসল গোলাজাত হয়।

মরা ধান বা গম।

তার থেকে মরা চাল বা মরা আটা।

তার থেকে মরা রুটি বা ভাত।

ওদিকে বাজার থেকে এলো পুঁই শাক, লাল- শাক, ডাঁটা শাক।

মরা ডাল।

মরা তেল।

মরা নুন।

মরা মরিচ।

মরা রুই, ইলিশ, পাঙ্গাশ, চিতল, আইড় বা চিঙড়ি মাছ। মরা গরু, খাসী বা মুরগীর গোশ্ত।

মরা ভাত, মরা ডাল, মরা মাছ, মরা গোশ্ত, মরা শাক চলে গেলো পেটের ভিতর। সেখানে মরা পাকস্থলীর নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় হজম হয়ে তৈরি হলো মরা পেশাব, পায়খানা। নির্দিষ্ট রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে গেল বর্জ্য পদার্থ। থাকলো রক্ত। হৃদপিন্ডের ছোট ও বড় হওয়ার মাধ্যমে রক্ত ছড়িয়ে পড়লো গোটা শরীরে। তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে। রক্তের দৌড়াদৌড়ি ও ছোটাছুটির কারণে তৈরি হচ্ছে পিচ্ছিল পদার্থ। বীর্য। মরা বীর্য!

আল্লাহতায়ালা বলেন, 'আফারা আয়তুম মা তুম্‌নুন।'

'তোমাদের ভিতর থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসা ফোটাগুলো কি দেখেছ?'

'আ আন্‌তুম তাখ্‌লুকুনাহু আম্ নাহ্‌নুল খালিকুন।'

'ওগুলো কি তোমরাই তৈরি করেছ না আমি তৈরি করেছি।'

'আওলাম ইয়ারাল ইন্‌সানো আন্না খালাক্‌নাহু মিন নুত্‌ফা।'

'তোমরা কি দেখনা, মানুষকে আমি তৈরি করেছি এক ফোটা নাপাক পানি দিয়ে?'

'ফাইজা হুয়া খাসিমুম্ মুবিন।'

'তবুও তোমরা তর্ক করছো, ঝগড়া বিবাদ করছো?'

তো মরা বীর্য ঠাঁই পাচ্ছে পিতার আজ্‌ল বা পিঠে। মায়ের বুকে।

এক আনন্দঘন রাতে পিতার পিঠ থেকে বীর্য তীব্র গতিতে ছুটে চলে যাচ্ছে যোনিনালী হয়ে গর্ভাধারে। শুক্রানু ও ডিম্বানু এক হচ্ছে। চল্লিশ দিন পর্যন্ত নুৎফাহ আকারে থাকছে। পরের চল্লিশ দিন মুয্‌গাহ আকারে। অর্থাৎ মাংস পিন্ড তৈরি হচ্ছে। পরের চল্লিশ দিনে তৈরি হচ্ছে হাত,পা, মুখ, মাথা, পেট, পিঠ–সব। এটা 'আলাকাহ্' এর অবস্থা। তারপর আচমকা একদিন রুহ ফুঁকে দেয়া হয়। বাচ্চা নড়া নড়া করে ওঠে।

ধীরে ধীরে মরা বীর্য থেকে তৈরি জীবিত শিশু লালিত পালিত হয় মায়ের পেটের ভিতর। মুখ দিয়ে নয়। মায়ের পেটের নাপাক রক্ত নাড়ি দিয়ে গ্রহণ করে শিশু। বেঁচে থাকে। পরম করুণাময় শিশুকে তার অসীম ক্ষমতা দিয়ে সম্মানিত ভাবে লালন–পালন করেন।

দশ মাস দশ দিন পর।

মায়ের জরায়ু ছিঁড়ে বেরিয়ে আসছে অপার বিস্ময়। এক জীবিত শিশু।

মরা পানির ভিতর মহাকৌশলময় চিত্রকর এঁকে দিলেন জীবন্ত ছবি। দুনিয়ার যত চিত্রকর–পাবলো পিকাসো, মাইকেল আঞ্জেলো, লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি, ভিনসেন্ট ভ্যানগগ, ফ্রান্সিস গঁগা, মাতিস–তাদের বইয়ে লিখেছেন 'জলের ভিতর ছবি আঁকা যাবে না।'

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন তাদের অক্ষমতাকে জানেন তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন জলের ভিতর ছবি এঁকে দেখাবেন। জীবন্ত ছবি।

শিশু জন্ম নিয়েছে।

মা এখনও বেঁচে আছে। কিন্তু খানিক আগেই যেন মৃত্যু তাকে ছুঁয়ে গেছে। তীব্র যন্ত্রণা। মরণ যন্ত্রণা! শরীরের সব কটা স্নায়ু, রগ আর জোড়াকে তীব্র তীক্ষ্ণ ব্যথা দিয়ে জরায়ু ছিঁড়ে বের হয়েছে শিশু। ছিঁড়ে খুঁড়ে গেছে যোনী মুখ। এতো কষ্ট, এতো লজ্জা, এতো অপমান আর এতো রক্ত! মায়ের মুখে যন্ত্রণার চিহ্ন কিন্তু বুক ভরা খুশি। কারণ কোল জুড়ে এসেছে দুনিয়া আলো করা আদরের ধন; সন্তান। সব ব্যথা, সব যন্ত্রণা ভুলে গেছেন তিনি।

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, দেখো মানুষ; চেয়ে দেখো! কী অবর্ণনীয় যন্ত্রণা আর সীমাহীন দুঃখ কষ্টের মাঝে তোমার মা তোমাকে জন্ম দিয়েছে। পাশে তার এক বালতি রক্ত! মা যে নিদারুণ কষ্ট পেয়েছে তাতে সাধারণ নিয়ম যে তার কষ্টের কারণ সন্তানটি তার এক নম্বর

দুশমন হয়ে যায়। কিন্তু দেখো, আমি তার মনের ভিতর দিয়ে দিয়েছি তোমার জন্যে মমতা। তোমাকে দেখার সাথে সাথে এক অনাবিল আনন্দে ভরে যায় তার অন্তর। আর বান্দা, তোর ক্ষুধা মেটানোর জন্যে দিয়ে দিলাম তোর মায়ের বুকে অমিয় ধারা। দুধ। এমন তরল যে গরমও নয় শীতলও নয়। যেন বান্দা তোর ঠোঁট, কচি মুখ পুড়ে না যায়। আর তোর কচি মুখ ঠান্ডায় না জমে যায়।

কেন এমন করলাম, বান্দা?

যেন তুই তোর জন্মলগ্ন স্মরণ করে বুঝতে পারিস কে তোকে লালন করে, কে তোকে পালন করে? কে তোর প্রতিপালক? তিনি কতটুকু দয়ালু। রাহমানুর রাহিম। কেমন রাজ্জাক।

এসব শেখালাম এজন্যে যে যখন তোর বিবেক হয়, জ্ঞানচোখ খোলে তুই আমার এইসব গুণাবলীর দাওয়াত দিস মানব জাতিকে। খেয়ে, না খেয়ে। পরে, না পরে। শীতে, গ্রীষ্মে, বর্ষায়। দিনের আলোতে, রাত্রির আঁধারে। দরিদ্র অবস্থায়, ধনী অবস্থায়। দেশে, বিদেশে। পথে-ঘাটে, বাজারে, বন্দরে, অফিসে, আদালতে, বাসে, উড়োজাহাজে, জাহাজে, নৌকায়, লঞ্চে, জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, সুস্থ কিংবা অসুস্থ অবস্থায়। সেজন্যে ঘাম ঝরে ঝরুক, রক্ত ঝরে ঝরুক, মান যায় যাক, জান যায় যাক।

যেমন আমার হাবীব মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন।

প্রথম সূরা 'আলাক' নাজিল হয়। এর তিন বছর পর মক্কার রাস্তা ধরে হাঁটছিলেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন সময় মাটি ও আকাশের মাঝামাঝি জায়গায় দেখা হলো জিব্রাঈল আমিনের সাথে।

নাজিল হলো দ্বিতীয় সূরা।

'ইয়া আইয়্যুহাল মুদ্দাস্‌সির। কুম্‌ ফাআন্‌জির। অরাব্বিকা ফাকাব্বির।'

'হে কম্বলাবৃত! উঠুন। ভয় দেখান মানুষকে। আর শোনান আপনার প্রতিপালকের গৌরব ও অহঙ্কারের কথা!'

তারপর তেইশ বছর পর্যন্ত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর বিশ্রাম নেন নি, ঠিকমতো খান নি। শুধু অপরের কাছে দাওয়াত পৌছানোর জন্যে। দাওয়াতের আমাল ক্বিয়ামাত পর্যন্ত সচল করার জন্যে। নিজেকে নিঃশেষ করলেন। ঘাম দিলেন, রক্ত দিলেন। সাথীদেরকে আত্মবলিদানে উদ্বুদ্ধ করলেন। ফোরাত নদীর পানি লাল হলো সাহাবা (রাঃ) 'র রক্তে।

তো ভাই উম্মত হিসেবে আমারও ওই একই কাজ। দাওয়াত। কীসের দাওয়াত?

আল্লাহর পরিচয়। তার জাত সম্পর্কে ও সীফাত বা গুণাবলী সম্পর্কে। আর নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়াসাল্লাম এর পরিচয়। কে তিনি? কি তাঁর পরিচয়? আমাদের জন্যে তিনি কি করেছেন আর আমি তাঁর জন্যে কি করতে পারি।

তো জন্মলগ্নে মায়ের অন্তরে দিলেন মমতা আর বুকে দিলেন দুধ।

সারা জীবন প্রকাশ করতে হবে সেই নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা।

এখন আল্লাহর পরিচয় কি?

তিনি জীবন ও মৃত্যুর বিধান কর্তা।

তিনি জীবনের ভিতর থেকে বের করেন মৃত্যুকে। আর মৃত্যুর ভিতর থেকে বের করেন জীবন।

তিনি মরা সব উপাদান দিয়ে তৈরি মরা বীর্যের এক ফোঁটা থেকে তৈরি করলেন জীবন্ত শিশু।

জীবন ও মৃত্যু মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সৃষ্টি।

অলঙ্ঘনীয় ও অলৌকিক দুটি নিয়ম।

আল্লাহ তায়ালা রাব্বুল আলামীন মহান স্রষ্টা।

তিনি বিভিন্ন বিচিত্র প্রাণীকূল তৈরি করেছেন। আফ্রিকার গহীন অরণ্যে এক ধরনের প্রাণী রয়েছে। এদের নাম প্লানটুন। প্লানটুন পাঁচটা উটের সমান। সে ক্ষুধার্ত হলে এক পোয়া

আফ্রিকান পিঁপড়া খেয়ে নেয়। তার খিদে মিটে যায়। এক ধরনের পাখি রয়েছে যেগুলো ডিম পাড়ে। ডিমের আয়তন পাঁচ কাঠার মতো। ডিম পাড়ার সময় হলে মহাশুন্যে উড়ে যায়। মেঘের দেশে। সেখানে সে ডিম পেড়ে দেয়। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কারণে ডিম প্রবল গতিতে নেমে আসে নিচের দিকে।

ডিমের সাথে সমান্তরালভাবে নেমে আসে পাখি। তার সুতীক্ষ্ণ চোখ দৃষ্টি মেলে দেয় ডিমের ওপর। আকাশ আর মাটির মাঝপথে থাকা অবস্থায়ই ফাটল ধরে ডিমের গায়ে। দৃষ্টি ক্রমশঃ তীক্ষ্ণ হয়। তার দৃষ্টির তীব্র প্রভায় ধীরে ধীরে খুলে যায় খোলস। বেরিয়ে পড়ে বাচ্চা পাখি। ডানা ঝাপটিয়ে উড়াল দেয় অজানা দেশে।

একদিন হযরত মুসা আলাইহিসালাম আল্লাহতায়ালাকে বললেন, 'হে আল্লাহ্, এই আসমান জমীন কে সৃষ্টি করেছেন?'

'আমি।' আল্লাহতায়ালা বললেন।

'কুল মাখলুক, সমগ্র সৃষ্টির স্রষ্টা কে?'

'আমি।' বজ্রনির্ঘোষ উত্তর।

'এই দুনিয়ার সমস্ত মানুষ তোমার বিরুদ্ধে। কোনও একজনও নেই যে তোমাকে মানে। অবাধ্য। তুমি কি করবে?'

'সবাইকে ধ্বংস করবো দুনিয়াতে, সৃষ্টি করবো নতুন জাতি। আখিরাতে দিব জাহান্নাম।'

'এই দুনিয়ার সমস্ত জ্বিন তোমার বিরুদ্ধে। কেউ তোমার হুকুম মানতে চায় না। কি করবে তুমি'?

'ধ্বংস করে জাহান্নামে দিব। সৎ, অনুগত জ্বিন সৃষ্টি করবো।'

'হে আল্লাহ, চন্দ্র তোমার কথা শোনে না, সূর্য পূর্বদিকে উদয় হয় না। পশ্চিমে অস্ত যায় না। জোয়ারের সময় ভাটা, ভাটার সময় জোয়ার। রাত্রির সময় দিন, দিনের সময় রাত। শীতের সময় গরম, বসন্তের সময় বর্ষা। বনের হিংস্র পশুরা তোমাকে মানে না। সমুদ্রের জীব জানোয়ার শোনে না তোমার কথা। পাহাড়-পর্বত গ্রহ নক্ষত্র সব তোমাকে অস্বীকার করেছে। গোটা বিশ্ব তোমার বিপক্ষে। বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। কী করবে তুমি সেক্ষেত্রে?'

'একটা ছোট পোকা আছে আমার কাছে।' শান্ত স্বরে বললেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন।

'হে আল্লাহ, সামান্য একটা পোকা কি করতে পারে?'

'এক লোকমায় সমগ্র বিশ্বব্রম্মান্ডকে গ্রাস করে নেবে সে।'

বিস্ময়ে হতবিহ্বল হয়ে গেলেন মুসা আলাইহিসসালাম।

'হে আল্লাহ! সেই পোকাটি থাকে কোথায়?' বিমূঢ় মুসা (আঃ) কাঁপা স্বরে শুধালেন।

'এক চারণ ভূমিতে।'

'চারণভূমি!'

'বিশাল এক চারণভূমিতে হাজার হাজার পোকা চরে বেড়াচ্ছে।'

'কোথায় সেই চারণভূমি?

'আমার জ্ঞানের রাজ্যে।'

'আমি দেখতে চাই।'

'তুমি তা পারো না। তোমার মস্তিষ্ক এতো বড় সৃষ্টির অস্তিত্বকে দেখতে পারে না। ধারণ করতে পারে না।'

হযরত সোলায়মান আলাইহিস সালাম একবার আল্লাহ তায়ালাকে আরজ করলেন,

'হে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। তুমি তো [illegible], রিযিকদাতা।'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

'রিযিকের ভার আমি নিতে চাই।'

'সুকঠিন দায়িত্ব। তুমি পারবে না।'

'মাত্র তিনদিনের জন্যে।'

'বেশ, দিলাম।'

'হে আল্লাহ, আমাকে সাহায্যকারী দাও।'

'দিলাম। জ্বিন, মানব, হাওয়া ও বিহঙ্গকুল কে।'

সুবিশাল এক লঙ্গর খানায় তৈরি হচ্ছে খাবার-দাবার। হাতী তার শাবককে নিয়ে পরিতৃপ্ত সহকারে খেয়ে চলে গেল। সিংহ তার শাবককে নিয়ে। সবাই খুশি। সূর্য যখন সাগরের বুকে ডুবু ডুবু। লাল-কমলা আবীর ছড়াচ্ছে। হযরত সোলায়মান আলাইসিসালাম যবুর কিতাব তিলাওয়াতে নিমগ্ন। ঠিক তখন অন্ধকার হয়ে গেল দুনিয়া। দশ দিগন্ত আঁধার করে মহাসমুদ্রের অতল তলা থেকে উঠে এলো অতিকায় এক প্রাণী।

ধীর পদক্ষেপ সে এগিয়ে গেল সোলাইমান আলাইহিস সালামের কাছে। সালাম দিল। বলল, 'খিদে পেয়েছে আমার।'

'বেশ, যাও লঙ্গর খানায়।'

এগিয়ে গেল অতিকায় প্রাণী। ফিরে এলো একটু পরেই। তার চেহারায় বিরক্তির ছাপ। বোঝা যায় তার খিদে মেটেনি।

'সোলায়মান আলাইহিসসালাম-' সে আর্তনাদ করে উঠলো, 'আমার খিদে মেটেনি।'

'কেন? লঙ্গর খানায় খাবার নেই?'

'না।'

'লক্ষ জ্বিন, মানব, বাতাস, পাখী যেখানে প্রতিমুহূর্ত খেটে যাচ্ছে সেখানে খাবার নেই?'

'না।'

'এতো বিশাল খাদ্য ভান্ডার গেল কোথায়?'

'আমার পেটে।'

'কি?!'

'হ্যাঁ, ওটা ছিল আমার এক লোকমার খাবার।'

'কি বলছো, তুমি?'

'জ্বি। পেয়ারা নবী। আমাদের আল্লাহ এমন তিনটি লোকমা প্রতিদিন দু'বার করে খেতে দেন আমাদের।'

'দু'বার!'

'জ্বি। দু'বার আমাকে একা নয় আমার মতো অসংখ্য প্রাণীকে সাগরের তলায় লালন পালন করেন তিনি ।'

সুবহানাল্লাহ।'

'জ্বি। আজ পেলাম এক বেলার এক লোকমা মাত্র। খিদে নিয়ে ফিরে যাচ্ছি ,হে মহামানব। আর মূর্খতা করবেন না। এখনই সিজদায় পড়ে জগতের প্রতিপালককে তাঁর দায়িত্ব দিয়ে দিন।'

সোলায়মান আলাইহিসসালাম তাই করলেন।

তো ভাই স্রষ্টার কতশত অজানা সৃষ্টি মানুষের অগোচরে রয়ে গেছে। কেউ জানে না।'

আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের বিচিত্র সৃষ্টি মানুষ।

মানুষকে আল্লাহতায়ালা সৃষ্টির সেরা সৌন্দর্য দিয়ে তৈরি করেছেন। তিনি বলেন-

'লাক্বাদ্ খালাক্নাল ইন্সানা ফি আহসানি তাক্বীম।'

'আমি মানুষকে সবচেয়ে সুন্দর আকৃতি দিয়ে তৈরি করেছি।'

চিন্তা করে দেখুন চোখের কথা। ঠিক ঠিক মতো জায়গায় বসিয়ে দিয়েছেন। নাকটি ঠিক মতো সাজিয়েছেন। যদি নাককে বুকে এনে দিতেন তাহলে কতই না বিদঘুটে ব্যাপার ঘটে যেতো। একটা চোখকে মাথার পেছনে আরেকটি চোখকে কপালে বসিয়ে দিলে মানুষকে ভুতুড়ে মনে হতো। একটা হাত বুকে অন্য হাতটি পিঠে বসিয়ে দিলে কোন কাজই মানুষ সঠিক ও সহজভাবে সম্পাদন করতে পারতো না। একটা পা মাথায় একটা পা নিচে দিলে অনাসৃষ্টি হয়ে যেতো। মুখকে পেটে আনলে বীভৎস দেখাত।

আল্লাহ তায়ালা তা করেননি।

তিনি অপরূপ করে তৈরি করেছেন মানুষকে।

জনৈক বাদশা ও তার স্ত্রী রাত্রি বেলায় রাজপ্রাসাদের ছাদে বসে চাঁদের আলোয় অবগাহন করছিলেন। এক সময় আবেগ মথিত হয়ে বাদশা বলে ফেললেন, 'রাণী তুমি এই চাঁদের চেয়ে সুন্দর।'

'তা যদি না হই?' ছলনা করে বললেন রাণী।

'না হলে তোমাকে তিন তালাক।'

শুনে শিউরে উঠে রাণী বললেন, 'প্রমাণ করবে কি দিয়ে?'

রাজাও এবার যেন একটু বাস্তবে ফিরে এসেছেন। বললেন, 'দেখি।'

দেশের গণ্যমান্য আলেমদের ডাকলেন তিনি।

সবাই স্তব্ধ। মানুষ যে চাঁদের চেয়ে সুন্দর কেমন করে প্রমাণ করবেন। কেউ কোনও সহজ কিছু পাচ্ছেনা।

দেশের সবচেয়ে বড় আলেম এরও ডাক পড়েছে। তিনি ও কিছু ভেবে পাচ্ছেন না। খুঁজে পাচ্ছেনা কোরান হাদীসের কোথায় এ সম্পর্কে পাবেন। হঠাৎ তার মনে হলো, তাঁর কাছে যে অল্প বয়সের কিশোর ছেলেটি পড়ে সে খুবই মেধাবী। সুতীক্ষ্ণ তার চিন্তা শক্তি। কোনও উপায় না পেয়ে তিনি রাত্রি বেলায় চলে গেলেন সাগরিদের বাসায়।

তাকে জানালেন জরুরী অবস্থা।

দেশের বাদশার বিবির তালাক হয়ে যাচ্ছে। কি করা?

এই কিশোর ছেলেটি হচ্ছে ইমাম আবু হানিফা (রঃ)। তিনি বললেন, 'ওস্তাদজী অস্থির হবেন না। বাড়ি যান। আগামীকাল দেশের সব বরেণ্য আলেমদের একত্রিত করুন। এশার নামাজের সময়ে। উত্তর দিয়ে দেব। তালাক হবে না বাদশার।'

এশার নামাজের সময় একত্রিত হলেন সবাই।

'নামাজ পড়াবো আমি।' কিশোর বললেন।

'তুমি!' সবাই সমস্বরে বললেন, 'এতো বড় বড় আলেম থাকতে?'

'জ্বি। নামাজে ইমামতি দিলেই প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন আপনারা।'

'বেশ। তবে তাই হোক।' সবাই বললেন।

সুরা ফাতিহার পর ইমাম আবু হানিফা (রঃ) পড়লেন 'আতত্বীন'। 'লাক্বাদ খালাক্বনাল্ ইন্‌সানা ফি আহ্‌সানি তাক্ববীম'—আয়াতে এলেন। কিন্তু তিনি পড়লেন, 'লাক্বাদ খালাক্বনাল্ ক্বামারা ফি আহ্‌সানি তাক্ববীম।'

মুক্তাদি লোকমা দিলেন।

তিনি আবার একই উচ্চারণ করলেন।

মুক্তাদিরা আবার লোকমা দিলেন।

এভাবে কয়েকবার পড়ার পর তিনি নামাজ ছেড়ে দিলেন। বললেন, 'আপনারা নিজেরাই লোকমার মাধ্যমে প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। আপনারাই কোরানের স্বাক্ষী দিয়ে বলেছেন, মানুষকে আল্লাহ সবচেয়ে সুন্দর করে তৈরি করেছেন। স্বয়ং আল্লাহতালা যখন বলছেন শুধু চাঁদ নয় যাবতীয় সৃষ্টির চেয়ে আমি মানুষকে সুন্দর করে তৈরি করেছি। তখন বাদশার স্ত্রী তালাক হয় কি করে?'

সবাই একই সাথে বিস্মিত ও খুশি হলেন।

বাদশাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

মানুষের কাছাকাছি আরেকটি জাতি সৃষ্টি করেছেন তা হচ্ছে জ্বিন।

জ্বিন মানুষের চেয়েও বেশি। আগুন দিয়ে তৈরি। তাদের খাবার হচ্ছে ধোঁয়া। একজন মানুষের চেয়ে তারা শক্তিমান, দ্রুতগামী। যে কোনও আকার নিতে সক্ষম।

জ্বিন জাতিকে একবার সমূলে ধ্বংস করা হয়েছিল। পাপাচারের কারণে। এখনও জ্বিন জাতি প্রচুর অনিষ্ট করে থাকে।

নয়

আল্লাহতালার সবচেয়ে নিকটতম ও অনুগত সৃষ্টি হচ্ছে ফিরিশতা। তারা নূরের তৈরি।

তিরমিজিতে হাদিস-ই-হাসান বলে আখ্যায়িত এই হাদিসটি আসছে-

'অ আন্ আবি জ্বার রাদিয়াল্লাতালাআনহু ক্বালা ক্বালা রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম, আত্তাতিস্ সামাউ অহক্কা লাহা আন তাঈত্তা মা ফিহা মাও দিউ আরবাঈ আসাবিআ ইল্লা অফিহি মালাকুন শাজিদুন লিল্লাহি তা'আলা অল্লাহি লাও তা'লামুনা মাআ'লামু লাদাহিকতুম কালীলাঁও অলা বাকায়তুম কাসিরান অমা তালাজ্জাজ্তুম বিন্নিসাঈ আলাল ফুরুশি অআখারাতুম ইলাস্ সুউ'দাতি তাহ্আরুনা ইলাল্লাহি তায়ালা।'

'আবু জ্বর গিফারী (রাঃ) থেকে বলা হয়েছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন "আসমান কেঁপে উঠলো। কারণ, আসমান নিশ্চয় আল্লাহর ভয়ে কেঁপে ওঠার উপযুক্ত। আকাশে চার আঙ্গুল মতো জায়গা নেই যেখানে কোনও মালাইকা (ফিরিশতা) আল্লাহকে সিজদা করছে না। ---।'

মুসলিম, তিরমিজি ও নাসায়ী গ্রন্থে একটা হাদীসে পাক রয়েছে-

'ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'আমাকে আনসারদের এক সাহাবী বলেছেন, এক রাতে তারা নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এর সাথে বসেছিলেন। আচমকা একটা তারা ছিটকে পড়লো আর জ্বলে উঠলো আগুনের মতো। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, 'তারা যখন এমন করে ছিটকে পড়ে তখন তোমরা কি বলো?' উত্তর তারা বললেন, 'আমরা বলে থাকি, 'আজ রাতে একজন মহামানব জন্মগ্রহণ করেছেন বা মৃত্যুবরণ করেছেন।'

তিনি বললেন, তারা কখনও কারও জন্ম বা মৃত্যুর কারণে ছিটকে পড়ে না। আসলে মহান আল্লাহতায়ালা যখন কোনও কাজ করেন তখন আরশ বয়ে চলা ফিরিশতারা আল্লাহর প্রশংসা পাঠ করেন। সাথে সাথে তার কাছের ফিরিশতারাও আল্লাহর প্রশংসা পাঠ করেন। এমনটি শেষ আকাশের ফিরিশতারাও তাসবীহ পাঠ করেন। তারপর তারা আরশ বহনকারীদের জিজ্ঞেস করেন, 'কি বলেছেন পরমপ্রভু?' তারা সংবাদ বলে দেয়। এভাবে একে অন্যের কাছ থেকে খবর জানতে পারেন আকাশবাসীরা। এমনি এ খবর শেষ আকাশের বাসিন্দারা জানতে পারে। তারপর খুবই গোপনে জ্বিনেরা শোনে সে সংবাদ। আর তাদের অনুসারীদের কাছে পৌঁছে দেয়। কাজেই, যে সংবাদটুকু তারা দৈববাণী থেকে শোনে তা সত্য। যা তারা সঠিকভাবে বলে তা সত্য। কিন্তু তারা এর সাথে মিথ্যা বলে আর বাড়িয়ে বলে।'

মুসলিম শরীফে আম্মাজান আয়শা (রাঃ) থেকে বলা হয়েছে, 'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, ফিরিশতারা নুরের তৈরি, আর জ্বিনদের সৃষ্টি করা হয়েছে ধোঁয়া ছাড়া আগুন দিয়ে। আর আদম জাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে এমন জিনিস দিয়ে যা তোমাদের বলা হয়েছে।'

মিরাজ সম্পর্কে হাদিস দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এর সামনে 'বায়তুল মামুর' উপস্থিত করা হয়েছিল। এটি সপ্ত আকাশে। প্রত্যেক দিন তাতে তাওয়াফ করে সত্তুর হাজার ফিরিশতা। তারা দ্বিতীয়বার সুযোগ পায় না।

মুহম্মদ ইবনে নাসির, ইবনে আবি হাতিম, ইবনে জারীর এবং আবু আল শায়েখ থেকে বর্ণনা করেছেন, আম্মাজান আয়িশা (রাঃ) বলেন, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, 'আসমানে ফিরিশতা ছাড়া পা রাখার জায়গা নেই। গোটা আকাশ জুড়ে ফিরিশতারা সিজদা আর কওমা অবস্থায় রয়েছেন।'

আবু দাউদ, বায়হাকী বর্ণনা করেন, জাবির (রাঃ) থেকে বলা হয়েছে, 'নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, আমাকে আরশ বয়ে নিয়ে চলা ফিরিশতাদের একজন সম্পর্কে কিছু বলতে অনুমতি দেয়া হয়েছে। তার কানের লতি থেকে ঘাড় পর্যন্ত সাত শত বছরের রাস্তা।'

আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'লাই ইয়াশ্‌তান্‌কিফাল মাসিহু আই ইয়াকুনা আ'বদান লিল্লাহি অলাল মালাইকাতিল্ মুকার্‌রাবুন।'

'মাসীহ্ ঈসা আলাইহিসসালাম কখনও আল্লাহর বান্দা হতে অস্বীকার করেননি। আর তার নিকটতম ফিরিশতারাও আল্লাহর বান্দা হতে অস্বীকার করেনি। আর ফিরিশতাদের কাউকে আসমানের অধিবাসী বলা হয়। তারা রাত দিন সকাল সাঁঝে ও সারাক্ষণ আল্লাহর ইবাদাতে ব্যস্ত রয়েছে।'

অন্য জায়গায় আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'ইয়ুসাব্বিহুনাল লাইলা অন্‌নাহারা লা ইয়াফ্‌তুরুন।'

'তারা দিন–রাত আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করে। কিন্তু তারা ক্লান্ত হয় না কখনও।'

তাদের মাঝে কেউ কেউ একের পর এক প্রদক্ষিণ করে বায়তুল মামুর। এদের কেউ রয়েছে জান্নাতের দেখা শোনার জন্যে। বেহেশত বাসীদের সম্মান জানানোর কাজে। আবার কেউ নিয়োজিত রয়েছে জাহান্নামের জন্যে। তাদের নাম 'জাবানিয়া'। তাদের সর্দার হলে উনিশ জন। দোজখ রক্ষকের নাম 'মালেক'। তিনি ওই উনিশ জনের সর্দার।

তাদের সম্পর্কে আল্লাতায়ালা জাল্লাশানুহু বলেন, 'অক্বালাল্‌লাজিনা ফিন্‌নারি লিখাজানাতি জাহান্নামাদ্'উ রাব্বাকুম ইয়ুখাফ্‌ফাফ্ আন্না ইয়াওমান্ মিনাল্ আজাব।'

'জাহান্নামিবাসীরা প্রহরীকে বলবে, তুমি তোমার প্রতিপালককে বলো, তিনি যেন একদিনের জন্যে আমাদের শাস্তি কমিয়ে দেন।'

আরেক জায়গায় বলেন, 'অনাদাও ইয়া মালিকু লিইয়াক্‌দি আ'লাইনা রাব্বুকা ক্বালা ইন্নাকুম মা কিমুন।'

দোজখীরা চিৎকার করে বলবে, 'হে মালেক, তুমি তোমার প্রতিপালককে বলো যেন মৃত্যু দান করেন। উত্তরে তিনি বলবেন, 'চিরকাল বেঁচে থাকবে তোমরা।'

আরেক জায়গায়ে আল্লাহতায়ালা বলেন, 'আলাইহা মালাইকাতু গিলাজু শিদাদু লাইয়াসুনাল্লাহা মা আমারাহুম অইয়াফ্‌আলুনা মা ইয়ুমারুন।'

'দোজখে ভয়ংকর চেহারার ও নিষ্ঠুর হৃদয়ের ফিরিশতারা আছে যারা কখনও আল্লাহকে অমান্য করেনা, তারা শুধু আল্লাহর হুকুম মেনে চলে।'

অন্য জায়গায় বলেন, 'আলাইহা তিশ্‌আতা আশারা অমা জাআল্‌না আসহাবান্ নারি ইল্লা মালাইকাতান্ ইলা কাওলিহি অমা ইয়ালামু জুনুদা রাব্বিকা ইল্লা হুয়া।'

'দোজখে উনিশ জন বিকটাকৃতির ফিরিশ্‌তা আছে। আর দোজখের ফিরিশতাদের আমি আশ্চর্য ও অদ্ভুত আকারে সৃষ্টি করেছি। আর আল্লাহর সৈন্য সামন্ত সম্পর্কে তিনি ছাড়া অন্য কেউ ভাল জানে না।'

কিছু ফিরিশতা আছেন যারা মানবজাতির দেখা শোনার দায়িত্বে ব্যস্ত থাকেন।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'লাহু মুআক্‌কাবাতু মিন্ বায়নি ইয়াদায়হি অমিন্ খাল্‌ফিহি ইয়াহ্‌ফাজুনাহু মিন্ আম্‌রিল্লাহ।'

'মানুষের সামনে পেছনে পালা করে ঘিরে আছে ফিরিশতারা। ওরা আল্লাহর আদেশে মানুষকে নিরাপদ রাখছে।'

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'কিছু ফিরিশ্‌তা মানুষের সামনে ও পেছনে পাহারা দিচ্ছে। যখন আল্লাহ আদেশ দিবেন সাথে সাথে তারা সরে পড়বে।'

মুজাহিদ (রঃ) বলেন, কোনও মানুষ ফিরিশতাদের নিরাপত্তা থেকে দূরে নয়। তারা মানুষকে ঘুমন্ত ও জাগ্রত অবস্থায় জ্বিন, দুষ্ট মানুষ ও পোকা মাকড়ের অনিষ্টতা থেকে নিরাপদ রাখে।

ফিরিশতাদের কেউ বান্দার আমল লক্ষ্য করার কাজে নিয়োজিত আছেন।

আল্লাহতায়ালা বলেন, 'ইজ্‌ ইয়াতালাক্কাল মুতালাক্‌কিয়ানি আ'নিল ইয়ামিনি অ আ'নিশ্‌শিমালি ক্বায়ীদুন্‌ মা ইয়াল্‌ফিজু মিন ক্বাওলিন ইল্লা লাদায়হি রাক্বিবুন আ'তীদ।'

'যখন ডান ও বাঁয়ের দূ'জন ফিরিশতা একে অন্যের সাথে দেখা করে, ওই লোক যা বলবে আর করবে, তাই তারা সংরক্ষিত করে রাখে।'

আরেক জায়গায় আল্লাহতায়ালা বলছেন, 'অইন্না আ'লাইকুম্‌ লা হাফিজিনা কিরামান কাতিবিনা ইয়ালামুনা মা তাফ্‌আলুন।'

'নিশ্চয়ই রয়েছে তোমাদের জন্যে পাহারাদার। তারা সম্মানিত লেখক। তোমরা যা করো তারা তা জানে।'

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বলা হয়েছে; রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ তোমাদের নগ্ন হতে নিষেধ করছেন। কাজেই তোমরা ফিরিশতাদেরকে লজ্জা করো। যারা তোমাদের সাথী, অতি সম্মানিত আর আমলনামার লেখক। ওরা তিন সময় ছাড়া তোমাদের থেকে আলাদা হয় না। পায়খানা, পেশাব, স্ত্রী-সহবাস আর গোসলের সময়। তোমরা যখন খোলা জায়গায় গোসল করো তখন কাপড়, দেয়াল বা অন্য কিছু দিয়ে নিজেদের আড়াল করে নেবে।'

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম থেকে বলেন, 'তোমাদের কাছে রাত দিন পালা করে আসা যাওয়া করেন ফিরিশতারা। তারা ফজর ও আসরের সময় একত্রিত হন। যারা তোমাদের সাথে রাতে থাকে তারা ভোরে আকাশে উঠে যায়। আল্লাহতায়ালা তাদের জিজ্ঞেস করেন, 'তোমরা আমার বান্দাদের কি অবস্থায় ছেড়ে এসেছো?' অথচ তিনিই বেশি জানেন। তখন ফিরিশতারা উত্তর দেয়, 'ওদেরকে নামাজ পড়তে দেখে এসেছি আর নামাজরত অবস্থায় ওদের কাছে গিয়েছিলাম।'

অন্য জায়গায় আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, তোমরা ইচ্ছে করলে পড়তে পার-

'অ কুরআনাল ফাজ্‌রি ইন্না কুরআনাল্‌ ফাজ্‌রি কানা মাশ্‌হুদা।'

'ফজরের নামাজে কোরআন তিলাওয়াত করো; নিশ্চয়ই এ তিলাওয়াত সাক্ষ্য হবে।'

তো ভাই,

লক্ষ কোটি ফিরিশতা!

একবার শয়তানের সাথে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সাক্ষাৎকার হলো। অনেক কথা। এক পর্যায়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার অনুচরদের সংখ্যা কতো?'

'শয়তান বলল, 'আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে আপনার সাথে মিথ্যা না বলার জন্যে। শুনুন তাহলে, এই দুনিয়াতে যত মানুষ আছে তার দশ গুণ পাখি। যতো পাখি আছে তার চেয়ে দশ গুণ হচ্ছে জীব-জানোয়ার, জীব-জানোয়ার যতো আছে তার চেয়ে দশগুণ জ্বিন, তার চেয়ে দশগুণ শয়তান। আর শয়তানের চেয়ে দশগুণ ফিরিশতা।'

তো,

লোমকূপে লোকমূপে ফিরিশতা।

পাতায় পাতায় ফিরিশতা।

কোরানের প্রতিটি আয়াত হিফাজতের জন্যে ফিরিশতা।

অসংখ্য, অগণিত।

আল্লাহর তৈরি প্রাণের দেখা শোনা, নিয়ন্ত্রণের জন্যে ফিরিশতাদের সৃষ্টি।

শ্রেষ্ঠ ফিরিশতা জিব্রাঈল, মিকাঈল, ইসরাফিল ও আজরাইল আলাইহিসসালাম। ইসরাফিল (আঃ) কে প্রলয় শিঙ্গা বাজানোর জন্যে আর আজরাইল (আঃ) কে জান কবজের জন্যে। 'মালাকুল আরহাম' নামে এক ধরনের ফিরিশতা আল্লাহতায়ালা সৃষ্টি করেছেন। গর্ভে যখন শিশু তখন এই ফিরিশতা তার রক্ত ও মাংসের সাথে মৃত্যু–স্থানের মাটি মিশিয়ে দেন। ওই মিশ্রিত মাটি একদিন মানুষটিকে টেনে আনে মৃত্যুর জায়গায়। সেখানেই সে মারা যায়।

আল্লাহতায়ালা বলেন, 'কুল্‌লাও কুনতুম ফি বুইউতিকুম লাবারাল্লাজিনা–কুতিবা আলাইহিমুল কাত্‌লু ইলা মাদাজিয়িহিম।'

'হে নবী। আপনি বলে দিন, তোমরা যদি তোমাদের ঘরের ভিতরেও থাক তবু যার যেখানে মৃত্যু আছে তাকে অবশ্যই সেখানে যেতে হবে।'

বলা হয়েছে, হযরত আযরাঈল (আঃ) নবীদের সাথে দেখা করতে আসতেন। একবার তিনি সোলায়মান (আঃ) এর দরবারে আসেন। সেখানে বসা একজন সুশ্রী যুবকের দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকালেন। যুবকটা ভয় পেয়ে গেল।

আযরাইল (আঃ) চলে যাবার পর যুবক বলল, 'হে আল্লাহর রাসুল, আমার অনুরোধ। আপনার বাতাস যেন আমাকে এখনই চীন দেশে পৌছে দেয়।'

খানিকক্ষণের মধ্যেই চীনে এসে পড়ল যুবক। আর তার একটু পরই আজরাঈল (আঃ) আবার হাজির বাদশার দরবারে।

'ব্যাপার কি?' সোলায়মান (আঃ) জিজ্ঞেস করলেন, 'ছেলেটাকে কড়া চোখে দেখার কারণ কি?'

'কারণ ওই দিনই তার জান কবজ করার জন্যে আল্লাহ্ আমাকে আদেশ করেন।'

'ভালো কথা।'

'কিন্তু আপনার দরবারে নয়, চীন দেশে।'

'সুব্‌হানাল্লাহ!'

'আপনার দরবারে তাকে দেখে অবাক হই। সে ভয় পায়। তারপর বাতাসের আগে পৌছে যাই চীন দেশে। ততক্ষণে সেও পৌছে গেছে। নির্দিষ্ট জায়গায় তার জান বের করে নিই।'

এক লোক সব সময় দোয়া করতো 'হে খোদা, আমাকে আর সূর্যের তত্ত্বাবধায়ক ফিরিশতাকে ক্ষমা করো।'

আল্লাহর অনুমতি নিয়ে একদিন সেই ফিরিশতা ওই লোকের কাছে এলেন। তিনি বললেন, 'বন্ধু আপনি আমার জন্যে কেন দোয়া করেন?'

'আমার একান্ত ইচ্ছা আপনি আমাকে আপনার জায়গায় নিয়ে যান। আর একটা ইচ্ছা হচ্ছে, আমার মৃত্যুর সময়টা ঠিক কখন তা আজরাইলের কাছ থেকে জেনে আমাকে বলে দেন।'

ফিরিশতা তাকে সেখানেই নিয়ে গেল। এবার আযরাইল (আঃ) এ কাছ থেকে মৃতুক্ষণ জানার পালা। তিনি আযরাঈল (আঃ) কাছে গেলেন। আযরাঈল (আঃ) বললেন, তার মৃত্যু হয়েছে। নির্ধারিত ছিল যে সে সূর্যে না আসা পর্যন্ত তার মৃত্যু হবে না।'

ফিরিশতা এসে দেখল সত্যিই ওই লোকটির মৃত্যু হয়েছে।

হযরত মাকাতিল (রঃ) বলেন, সাত আসমানে কিংবা চতুর্থ আসমানে সত্তর হাজার খুঁটির ওপর একটা সিংহাসন তৈরি করেছেন আল্লাহতায়ালা। নুরের তৈরি। এই সিংহাসনে বসিয়েছেন হযরত আযরাঈল (আঃ) কে।

আযরাঈল (আঃ) এর শরীরে চারটি পাখা।

তার গোটা দেহে দুনিয়াতে যত প্রাণী আছে তার সমান চোখ।

তার সমান জিভ।

ওখানে বসেই তিনি সবার প্রাণ ছিনিয়ে নেন।

একবার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বললেন, 'মালাকুল মাউতের ডানে বাঁয়ে, উপরে নিচে, সামনে ও পেছনে ছ'টি মুখ রয়েছে।

'ইয়া রাসুলুল্লাহ! ছয়টি মুখ কেন?' সাহাবা (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন।

তিনি (সাঃ) বললেন, ডানের মুখ দিয়ে পাশ্চাত্যের, বাঁয়ের মুখ দিয়ে প্রাচ্যের প্রাণীদের জান কবজ করেন। সামনের মুখ দিয়ে মোমেন, বাঁয়ের মুখ দিয়ে পাপীদের, উপরের মুখ দিয়ে আকাশ মন্ডলীর আর নিচের মুখ দিয়ে জ্বিন ও দানবের রুহ্ ছিনিয়ে নেন।

এমন করে কোন একটা প্রাণীর মৃত্যু হলেই আযরাঈল (আঃ) এর দেহের একটা চোখ খসে পড়ে।

এক হাদিস পাকে বলা হয়েছে, আযরাঈল (আঃ) এর চারটি মুখ:

মাথার ওপরের মুখ দিয়ে নবী ও ফিরিশতাদের আত্মা, সামনের মুখ দিয়ে মুমিন বান্দাদের, পিছনের মুখ দিয়ে দোজখীদের, পায়ের তলার মুখ দিয়ে দৈত্য, দানব, জ্বিন ও শয়তানদের প্রাণ সংহার করে থাকেন।

এই আযরাঈল (আঃ) এতই বিস্ময়কর আকৃতির যে মানুষের কল্পনায় আসে না।

তার হাতের তালুতে বিশ্বজগত। প্রতিটি প্রাণীকে, পাহাড়, পর্বত, নদ নদী, সাগর মহাসাগর, তরুলতা উদ্ভিদ সব দেখতে পাচ্ছেন স্পষ্ট। যখনই কোনও প্রাণী সংহারের সময় আসে সে তার নির্দিষ্ট আসনে বসে কাজ শেষ করে।

আযরাঈল (আঃ) এর একটা পা দোজখের উপরে পুলসিরাতের ওপর। অন্য পা বেহেশতের মধ্যে অবস্থিত সিংহাসনের উপর।

বলা হয়েছে, তার দেহ এতই বিরাট যে দুনিয়ার সব নদী-নালা, সাগর-মহাসাগরের পানি যদি তার মাথার ওপর ঢেলে দেয়া হয় তবুও এক ফোঁটা পানি মাটিতে পড়তো না। তার সামনে দুনিয়ার জীবন গুলো এতই ছোট যে যেন নানান খাবারে ভরা একটা থালা। সেটা তার সামনে। তিনি পৃথিবীতে এমনভাবে ওলট-পালট করে থাকেন যেন একটা তামার পয়সা। যা আমরা তালুতে রেখে টস্ করি।

একমাত্র নবী রাসুলদের পবিত্র প্রাণ মুবারক নেবার সময় আযরাঈল (আঃ) দুনিয়াতে আসেন। সব জান কবজের পর তার দেহে মাত্র আটটা চোখ বাকী থাকবে। জিব্রাইল, মিকাঈল, ঈসরাফিল, আযরাঈল ও আরশ বয়ে নেয়া চারজন ফিরিশতার জন্যে।

ফিরিশতাদের সর্দার হচ্ছেন জিব্রাঈল (আঃ)।

আল্লাহতায়ালা কালামে পাকে তাঁর সৌন্দর্য, সৎচরিত্র ও শক্তি সম্পর্কে প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেন, 'আল্লাহুম্মা শাদিদুল কুওয়া; যু মিরর্রাতনি ফাশ্‌তাওয়া।'

'তাঁকে (নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শক্তিমান ব্যক্তি জিব্রাঈল (আঃ) শিক্ষা দিয়েছেন। যিনি সৎ চরিত্র ও সুন্দর চেহারার অধিকারী।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'বার তাকে আসল রূপে দেখেছেন। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন রূপে তিনি তাঁর কাছে আসতেন।

আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) থেকে বলা হয়েছে, 'নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিব্রাঈল আমিনকে তাঁর নিজ আকারে দেখেছেন। ছয়শত পাখা রয়েছে তাঁর। এক একটা পাখা আকাশের শেষ কিনারে পৌছেছে। তাঁর পাখা থেকে নানা রঙের মণি মুক্তা ইয়াকুত ও নীলা রত্ন ঝরে পড়ছে।' (মসনদে আহমদ)

মুসলিম শরীফে আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) থেকে বলা হয়েছে, 'নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিব্রাঈল (আঃ) কে তাঁর আপন আকারে দেখেছেন। তিনি একটা সবুজ কাপড়ে ঢাকা, তাঁর দেহ আসমান জমিনকে ঢেকে ফেলেছে।'

আম্মাজান আয়িশা (রাঃ) থেকে বলা হয়েছে রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আমি জিব্রাঈল (আঃ) কে আকাশ থেকে নেমে আসতে দেখেছি। সে মণিমুক্তা খচিত রেশমী পোশাক পরেছিল। তাঁর মাথা সাত আসমানের ওপরে সিদরাতুল মুনতাহায়, পা সাত জমিনের নিচে। ছয়শত পাখা। একটা পাখা ঝাপ্টা মারলে সাড়ে চোদ্দ হাজার বছরের রাস্তা অতিক্রম করে।

কাওমে লুত' লাওয়াতাত' গোনাহে লিপ্ত হয়েছিল।

'লাওয়াতাত' হচ্ছে সমকামিতা। সমকাম। হোমোসেক্স। আল্লাহতায়ালা এই ইতর গুনাহের কারণে অত্যন্ত নারাজ হলেন লুত জাতির ওপর। লুত জাতি সডোম নগরীতে বাস করতো। তাই ইতিহাসের পাতায় সমকামিতার গোনাহকে 'সডোমিয়াত' ও বলা হয়েছে। লুত (আঃ) এর কাছে এলেন ফিরিশতারা। তারা সুদর্শন, সুপুরুষ। উঠতি বয়সের যুবক।

সূদর্শন তরুণ মেহমানদের নিরাপত্তার কথা ভেবে খুবই দুঃচিন্তায় পড়লেন লুত (আঃ)। জাতির কু-স্বভাব সম্পর্কে তিনি জানেন। সডোমের মানুষ নরপিশাচ। হিংস্র হাঙর যেমন রক্তের গন্ধ পেয়ে শিকারের পিছু ধাওয়া করে তেমনি দশা হবে এদের।

'বড়ই বিপদের দিন আজ।' মনে মনে বললেন তিনি।

ওদিকে 'যেখানে বাঘের ভয় সেখানে সন্ধ্যা হয়' এর মতো খোদ লুত (আঃ) এর কাফির স্ত্রী খবর দিয়ে দিল গোপনে। উল্লাসে ফেটে পড়লো বিকৃত মস্তিষ্কের মানুষগুলো।

রাত বাড়ছে। অজানা আশঙ্কায় কেঁপে উঠছে নবীর বুক। কী করা যায়।

গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে এলো হিংস্র হায়েনারা। নবীর বাড়িতে পৌঁছে গেল তারা। নারকীয় উল্লাসে মাতাল হয়ে আছে।

নবী তাদের সাথে কথা বললেন। পিতার মমতা নিয়ে। বললেন, 'যাও বাড়ি যাও। ওখানে তোমাদের স্ত্রীরা রয়েছে। তোমরা তোমাদের বিবেককে জিজ্ঞেস করো কোথায় নেমেছ তোমরা?' নবীর কণ্ঠে আক্ষেপ আর ধিক্কার।

কিন্তু ওই কামার্ত, মাতালেরা তখন হারিয়ে ফেলেছে তাদের সাধারণ জ্ঞানটুকুও। তারা নবীর বাড়ির দেয়াল টপকাতে লাগলো।

নবী কি করবেন?

কি উপায়?

'হে নবী লুত,' যুবকেরা কথা বলে উঠলো, 'কীসের চিন্তায় বিভোর আপনি?'

'ওরা! ওরা ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়েছে!'

'কি হয়েছে তাতে?'

'ওরা নির্মম, হিংস্র, পাষন্ড। আর শারিরীক শক্তিতেও সীমাহীন। ওরা তোমাদের আক্রমণ করবে।'

'কেন?'

'কারণ ওরা সমকামী!'

'ঠিক আছে। আসতে দিন ওদের।'

নবী সান্ত্বনা পেলেন না। আরও দিশাহারা হয়ে পড়লেন। বাড়ির চারদিকে নরপশুদের হল্লা। চিৎকার, পৈশাচিক উল্লাস। দরজা ভাঙার চেষ্টা করছে।

'ওরা এখনি দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে পড়বে!' কাতর ও ব্যাকুল স্বরে বললেন নবী।

'খুলে দিন দরজা।' নির্বিকার কণ্ঠ যুবকদের।

'তোমরা ওদের সাথে পারবে না। ওরা সংখ্যায় অনেক।'

'তবুও খুলে দিন। নবী আপনি পেরেশানী মুক্ত হোন।'

'কিভাবে! আমার চোখের সামনে.....'

'কিছুই হবে না আপনার চোখের সামনে। আমরা সাধারণ মানুষ বা যুবক নই।'

'তাহলে..'

'আমরা ফিরিশতা!'

রুদ্ধ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন নবী। কথা বলার ক্ষমতাও হারিয়েছেন তিনি। বিস্ময়ে ও আনন্দে।

চোখে তাঁর জল।

খুশির।

দরজা খুলে দিলেন ফিরিশতা যুবকেরা।

বন্যার পানির মতো হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে পড়লো ওরা।

হাল্কা করে পাখার ঝাপটা মারলেন ফিরিশ্‌তা ওদের কামার্ত, লোভে চক চক করতে থাকা চোখে।

অন্ধ হয়ে গেল ওরা।

অসংখ্য অন্ধ।

থেমে গেল গতি।

পালানোর পালা। কে কোন্ দিকে যাবে?

চলছে প্রতিযোগিতা।

ফিরিশতাদের কাজ শেষ।

তাঁরা ফিরে যাবেন। যাবার আগে তাঁরা বললেন, 'নবী, আপনি ও বিশ্বাসীরা আজ রাতের মধ্যেই চলে যাবেন এ শহর ছেড়ে।'

এতদিনের চেনা জন্মভূমি ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে। পাহাড় সমান ব্যথা নবীর বুকে। তার সন্তানেরা বুঝলো না। চিনলো না আল্লাহকে। স্ত্রীও না। চোখের পানি ফেলতে ফেলতে ব্যথিত হৃদয় নবী বেরিয়ে পড়লেন বাড়ি ছেড়ে।

গভীর রাত।

নবীর বুক চিরে বের হচ্ছে দীর্ঘশ্বাস।

চোখ বেয়ে অবিরল ঝরছে অশ্রু।

তাড়াতাড়ি পার হতে হবে এ এলাকা।

দ্রুত পা ফেলছেন। দীর্ঘ পদক্ষেপ।

গাঢ় আধার নেমেছে পৃথিবীর বুকে।

তার চেয়েও গাঢ় আধার জমেছে নবীর হৃদয়ে।

ফিরিশতাদের সাথে এই চরম গর্হিত আচরণে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বড়ই রাগ করলেন। তিনি জিব্রাঈল (আঃ) কে ডাকলেন। আল্লাহ তায়ালার ক্রোধ সঞ্চারিত হলো জিব্রাঈল আমিনের ভিতর।

মাত্র ভোর হয়েছে।

তখনই সডোমবাসী শুনতে পেল গর্জন। মাটি ফাড়ার শব্দ। কান ফাটা শব্দে ঘুম ভেঙে গেছে তাদের। অজানা আতঙ্কে সবাই পড়ল মরি ছুটলো। কিন্তু যাবে কোথায়?

ভয়ানক আত্মা কাঁপানো শব্দে চুরমার হয়ে যাচ্ছে পাহাড়-পর্বত, বাড়ি-ঘর। কে যেন তাদের তুলে নিচ্ছে শূন্যে। মহাশূন্যের অসীম নীলে। আরো উপরে। শুরু হলো পাথরের আর পোড়া মাটির বৃষ্টি। এমন অচেনা দৃশ্য তাদের বোবা করে দিল।

মহাশূন্যে ভাসছে চারলক্ষ মানুষ, পশু, পাখি আর প্রাণী।

আসলে, জিব্রাঈল (আঃ)।

তাঁর ছয়শত পাখার একটা পাখাকে বেছে নিলেন। তার একটা কোণা দিয়ে খোঁচা দিলেন শহরের শিকড়ে। তুলে নিলেন শহরটিকে। সাতটি গ্রাম মিলে সডোম নগরী। মানুষ রয়েছে চার লক্ষ। তার সাথে ছিল তাদের বাহন, চার পেয়ে জানোয়ার, আর শত শত দালান কোঠা। পাখার কোণাটি দিয়ে আকাশের ওপর উঠিয়ে নিলেন। এতো উপরে ওঠালেন যে চতুর্থ আকাশের ফিরিশতা তাদের পুরুষদের ভয়ার্ত চিৎকার, নারীদের আর্তনাদ, পশুপাখি ও মোরগের ভয়ার্ত ডাকাডাকি শুনতে পেলেন।

মহাশুন্য থেকেই উল্টে দিলেন তিনি শহরটিকে। প্রচন্ড ক্রোধে।

তীব্র গতিতে ছুটে এলো চার লক্ষ অধিবাসী সহ শহর। মাটির দিকে। নিমিষেই শহরটি মাটি ছুঁলো। মাটি ফাড়ার শব্দ হলো। ফেটে দু'ভাগ হয়ে গেলো। জায়গা করে নিল সডোম নগরী। তবুও তার গতি থামলো না। সে মাটি চিরে, ফুঁড়ে এগুতে থাকলো। তীব্রগতিতে। মাটির স্তর তার সাথে নেমে যাচ্ছে ভূতলে। ধীরে ধীরে মাটির জায়গায় বেরিয়ে পড়লো পানি। দিগন্ত বিস্তৃত বিশাল জলাশয়। কোন নদ বা নদী নয়। সাগর। ডেড সী! 'মৃত সাগর' বলে।

কারণ ওখানে কোনও জীবনের চিহ্ন নেই। সেদিনও ছিল না। আজো নেই। কেয়ামত পর্যন্ত কোনও প্রাণী ওখানে বাঁচবে না। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। শহরটি পানি চিরে চিরে আরও নিচে নামছে। মহাপ্রলয় দিবস পর্যন্ত নামতেই থাকবে।

হাদীস শরীফে আসছে 'অমিন শিদ্দাতি কুওয়াতিহি আল্লাহু রাফাআ মাদাইনা কাওমি লুতিন আলাইহিস সালামু অকুন্না শাব্‌আন্‌ বিমান্‌ ফিহিন্না মিনাল্‌ উমামি অকানু কারিবাম্‌ মিন্‌ আরবাঈ মিআতি আল্‌ফিন অমা মাআ'হুম মিনাদ্‌ দাওয়াব্বি অল্‌ হায়ওয়ানাতি অমা লি তিন্‌কান্‌ মাদাইনি মিনাল্‌ আরাদি অল্‌ ইমারাতি আলা তারফি জানাহিহি হাত্তা বালাগা বিহিন্না আনানাশ্‌ শামাঈ হাত্তা শামি আ'তিল মালাইকাতু নুবাহা কিলাবিহিম অসিয়াহা দিয়াকাতিহিম সুম্মা ক্বালাবাহা ফাজাআলা শাফিলাহা ফাহাযা হুয়া শাদিদুল কুওয়া।'

'তাঁর (জিব্রাঈল (আঃ) শক্তির অন্য নিদর্শন এই যে, তিনি কাওমে লূত (আঃ) এর শহরকে, যা সাতটা গ্রামের সমষ্টি, উপরে উঠিয়েছিলেন। তারা প্রায় চার লক্ষ লোক ছিল। সাথে ছিল ওদের বাহন, চারপেয়ে জানোয়ার আর মাদায়েনের মাটির শত শত দালান কোঠা। সবাইকে তার এক পাখায় উঠিয়ে আসমান পর্যন্ত গিয়েছিলেন। তারপর তিনি তা এমন ভাবে উল্টে দিলেন যে উপরের অংশ নিচে আর নিচের অংশ উপরে চলে গেল।'

তো ভাই,

চিন্তার ব্যাপার, একটা পাখার একটু কোণা মাত্র! সুব্‌হানাল্লাহ্‌! একটু কোণাতে যদি এতো বড় শক্তি থাকে তাহলে গোটা পাখাটিতে কত বড় শক্তি। দুটো পাখায় কত শক্তি। দশটি পাখায় কত শক্তি। পঞ্চাশটি পাখায় কত শক্তি! একশত পাখায় কত শক্তি! দু'শো পাখায় কত শক্তি! পাঁচশত পাখায় কত শক্তি! ছ'শো পাখায় কত শক্তি ও ক্ষমতা!

এই জিব্রাঈল (আঃ) যদি মানুষকে নাফরমানীর জন্যে ধরেন কি উপায় হবে। তাঁর একটা চিৎকারে হিজর বাসীদের যুগ যুগের সাধনা লব্ধ বাড়িঘর চৌচির হয়ে ফেটে বালুকা স্তূপে পরিণত হয়েছিল!

যার চিৎকারে, যার পাখার একটা কোণায় এতো শক্তি তার গোটা দেহে কত শক্তি!

যে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন চোখের পলকে এমন অসংখ্য জিব্রাঈল (আঃ) পয়দা করেন, করতে পারেন তাঁর নিজের কত শক্তি। তাকে আমরা চিনলাম না, জানলাম না, মানলাম না।

যদি আমরা তাঁর হতাম?

তিনি যদি আমাদের হতেন?

এই দুনিয়া কাদের পায়ের তলায় আসতো, ভাই?

কত বড়ো ক্ষমতার অধিকারী হতাম আমরা।

এই আল্লাহকে চেনা আর জানার জন্যে চাই নির্জনতা। নিরিবিলি মসজিদে একটানা একশো কুড়ি দিন। চল্লিশ দিন। তাঁর গৌরব আর অহঙ্কারের দাওয়াত। তালীম, জিকির আর ইবাদতে সময় কাটালে দূর হবে অন্তরের ময়লা। জ্বলে উঠবে আলো। আত্মায়।

পরিষ্কার ধরা দেবেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাঁর প্রকৃত পরিচয় নিয়ে।

হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বলা হয়েছে, 'ঈসরাফিল (আঃ) এর গোটা শরীরে অগণিত পাখা। জাফরানি রঙের। তার প্রতিটি পশমে হাজার হাজার মুখ। প্রতিটি মুখে হাজার হাজার জিভ। প্রতিটি জিভ অসংখ্য ভাষায় মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের প্রশংসা করে যাচ্ছে। ইসরাফিল (আঃ) শ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছে। প্রতি দমে তৈরি হচ্ছে একটা ফিরিশতা। সে ক্বিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর গুনগান করতে থাকে। আবু শাঈখ, আবু নাঈম হুলিয়াতে বর্ণনা করেছেন, 'ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বলা হয়েছে, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আরশ বহণকারী ফিরিশতাদের মধ্যে একজন ঈসরাফিল। আরশের একটি খুঁটি তাঁর কাঁধের উপর। তাঁর দু'পা সাত জমিন পর্যন্ত পৌছে গেছে। তাঁর মাথা সাত আসমানের উপরে উঠেছে।

আবু শায়খ আওজা'য়ী থেকে বলা হয়েছে, তিনি বলেন, 'আল্লাহর সৃষ্টি জীবের মধ্যে ঈসরাফিল (আঃ) এর চেয়ে বেশি সুন্দর কণ্ঠস্বর আর কারও নেই। তিনি যখন তাসবীহ্‌ পাঠ

শরু করেন, আকাশবাসীরা তাদের তাসবীহ পড়া আর সালাত আদায় করা থেকে বিরত থাকেন। কারণ তারা তখন শোনাতে মগ্ন।'

হযরত ঈসরাফিল (আঃ) শিঙ্গার তত্ত্বাবধায়ক।

মহান আল্লাহ তায়ালা রাব্বুল আলামিন আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে যে দূরুত্ব তার চেয়ে সাতগুণ অর্থাৎ পয়ঁত্রিশ শত বছরের রাস্তা সমান চওড়া করেছেন লাওহে মহাফুজকে। মহামূল্যবান মণিমুক্তা দিয়ে সাজিয়েছেন এই লাওহে মাহফুজকে। তারপর তাকে ঝুলিয়ে দিয়েছেন আরশের সাথে। মহাপ্রলয় পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে সব তাতে লিখে রেখেছেন।

হযরত ঈসরাফিল (আঃ) এর পাখা মাত্র চারটা। প্রথম ও দ্বিতীয় পাখা পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের শেষ সীমা পর্যন্ত ছড়িয়ে গেছে। তিন নম্বর পাখার ওপর তিনি নিজেই বসে রয়েছেন। আল্লাহর ভয়ে ও লজ্জায় তিনি চার নম্বর পাখা দিয়ে নিজ মুখকে ঢেকে রেখেছেন। আল্লাহর ভয়ে তিনি এতই ভীত ও লজ্জিত যে নিজ পাখায় মাথা ঢেকে আরশের খুঁটি জড়িয়ে ধরে মাথা নিচু করে পড়ে আছেন। আর তাকে দেখাচ্ছে ছোট্ট একটা পাখির মতো।

ঈসরাফিল (আঃ) মুখের পর্দা শুধু তখন সরান যখন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাঁর আদেশ নিষেধ জারি করেন। সে সময় লাওহে মাহফুজে আল্লাহর হুকুম প্রতিফলিত হয়। তিনি আল্লাহতায়ালার সবচেয়ে কাছের।

তবুও তাঁর ও আরশের মধ্যে সত্তর হাজার পর্দার অন্তরাল। একটা পর্দা থেকে আরেকটি পর্দার দূরত্ব পাঁচশত বছরের রাস্তা।

হযরত জিব্রাঈল (আঃ) ও ঈসরাফিল (আঃ) এর মধ্যেও সত্তর হাজার পর্দার অন্তরাল। একটা পর্দা অন্যটির চেয়ে পাঁচ শত বছরের রাস্তা দূরে।

ঈসরাফিল (আঃ) তাঁর ডান উরুর ওপর শিঙা রেখে তার গোড়া মুখে লাগিয়ে অপেক্ষায় রয়েছেন। আল্লাহর আদেশের। কখন তিনি হুকুম দেবেন। তিনি আদেশ দেয়া মাত্রই সজোরে শিঙায় ফুঁ দেবেন। দুনিয়ার মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে তাঁর কাছে আদেশ আসবে। চারটা পাখা এক করবেন শরীরের সাথে। তারপরেই ফুঁ দেবেন সজোরে। ওই সময় আযরাইল (আঃ) সক্রিয় হয়ে উঠবেন। তাঁর এক হাত থাকবে সাত জমিনের নিচে। আরেক হাত থাকবে সাত আসমানের ওপরে। যাবতীয় প্রাণীয় প্রাণ ছিনিয়ে নেবেন তিনি তখন।

আল্লাহতায়ালা বলেন, 'অনুফিখা ফিস্‌সুরি ফাইজা হুম্ মিনাল্ আজ্‌দাসি ইলা রাব্বিহিম ইয়ান্‌সিলুন।'

'যখন শিঙায় ফুঁক দেয়া হবে দলে দলে মানুষ ছুটে চলবে হাশরের মাঠের দিকে।'

অন্য জায়গায় বলেন, 'অনুফিখা ফিস সুরি ফাসারিকা মান ফিস্ সামাওয়াতি ওয়াল্ আর্‌দি ইল্লা মান্ শায়াল্লাহু।'

'আর শিঙায় ফুঁ দেবার সাথে সাথেই আকাশ ও ভূমন্ডলের সবাই জ্ঞানহারা হয়ে যাবে। কিন্তু ওরা ছাড়া যাদেরকে আল্লাহ নিরাপদে রাখতে চান।'

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বলা হয়েছে; হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, 'আল্লাহতায়ালা হযরত ঈসরাফিল (আঃ) এর শিঙা চারটে শাখা করে তৈরি করেছেন। দুটো শাখা দুনিয়ার পুর্ব ও পশ্চিম কিনার পর্যন্ত পৌছে গেছে। একটি শাখা জমিনের নিচে। অন্যটি সাত আসমানের উপরে উঠে গেছে। তাঁর শরীর জুড়ে রয়েছে অসংখ্য ছিদ্র। আত্মার স্তর হিসেবে ওগুলো ভিন্ন ধরনের। নবীদের আত্মার জন্যে আলাদা, মানুষের জন্যে এক ধরনের, জ্বিনদের জন্যে আবার আলাদা। শয়তানের জন্যে ভিন্ন। কীট, পতঙ্গ, জীব, জানোয়ারের জন্যে আবার আলাদা। মসনদে আবু ইয়ালা, বায়হাকী, ইবনে জারীর, তাবারী থেকে আবু হোযায়ফা (রাঃ) এর একটা হাদীসে পাক জানা যায়।

হযরত হোযায়ফা (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে, 'হে আল্লাহর রাসুল, শিঙায় ফুঁ দেয়ার সাথে সাথে মানুষের কী অবস্থা হবে?

তিনি (সাঃ) বললেন, 'হোযায়ফা! আমার আত্মা যাঁর হাতে তাঁর শপথ! শিঙা বাজানোর সাথে সাথে ক্বিয়ামত ঘটে যাবে। এমন অবস্থা হবে যে মুখের কাছে ওঠানো লোকমা গিলে ফেলার ক্ষমতা থাকবে না। হাত থেকে পড়ে যাবে। পোশাক সামনে থাকবে পরার অবকাশ

পাবে না। পানির পেয়ালা সামনে থাকবে কিন্তু তৃষ্ণা মিটাতে পারবে না। বড় সঙ্গীন সময়, বড় কঠিন সময়!'

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, 'অইয়াকুলুনা মাতা হাজাল ওয়াদু ইন কুনতুম সাদিকিন।'

'তারা কি আপনাকে জিজ্ঞেস করছে কবে ক্বিয়ামাত হবে?'

'মা ইয়ানজুরুনা ইল্লা শায়হাতাঁও অহিদাতান তাখুজুহুম অহুম্ ইয়া খিস্ সিমুন।'

'তাদের বলুন, একটা মাত্র ভয়াবহ ধ্বনি হবে তা তাদেরকে তর্ক বিতর্ক অবস্থায় ধরে ফেলবে।'

অন্য জায়গায় আল্লাহতায়ালা বলেন, 'অ-ইয়া কুলুনা মা তা হাজাল ওয়াদু ইন্ কুনতুম সদিকিন।'

'তারা কি আপনাকে জিজ্ঞেস করছে কবে মহাপ্রলয় ঘটবে?'

'কুল ইন্নামাল ইল্মু ইন্দাল্লাহা অইন্নামা আনা নাজিরুম্ মুবীন।'

'তাদের বলুন, এসবের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহতালাই জানেন। তিনিই তা প্রকাশ করে দিবেন।'

হযরত ঈসরাফিল (আঃ) মোট তিনবার শিঙায় ফুঁ দিবেন।

প্রথম বারে যাবতীয় সৃষ্টি ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়বে।

আল্লাহতায়ালা বলেন, 'ইয়াওমা নাতরীস্ সামাঈ কাতাইয়িশ্ শিজিল্লিল কুতুব।'

'সেদিন আমি আকাশকে গুটিয়ে নেব, যেমন গোটানো হয় লিখিত কাগজপত্র।'

বোখারী শরীফে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বলা হয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহতায়ালা ক্বিয়ামতের দিন সাত আসমানকে তাদের মাঝে যা কিছু সৃষ্ট বস্তু আছে আর সাত পৃথিবীকে তার সব জিনিস সহ গুটিয়ে এক করে দেবেন। সবগুলো মিলে আল্লাহ তায়ালার হাতে সরিষার একটা দানার মতো হবে।'

আল্লাহতায়ালা বলেন, 'ইয়া আইয়্যুহান্নাসুত্তাকু রাব্বাকুম; ইন্না জালজালাতাশ্ শাআতি শাইয়ুন আজিম।'

'হে মানব! ভয় কর তোমাদের প্রতিপালককে! ঐ বড় দিনের ব্যাপারে যেদিন দেখা দেবে প্রবল, ভয়ঙ্কর ভূকম্পন।'

'ইয়াওমা তারাওনাহা তায্হালু কুল্লু মুরদিআতিন্ আ'ম্মা আরদাআত্ অতাদাউ কুল্লু জাতি হাম্লিন হাম্লাহা অতারান্নাসা শুকারা অমাহুম বিশোকারা অলাকিল্লা আযাবিল্লাহি শাদীদ?'

'সেদিন তোমরা দেখতে পাবে প্রত্যেক দুধ পান করানো মা তার শিশুকে ভুলে গেছে; প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত করবে। আর মানবকে তুমি দেখতে পাবে নেশাগ্রস্থ মাতালের মতো! আসলে তারা মাতাল নয়, তাদের প্রভুর ভয়ংকর শাস্তি তাদের ধরে ফেলেছে!'

ঈসরাফিল (আঃ) এর শিঙার প্রচন্ড শব্দে গোটা বিশ্বজগত প্রবলভাবে কেঁপে উঠবে। দুলতে থাকবে জমিন আসমান। কাঁপতে থাকবে পাহাড় পর্বত। উছলে উঠবে নদনদী, সাগর মহাসাগরের পানি। প্রাণী জগত অধীর আর অস্থির হয়ে পড়বে।

জুমার দিন হবে।

মহররম মাসের দশ তারিখ হবে।

সুবহে সাদেকের সময় ফুঁ দিবেন ঈসরাফিল (আঃ)। সুরেলা, মধুর সুর শুনবে জগৎবাসী।

বেলা বাড়বে। সুর কেটে যাবে। মধুরতা নষ্ট হবে। তীক্ষ্ণতা বাড়বে। আর আওয়াজ ক্রমশঃ কর্কশ হয়ে উঠবে। এতো কর্কশ ও বিদঘুটে হবে যে মানুষ দিশাহারা হয়ে যাবে। সবার চোখে একই প্রশ্ন, 'কোত্থেকে আসছে এমন শব্দ!?'

একজন বলবে উত্তর দিক থেকে। আরেকজন বলবে দক্ষিণ দিক থেকে। কেউ বলবে পূর্বে। কেউ বলবে পশ্চিমে।

জমিন ক্রমশঃ উত্তপ্ত হয়ে উঠবে। আকাশ লাল রঙ ধারণ করবে। ঘরবাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়বে মানুষ। কারণ দাঁড়ানো, বসা ও শোয়ার জায়গা লাল রঙ হয়ে ফেটে পড়বে। শিঙার ধ্বনির কম্পন ধীরে ধীরে বেড়েই চলেছে। পাহাড় কাঁপছে। চৌচির হয়ে যাচ্ছে মাটি। ছুটতে

শুরু করেছে মানুষ। প্রাণের ভয়ে। দিগ্বিদিক। যেদিকে যায় স্রোতের মতো ভেসে আসে হাজার হাজার মানুষ উল্টো দিক থেকে। হুড়মুড় করে। ভয়ার্ত, দিশাহারা। তারা চিৎকার করেছে। 'এদিকে নয়, ওদিক ওদিক–'

এই দলটি যেদিকে ছুটছে কিছুদূর যেতেই ঠিক উল্টো দিক থেকে আরেকটি দল ছুটে আসছে। পড়িমড়ি, পাগলের মতো। দৃষ্টি বিস্ফোরিত! কারণ পেছন থেকে জমিন ফেটে ফাঁক হয়ে গেছে। আর সেই ফাঁক ক্রমশঃ বড় হচ্ছে। হাজার হাজার মানুষ তলিয়ে যাচ্ছে গভীর খাদের অতল অন্ধকারে।

মানব সন্তানরা আজ কোনদিকে যাবে?

কোথায় আশ্রয়?

চোখের পলকে লক্ষ মানুষের আত্মা কবজ হয়ে যাচ্ছে।

'ইজা জুল্‌জিলাতিল আরদু জিল্‌জালাহা।'

'যখন পৃথিবী প্রচন্ড কম্পনে কম্পিত হবে।'

'অ আখ্‌রাজাতিল আরদু আস্‌কালাহা।'

'যখন ভূপৃষ্ঠ তার বোঝা উগরে বের করে দিবে।'

'অক্বালাল ইনসানু মা'লাহা।'

'মানুষ বলবে, 'কি হলো পৃথিবীর?'

প্রচন্ড শব্দের তান্ডবে মাটির ভিতরের খনিজ দ্রব্য সে বমি করার মতো বের করে দেবে। পৃথিবী তার কলিজার টুকরো বিশাল সোনার পিন্ড আকারে উদগীরণ করে দেবে।

তখন যে ব্যক্তি ধন সম্পদের জন্যে কাউকে হত্যা করেছিল সে বলবে, 'এর জন্যেই কি আমি এত বড় অপরাধ করেছি? চুরির জন্যে যে হাত কাটা গিয়েছিল সে বলবে, এর জন্যেই আমার হাত আমি হারিয়েছিলাম?'

পাহাড় পর্বতে ফাটল ধরবে। চৌচির হয়ে যাবে। ভেঙে ভেঙে পড়বে। বিশাল আল্পস পর্বতমালা, বিশাল আন্ডেজ পর্বতমালা, সুবিশাল সিনাই পর্বতমালা, বিশাল হিমালয় পর্বতমালা, চলতে শুরু করবে। প্রথমে ধীরে ধীরে, পরে দ্রুত গতিতে। যেমন রানওয়ের উপর উড়োজাহাজ আকাশে ওড়ার প্রস্তুতি হিসেবে ছুটতে শুরু করে। পরে ডানা মেলে উড়ে যায়। তেমনি পাহাড় পর্বত ছুটতে শুরু করবে ফুঁ এর তান্ডবে। তারপর আচমকা ওপর দিকে উঠতে শুরু করবে। প্রথম সামান্য তারপর পুরোপুরি শুন্যে উড়ে যাবে। ধূণিত তুলার মতো!

'অতাকুনুল জিবালু কাল্ ইহ্‌নিল মান্‌ফুশ্।'

'পাহাড়গুলো উড়তে থাকবে ধূনো তুলোর মতো।'

'ইজাশ্ শামাউন্ ফাতারাত।'

'যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে।'

সূর্যের মুখ কালো হয়ে যাবে। শুধু উত্তাপ থাকবে। কোনো আলো নেই।

'অইজাল কাওয়াকি বুন্‌তাসারাত্।'

'যখন তারাগুলো ঝরে পড়বে।'

'অইজাল বিহারু ফুজ্জিরাত্।'

'যখন সাগরগুলো ফুঁসে উঠবে।'

সাগর উত্তাল হয়ে পাহাড় প্রমাণ ঢেউগুলো ছুটে আসবে স্থলভাগের দিকে।

'অইজাল কুবুরু বু'সিরাত।'

'যখন কবরগুলো খুলে যাবে।'

মানুষ দলে দলে পিঁপড়ার সারির মতো উঠে আসবে।

'ইজাশ্ শামসু কুব্বিরাত।'

'যখন সূর্য আলোহীন হয়ে যাবে।'

রবী ইবনে খায়সাম 'ইজাশ্ শামসু কুব্বিরাত।' এর তাফসীর করেছেন। সূর্যকে নিক্ষেপ করা হবে সমুদ্রে। প্রথমে জ্যোতিহীন করে দেয়া হবে। সহীহ বোখারীতে আবু হোরায়রা (রাঃ) রেওয়ায়েত করে বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'ক্বিয়ামা

দিন চন্দ্র ও সূর্যকে জ্যোতিহীন করে তাদের অবস্থান থেকে ছিঁড়ে এনে ছুঁড়ে ফেলা হবে মহাসমুদ্রে। মুসনাদে আহমদে আছে, 'জাহান্নামে ফেলে দেয়া হবে চাঁদ আর সুরুজকে।' এই আয়াত প্রসঙ্গে আরো কয়েকজন তাফসীরবিদ বলেন যে, চন্দ্র, সূর্য ও নক্ষত্র সমূহকে আল্লাহতালা মহাসমুদ্রে ছুঁড়ে দেবেন। তারপর প্রবল বাতাস বইবে। আগুন ধরে যাবে মহাসমুদ্রে।

'অইজান্ নুজুমুন ক্বাদারাত।'

'যখন তারাদের আলো নিভে যাবে।'

'অইজাল জিবালু সুয়্যিলাত।'

'যখন পাহাড়গুলো চলমান হবে।'

'ইয়াওমা তারজুফুল আরদু অল জিবাল্ অ-কানাতিল জিবালু কাসিবাম্ মাহীলা।'

'যেদিন পাহাড়গুলো উড়তে থাকবে। একটার উ[illegible]কটা সংঘর্ষিত হবে। তারপর বালুর মতো গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাবে।'

'অইজাল ইশারু উত্তিলাত্।'

'যখন দশমাসের গর্ভবতী উটের কোন মূল্য থাকবে না।

আরবদের কাছে দশমাসের গর্ভবতী উট খুবই মূল্যবান ছিল। তারা এর বাচ্চার জন্যে অপেক্ষা করতো। চোখের আড়াল হতে দিত না। পৃথিবীর আকর্ষণ স্বপ্নের মতো মিলিয়ে যাবে। যেন ঘুম ভেঙে গেছে। এমন নির্মম বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়াবে সেদিন মানুষ।

'অইজাল্ বিহারু শুয়্যিরাত্।'

'সমুদ্রে আগুন ধরে যাবে।'

পানিতে আগুন নেভে। কিন্তু শিঙার প্রবল কম্পনে সমুদ্রে ধরে যাবে আগুন। যাতে মানুষ বেশি দিশেহারা হয়ে যায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও আরও বেশ ক'জন তাফসীরবিদ বলেন, 'তখন লোনা পানি ও মিষ্টি পানির দেয়াল ভেঙে যাবে। পানি একাকার হয়ে যাবে। চাঁদ, সুরুজ, তারা নিক্ষিপ্ত হবে। বাতাস বয়ে যাবে প্রবল। উত্তাল হয়ে উঠবে সাগর, মহাসাগর। প্রলয়ঙ্করী রূপ ধারণ করবে। ধীরে ধীরে আগুন ধরে যাবে। মহাসমুদ্রে। দাউ দাউ করে। লেলিহান শিখা মেলে ধরবে।

'অইজান, নুফুসু জুব্বিজাত।'

'যখন মানুষকে জড়ো করা হবে।'

'ইজাশ্ শামাউন্ শাক্কাত।'

'যখন আকাশ ফেটে চিরে যাবে।'

'অ আজিনাত্ লিরাব্বিহা অহুক্কাত্।'

'ও তার প্রভুর আদেশ পালন করবে। আর আকাশ এরই উপযুক্ত।'

'অইজাল্ আরদু মুদ্দাত্।'

'আর যখন ভূপৃষ্ঠকে সম্প্রসারিত করা হবে।'

'অ আলকাত্ মা ফিহা অ তাখাল্লাত্।'

'তখন পৃথিবী তার ভেতরের সব কিছু ছুঁড়ে দেবে বাইরে।'

সেদিন পৃথিবী তার ভেতর লুকোন মহামূল্যবান ধাতু ও পদার্থগুলো বমি করে দেবে। নতুন পৃথিবী। তাতে থাকবে না কোনও বাড়িঘর, দালান কোঠা, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, সমুদ্র-মহাসমুদ্র, তরু-লতা। সুবিশাল সমতল চত্বর।

'অইজাল আরদু মুদ্দাত।' মানে হচ্ছে টেনে লম্বা করা। অর্থাৎ সমতল ভূমিটিকে টেনে লম্বা করা হবে।

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসুলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, 'ক্বিয়ামাতের দিন পৃথিবীকে রাবারের মতো টেনে লম্বা করা হবে। তারপরও শুরু থেকে শেষ দিন পর্যন্ত মানুষেরা সেখানে শুধু পা রাখার জায়গাটুকু পাবেন।'

'ইজাশ্ শামাউন শাক্কাত।'

'আকাশ বিদীর্ণ হবে।'

ঠিক এমনিভাবে সুরা আর রাহমানে আল্লাহতায়ালা বলেন, 'ফাইজান্ শাক্কাতিশ শামাউ ফাকানাত্ অরদাতান্ কাদ্দিহান।'

'যেদিন আকাশ চৌচির হবে, লাল চামড়ার রঙ ধরবে। আর ফেটে মাটিতে ঝুলে পড়বে।'

তারাগুলো কক্ষচ্যুত হয়ে যাবে। ছিটকে পড়বে সমুদ্রে। সৌরমন্ডল পরস্পর পরস্পরের সাথে সংঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে ঝরে পড়বে মহাসমুদ্রে।

'ইজা অকাআতিল ওয়াকিয়াত।'

'যেদিন মহাপ্রলয় ঘটবে।'

'লায়শা লিওয়াক্ আহিতা কাযিবা।'

'যাতে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই।'

'খাফিদাতুর রাফিয়া।'

'এটা নিচু করে দিবে বা উঁচু করে দিবে।'

'ইজা রুজ্জাতিল আরদু রাজ্জা।'

'যখন প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে পৃথিবী।'

'অ বুশ্শাতিল জিবালু বাশ্শা।'

'পর্বতমালা গুলো ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে।'

'ফাকানাত হাবাআম্ মুম্ বাস্সা।'

'সেগুলো বালুকণার মতো উড়তে থাকবে।'

সেদিন বালক বৃদ্ধে পরিণত হবে। চন্দ্র ও সূর্যে গ্রহণ লাগবে। প্রবল কম্পনে বিশ্বজগত হেলতে দুলতে থাকবে। বিরতিহীন ভয়াল কম্পন! বেলা যত বাড়তে থাকবে ধ্বংসলীলা ততই বাড়বে। পাহাড়ে ফাটল, জমিনে ফাটল, বাড়িঘর ভেঙে পড়বে। ওদিকে পাঁজর ভেঙে ফেলা শব্দতরঙ্গ কানে বাড়ি মারবে। ফেটে যাবে কানের পর্দা। ওদিকে আকাশ থেকে ভেসে আসছে বজ্রনিনাদ। মহাশব্দের দাপটে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে বস্তি, জনপদ, পাহাড় পর্বত। আর্তনাদ আর ভয়ার্ত চিৎকারে নরক গুলজার। কারও কথা কেউ শুনতে পাচ্ছে না।

দ্বিতীয় ফুঁ দেয়ার সাথে সাথে সমস্ত প্রাণীকুল একসাথে মারা যাবে। মাত্র্ বারোজন সম্মানিত ফিরিশিতা ছাড়া। আর ইবলিস!

তার পিছু ধাওয়া করবেন আজরাইল (আঃ)। সে দুনিয়ার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ছুটবে। শেষমেশ আদম (আঃ) এর কবরের সামনে তার জান কবজ করা হবে।

এবার জলরাশি ধ্বংস হবার পালা।

তারা আল্লাহর অনুমতি নিয়ে আর্তনাদ করে বলবে, 'হে আমার তরঙ্গরাজি ও আশ্চর্যজনক বস্তু তোমরা কোথায়? আল্লাহর আদেশে তোমরা নিঃশেষে হয়ে যাও।'

পানি সাথে সাথে উধাও হয়ে যাবে।

এমন যেন কোনও দিন পানির অস্তিত্ব ছিলনা।

এভাবে আগুন ও বাতাস ধ্বংস হবে।

সব শেষে আজরাঈল (আঃ)।

সবশেষ।

এবার আল্লাহতায়ালা বজ্রনির্ঘোষে ঘোষণা করবেন, 'লিমানিল্ মুল্কিল্ ইয়াওম্।' বলো আজকের দিনে কে আছো রাজত্বের মালিক? কে আছো রাজপুত্র? কোথায় রাজারা?' কোনও জবাব নেই। নিঃশব্দ দুনিয়া। নীরব রবে পৃথিবী।

'লিল্লাহি ওয়াহিদিল কাহ্হার।'

'একমাত্র ক্রোধান্বিত একক প্রভূই আছেন।'

তো ভাই, বুজুর্গ ও বন্ধু!

যে ঈসরাফিল (আঃ) এর একটা ফুঁ-এ এমন প্রচন্ড তান্ডব আর প্রলয়লীলা সংঘটিত হবে সেই ঈসরাফিল (আঃ) এর মুখে কতো শক্তি! হাতে কতো শক্তি! গোটা শরীরে কতো শক্তি!

যে আজরাঈল (আঃ) এর হাতের তালুতে গোটা দুনিয়া তাঁর হাত কত বড়। পা কত বড়! শরীরটা কত বড়!

যে মিকাঈল (আঃ) মাথায় সাত সাগরের পানি ঢাললে জমিনে এক ফোঁটা পড়বে না তাঁর শরীরটা কত বড়।

যে জিব্রাঈল (আঃ) এর একটা চিৎকারে একটা জাতি হৃদয় ফেটে মারা যায়। তার দশটা চিৎকারের কত ক্ষমতা! যে মুখ দিয়ে চিৎকার দেন তাতে কত শক্তি! তাঁর শরীরে কত শক্তি!

তার একটা পাখার একবার ঝাপটা মারলে সাড়ে চৌদ্দ হাজার বছরের রাস্তা অতিক্রম করে; তাহলে ছয়শত পাখা ঝাপটা মারলে কি দূরত্ব অতিক্রম করেন। একটা পাখার একটা কোণায় যদি এত শক্তি থাকে তাহলে গোটা পাখায় কতো শক্তি। ছয়শত পাখায় কত শক্তি!

যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন চোখের পলকে হাজার, লক্ষ, কোটি জিব্রাইল, মিকাঈল, ঈসরাফিল ও আজরাইল পয়দা করতে পারেন তাঁর নিজস্ব কতো শক্তি।

তাকে তো চিনলাম না। হায়!

তাঁকে তো জানলাম না। হায়!

তাঁকে তো আপন করলাম না। হায়! হায়!

যদি তিনি আমাদের হতেন?

যদি আমরা তাঁর হতাম?

তাহলে কোন্ শক্তি আজ মুসলমানদের সামনে দাঁড়ায়?

কে মুসলমানকে পদানত করে?

কে অপমান করে?

কে লাঞ্ছিত করে?

কে মুসলমানের দিকে চোখ তুলে তাকায়?

কিভাবে বসনিয়া হার্জেগোভিনায় করুণ কলঙ্কজনক ইতিহাস তৈরি হয়?

এত বড় অপমানের বোঝা মুসলমানের কাঁধে কেন?

ইতিহাসে এর চেয়ে অসহায় অবস্থা আর কখনো মুসলমানদের হয়নি। কেন?

কেন বাবরী মসজিদ ভেঙে গেল?

কেন আফগানিস্থানের পাহাড়ের কন্দরে কন্দরে কান্নার রোল। রক্তের হোলি খেলা। কেন কাশ্মীরে লাঞ্ছিত আমরা, আমার মা ও বোনেরা?

কেন লুণ্ঠিতা, ধর্ষিতা হলো বসনিয়ান, রোহিঙ্গা, মোরো মুসলামান নারী?

কারণ আমি চিনিনা আমর প্রভুকে, প্রতিপালককে।

কে তিনি? কী তাঁর ক্ষমতা? কী তাঁর পরাক্রম? কী তাঁর মহিমা? আমার সাথে তাঁর সম্পর্ক কি? কি কি সাহায্যের জন্যে তিনি আমাদের সাথে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কোন কোন কাজ করলে তিনি তা প্রতিপালন করবেন। জানিনা।

জানিনা কী তার পরিচয়?

অবাক পৃথিবী!

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, নবী
আলাইহিস সালাম ও সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা
আনহুদেঁর জীবনে ঘটে যাওয়া বিস্ময়কর অদৃশ্য
সাহায্যের সুনিপুণ গ্রন্থনা।

সম্পাদনা

শফিউল্লাহ কুরাঈশী

রবিউল আউয়ালের উপহার

মৃত্যুর ওপারে

তাবলীগের জীবিত কিংবদন্তী
মাওলানা তারিক জামিলের মৃত্যু, কবর, হাশর, পুলসিরাত, মিজান, বেহেশত ও দোজখ সম্পর্কে হৃদয়ছোঁয়া আলোচনা
অনুবাদঃ শফিউল্লাহ কুরাঈশী

সূর্যপুরুষ

মাওলানা আখতার ইলিয়াস (রঃ)

কে এই মাওলানা ইলিয়াস?
কী তাঁর পরিচয়? কেমন ছিল তাঁর ব্যক্তিগত
জীবন? কেমন ছিল তাঁর সাধনা, ব্রত।
এমন বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা গ্রন্থ আর হয়নি।

মূলঃ মাওলানা সৈয়দ
হাসান আলী নদভী
অনুবাদঃ শফিউল্লাহ কুরাঈশী

জমাদিউল আউয়ালে পাবেন

পৃথিবীর পথে পথে

আল্লাহর পথের পথিকরা দুনিয়া জুড়ে চলার পথে কি কি অলৌকিক, অবিশ্বাস্য, বিস্ময়কর ও রহস্যময় অদৃশ্য সাহায্য পেয়েছেন, আর তাদের হাতে কিভাবে দলে দলে হেদায়াতের পথে চলার অঙ্গীকার করেছে মানব তার অসামান্য বিবরণ।

লিখেছেন শক্তিমান লেখক-
শফিউল্লাহ কুরাঈশী

ডাক

জমাট অন্ধকারে ঐন্দ্রজালিক জ্যোতির জয়গান

আমরা সারাদিন মানুষকে আল্লাহর দিকে ডেকে ঘুমিয়ে ছিলাম।
নিবিড় নিশীথে হিরন্ময় হাতের ছোঁয়া ঘুম থেকে তুলে অলৌকিক
জায়নামাজে দাঁড় করিয়ে দিল।
আমরা আবার ডাকলাম। আল্লাহকে। মানুষের দিকে।
আমরা সারারাত কাঁদলাম। মানুষের জন্যে।
'ক্ষমা করো, ক্ষমা করো' করে ডাকতে ডাকতে কখন যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন
হয়ে পড়েছি। আচমকা কীসের ছোঁয়ায় চমকে চোখ তুলে দেখি
আমাদের চারপাশ জ্বলছে। সুতীব্র আলোয়। দেখি, আমাদের হাতে
দুপুরের সূর্য।

ডাক সম্প্রদায়